বেলোয়ারী বিলাস

●

অমরেন্দ্র দাস

●

শ্রীগুরু পাবলিকেশন, ২৫ সি ক্রিস্টোফার রোড, কলি-৪৬

BAELOARI BILAS
By Amarendra Das

দ্বিতীয় (শ্রীগুরু) প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৫১
প্রকাশিকা
শ্রীমতী শিউলি দাস
২৫সি, ক্রিস্টোফার রোড
কলিকাতা-৪৬

আমাদের প্রেস
৮৩ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

বেলোয়ারী বিলাস

ইতিহাসের একটি জঘন্য অধ্যায়

মুর্শিদাবাদের মসনদ নিয়ে কাণ্ডটা ঘটেছিল। নবাব আলিবর্দীর কথা কারুর অজানা নয়। নবাব আলিবর্দী সিংহাসনে বসে বহুদিন নবাবী করেছিলেন কিন্তু সেই নবাবী পাওয়ার পিছনে ছিল একটি জঘন্য কাহিনী। সেই আখ্যানভাগ নিয়ে এই উপন্যাস লেখা হয়েছে। মানুষ যদি ভাগ্যবান না হয়, সে তার ভাগ্য আপন ক্ষমতায় জয় করে। সেই ক্ষমতার পিছনে যে জঘন্যতম কীর্তি থাকে যুগে যুগে তাই ঘটে যায়। এখানে আলিবর্দীর সিংহাসন পাওয়ার পিছনে তাঁর দাদা হাজী আহম্মদ যেসব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা লিখতে গিয়েও শিউরে উঠতে হয়। সেইসব চক্রান্তের একটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তখনকার দিনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে কত অসহায় ছিলেন রাঘব চৌধুরী তাঁর দৃষ্টান্ত। তিনি হাজী আহম্মদের চক্রান্তে নিজের পরিবারকে ধ্বংসের মুখ থেকে কিছুতে উদ্ধার করতে পারেন নি। তাঁর পরিবারের কৌলিন্য রক্ষার জন্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সিংহ যখন থাবা বাড়িয়েছে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। হাজী আহম্মদও পরিত্রাণ পান নি। প্রতিশোধ স্পৃহা যে কত ভয়ঙ্কর এ উপন্যাসের প্রতিটি ছত্র তার প্রমাণ। আপনারা যাঁরা চক্রান্ত করেন, একবার দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাবেন। আপনারও অবস্থা একদিন ঐ ক্ষমতালোভী হাজী আহম্মদের মত হবে।

তুম কৌন হ্যায় !

গর্জে উঠল আলিবর্দী মহম্মদের কণ্ঠস্বর। বাংলার নবাব মির্জা মহম্মদ আলিবর্দী। এইমাত্র তিনি ফিরেছেন দুর্ধর্ষ আফগান সর্দারদের শায়েস্তা করে। বাইরে ফৌজদের হল্লা শোনা যাচ্ছে। পড়ে আছে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কামানের সারি।

নবাব আলিবর্দীর পরণেও যুদ্ধের পোষাক।

তাঁর কন্যা আমিনাকে, তার ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য নারীদের উদ্ধার করে ফিরেছেন। কিন্তু উদ্ধার করতে পারেন নি তাঁরই জামাতা জৈনুদ্দিনকে, যে তাঁর অতি আদরের দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজের পিতা, আর আপন ভ্রাতা হাজী আহম্মদকে যে একদিন স্বপ্নের মতো এই বাংলার নবাবীকে কায়েম করার জন্যে বহু মেহনত করেছিলেন। আফগানরা তাঁকেও বহু অত্যাচার করে তারপর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ভাইয়ের জন্যে ও কন্যার সোহাগ জৈনুদ্দিনের জন্যে চোখে জল নিয়ে বিজয়ী নবাব প্রাসাদে সবে ফিরেছেন, এই সময়ে কোথা থেকে এক পাগল লোক প্রহরীদের বেষ্টনী ভেদ করে এসে নবাবের সামনে দাঁড়াল।

লোকটির চেহারাটি অদ্ভুত ধরণের। বিরাট লম্বা চওড়া এক দশাসই মানুষ। মানুষ ঠিক বলা যায় না, মানুষের নামে এক কিম্ভূত কিমাকার জানোয়ার।

হাঁড়ির মত একখানি মুখ। মুখখানি দাড়ির জঙ্গলে ভর্তি। একটি চোখ গলে গিয়ে চোখের গর্তে দগদগে ঘা। আর একটি চোখ যেন কি এক জিঘাংসায় জ্বলছে। সেই চোখটি বড বড় করে যখন আগুন জ্বালার মতো রূপে সে চিৎকার করে উঠল প্রতিশোধ প্রতিশোধ বলে। তখন যুদ্ধজয়ী বীর, অতীতের সেনানায়ক বর্তমানের বাংলার নবাব আলিবর্দীও ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন "কৌন হ্যায় তুম !"

কিন্তু জবাব কে দেবে? সেই পাগল তখন আপন মনে শুধু হাঃ হাঃ রবে অট্টহাস্য করে প্রাসাদের প্রাঙ্গণ বিদীর্ণ করছে, আর প্রতিশোধ প্রতিশোধ বলে চিৎকার করছে।

শুধু একবার তার মুখে শোনা যায় হাজী আহম্মদের নাম।

লোকটির মুখখানিই শুধু বীভৎস নয়। বীভৎস তার বিশাল শরীরের সবটুকু। ছেঁড়া, ময়লা জামাকাপড় পরণে। জামাকাপড়ের ঘেরাটোপ নেই বললেই হয়। নগ্ন শরীরটা বাইরের আলোয় দৃশ্যমান।

হাত, পা, বিশাল বুক, চওড়া পিঠে কে যেন দিনের পর দিন ধরে চাবুক চালিয়েছে। চাবুকের ফোলা ফোলা মোটা মোটা দড়ির মতো দাগগুলো রক্ত জমে কালো হয়ে শুকিয়ে চামড়ার উপর পাকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আবার কিছু কিছু ক্ষত। ক্ষত থেকে পুঁজ গড়াচ্ছে। সেই ক্ষতের ওপর মাছি বসে আছে। সারা শরীর ঘিরে শুধু মাছির তাণ্ডব।

এমনি এক অশুভ লোককে দেখে নবাবসাহেব ভীষণ রেগে উঠলেন। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বিশিষ্ট অমাত্যরা। তাঁদের সঙ্গে নবাব আফগানদের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

এই সময়ে এই অশুভকণ্ঠের আর্তনাদ। আর তার সঙ্গে বিশ্রী উৎকট সুরে জঘন্য হাসি।

আলিবর্দী কিছুতে সহ্য করতে পারেন না। চিৎকার করে রক্ষীদের হুকুম দেন, ঐ বেতমিজ, বেসরম কুত্তাকা মাফি আদমী কো পাকাড়কে লে আও।

আলিবর্দীর আর কিছু ভাল লাগছিল না। তাঁর পরিবারকে ঘিরে এমন এক জঘন্যতম সর্বনাশ।

ভেবেছিলেন নবাবী কায়েম করে বুঝি দুনিয়ার সেরা সৌভাগ্যটি লুটে নিয়েছেন। কিন্তু তা যে নয়, দুনিয়ায় যে কেউ সুখী নয় তাই দেখলেন আজ পাটনায় গিয়ে।

আফগানদের ষড়যন্ত্রের কথাটা যদি আগে শুনতেন তাহলে বেটি আমিনার সোহাগ এমনি রক্তাক্ত হত না।

পাটনার প্রাসাদে গিয়ে দেখেছেন দরবার ঘরে জৈনুদ্দিনের দ্বিখণ্ডিত দেহ।

অথচ এই জৈনুদ্দিনকে কত করে বারণ করেছিলেন—বেটা ঐ ধূর্ত আফগান সর্দার-দের কিছুতে জায়গা দিও না। ওরা ভীষণ বেইমানের জাত। ওরা কি কৌশল নিয়ে তোমার দরবারে জায়গা নিতে চায় তুমি জানো না।

কিন্তু জৈনুদ্দিন কিছুতে শুনল না। আফগান সর্দার শমসের খান ও সরদার খানকে জায়গা দিল। শুধু জায়গা দিল না, ওদের এক বিরাট বাহিনীকে জৈনুদ্দিন নিজের সৈন্যদলে যুক্ত করে নিল।

আলিবর্দী মুর্শিদাবাদে বসে সব খবরই রেখেছিলেন। একদিন এই আফগানদের তিনি নিজের দলে নিয়ে মহারাষ্ট্রদের শায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন। তখন মহারাষ্ট্র নায়ক রঘুজী ভোসলা বাংলার চতুর্দিকে মানুষের ওপর অত্যাচার করে চলেছে। মহারাষ্ট্রদের সৈন্য বাহিনীর শক্তির কাছে আলিবর্দী নিজে দুর্বল মনে করে আফগানদের সাহায্য চান। কিন্তু আফগানরা যে অদ্ভুতভাবে বেইমানি করে তাঁকে হঠাৎ বিপদে ফেলে, এ তিনি আজও ভোলেন নি। তাই তাদের চিরতরে নির্বাসন দিয়েছেন নবাবী দরবার থেকে।

কিন্তু সের আফগানদের আবার জৈনুদ্দিন জায়গা দিতে মনে মনে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন।

এদিকে আলিবর্দী জানেন না কেন জৈনুদ্দিন আফগানদের জায়গা দিয়েছিল। ঘটনার সূত্র কোথায় গিয়ে যে চমক সৃষ্টি করেছিল মুর্শিদাবাদে বসে নবাব কি করে জানবেন?

পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে জৈনুদ্দিন পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিল। সেই মুর্শি-দাবাদে গিয়ে দেখেছে তার অন্য দু'ভাই নওয়াজেস ও সৈয়দ আহম্মদ তার চেয়ে অর্থ-শালী। তারা যেভাবে জীবন যাপন করে, সে সেভাবে জীবন যাপন করতে পারে না।

অথচ সেই সবচেয়ে ছোট, তার আদরই দরবারে বেশী। নবাব মুখে বলেন আমার ছোট জামাইয়ের মতো মানুষ হয় না, আসলে তিনি বড় দুজনকেই ভালবাসেন।

সেই সব ভেবেই পাটনায় ফিরে এসে জৈনুদ্দিন অন্য মতলব করেছে। স্বাধীন হতে হবে। নবাবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীন রাজ্য গঠন করতে হবে। সে কথা পিতা হাজী আহম্মদকে চুপি চুপি বলে।

চিরকালের যে ধূর্ত লোক, যাঁর শিরায় শিরায় শুধু শয়তানী মতলব। তিনি শুনে শুধু চটুল হয়ে হাসেন।

তারপর বলেন, মতলব যখন মগজে এসেছে, তাকে পুষে রেখ না। কিন্তু হাজী আহম্মদ বৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। সারা জীবন ধরে বহু চালাকী প্রকাশ করে করে সামান্য আদমী থেকে আজ রাজ পরিবার সৃষ্টি করেছেন। এখন বিশ্রামের সময়। তাই ছোট ছেলেকে আর কোন মতলব দিয়ে সাহায্য করতে পারেন না।

জৈনুদ্দিন নিজেই আফগান সর্দারদের দরবারে আমন্ত্রণ জানান। শমসের খান ও সরদার খান বহুবিধ নজরানা সঙ্গে নিয়ে একদিন দরবারে আসে।

আফগান দুই সর্দারকে দেখে জৈনুদ্দিনও পুলকিত হয়। সমস্ত দরবারে অন্যান্য অমাত্যরা যার যার পদমর্যাদায় আসীন। আফগান সর্দারদের সঙ্গে বহু ফৌজও এসেছে। তারা বাইরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে বাংলার নবাবের জয় ঘোষণা করছে। জয়ধ্বনি দিচ্ছে পাটনার সুবেদার জৈনুদ্দিন আহম্মদের।

কিন্তু আফগান সর্দাররা অন্য মতলব নিয়ে যে দরবারে এসেছে সে কথা কেউ জানতে পারে না।

জৈনুদ্দিন তখন রত্নখচিত সিংহাসনে বসে আফগান সর্দারদের দেওয়া নানাবিধ মূল্যবান নজরানার দিকে তাকিয়ে আছে। একটি রত্নখচিত দর্পণ দেখে হুকুমদারকে বলেছে ওটা আমার হাতে দাও।

জৈনুদ্দিন সেটা হাতে নিয়ে ঐ দর্পণের প্রতিবিম্বে মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, দর্পণের প্রতিবিম্বে শুধু তার মুখ নয়। কাঁচের ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে একটি নারীর মুখ। সে নারীর মুখ বড় সুন্দর। কিন্তু দর্পণের ভেতর থেকে তা দেখা যায় দর্পণটি একটু ট্যারচা করে ধরলে। জৈনুদ্দিন সেই রত্নখচিত ফ্রেমের দর্পণটি বার বার ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ ছেলে মানুষ হয়ে যায়। খিলখিল করে হেসে ওঠে। পুলকিত হয়। আমিনাকে এই দর্পণ দেখানোর জন্য তার মন ছটফট করে।

দরবারের লোকেরাও পাটনার শাসনকর্তার এই হঠাৎ ছেলে-মানুষীতে কেমন বিস্মিত হন। হাজী আহম্মদও দরবারে উপস্থিত। তিনি পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলেন—ক্যায়া হুয়া বেটা! কই চমক!

জৈনুদ্দিন পিতাকে বলতে পারে না তার পুলকিত হওয়ার কারণ তা ছাড়া আয়নার ঐ রূপসী কেমন যেন মুচকি হেসে তাকে আরও সরমে রাঙিয়ে তুলছে।

আফগান সর্দার শমসের খান ও সরদার খান নবাবের সিংহাসনের পাশেই বসেছিলেন। তাঁদের পাশে তাঁদের আরও উচ্চপদস্থ সেনানায়ক। সবাই এসেছে

অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে। তাদের সারা শরীর ঘিরে শুধু নানাবিধ অস্ত্রের ঝনঝনানি।

জৈনুদ্দিনের দরবারের অমাত্যরাও আফগানদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে কি যেন এক ভয়ের আশঙ্কা।

এই সময়ে হঠাৎ জৈনুদ্দিন চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু তখন দরবারের মধ্যে রীতিমত এক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সবাই দরবারের বাইরে ছুটছে কিন্তু আফগানরা যেতে দিচ্ছে না। তাদের তরবারীর আঘাতে, পিস্তলের গুলিতে শুধু মৃত্যু তাণ্ডবই শোনা যাচ্ছে।

জৈনুদ্দিনের দ্বিখণ্ডিত দেহ রত্নখচিত সিংহাসনের লাল ভেলভেটের ওপর গড়াচ্ছে। আর যে যেপথ দিয়ে পারছে পালানো'র চেষ্টা করছে, কিন্তু হাজী আহম্মদ যখন ছেলের দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ দেখে আতঙ্কে থমকে দাঁড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করেন, সেই সময় শমসের খান এসে তাঁর গতিরোধ করেন, তরবারী তুলে তাকেও দিখণ্ডিত করতে যান, সেই সময়ে কে যেন এসে তার হাত ধরে ফেলে।

শমসের ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পাগলকে দেখতে পান। এ যে কেমন করে কোথা থেকে এই দরবারে ঢুকে পড়েছে কেউ জানে না।

সেই পাগলকেও শমসের হত্যা করতে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে পাগল এক চোখের বীভৎস দৃষ্টি নিয়ে শমসেরকে বলে আমি দোস্ত, তোমার ভালই আমি চাই, আমাকে হত্যা কর না। আর হাজীর দিকে ফিরে বলে—চিনতে পারছ হাজী সাহেব? চিনতে পারছ না। একবার অতীতের দিকে তাকিয়ে চিন্তা কর, তুমি কার কার ওপর তোমার শয়তানী মতলবটা ছড়িয়ে দিয়েছিলে। তারপর হঠাৎ গর্জে উঠে বলে—আফগান সদার, এই সেই কুকুর, যে একদিন এক মুষ্টি অন্নের জন্যে এই বাংলা দেশে ছুটে এসেছিল। আর সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকের মতো মুর্শিদকুলীর সমস্ত পরিবারকে ধ্বংস করেছিল।

হঠাৎ শমসের জিজ্ঞেস করে—তুমি কি মুর্শিদকুলীর পরিবারের কেউ?

পাগল মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—কৌতূহল প্রকাশ কর না আফগান সর্দার। এই শয়তানের সামনে আমার পরিচয় দিলে এখুনি চমকে উঠবে এই কুকুর। শুধু আমার বিনীত অনুরোধ, ওকে এতো সহজে মরতে দিও না। ওকে আপাতত বন্দী কর। তারপর আমি আমার কর্তব্য জানাবো। আমি চাই নিজে থেকে ওকে তিলে তিলে মারতে। ও যেমন তিলে তিলে আমার সর্বনাশ করেছে।

আফগান সর্দার শমসের খান কিছু না বুঝতে পেরে পাগলের নির্দেশই পালন করে।

হাজী আহম্মদকে হত্যা করা হয় না। বন্দী করা হয়।

তারপর সেই পাগলই নিয়ে যায় শমসের খানকে বেগম মহলের দিকে। পাগলের হাতে একখানি উন্মুক্ত তরবারি।

এদিকে তখন আলীবর্দীর ছোট মেয়ে বেগম আমিনা স্বামীর নিহত হবার সংবাদ পেয়ে বেগম মহলের সদর দরওয়াজা বন্ধ করবার হুকুম দিয়েছে। নিজের পুত্রকন্যাদের

ও অন্যান্য নারীদের নিয়ে কি করে পালাবে ভাবছে। সেই সময় আফগান সৈন্যরা বেগম মহলের দরওয়াজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

শমসের সেই পাগলকে বলে—আওরতদের ওপর কোন অত্যাচার আমি করব না। আওরতদের ওপর অত্যাচার করা বীরত্বের ধর্ম নয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পাগল ঘুরে দাঁড়িয়ে এক চোখে দারুণ এক আগুন জ্বেলে বলে—বীরত্ব! তুমি কি সর্দার মসনদ কায়েম করতে চাও না! যদি মসনদ চাও তাহলে আমি যা বলি তা পালন কর।

শমসের বুঝতে পারে না এই আগন্তুক কে? কি তার অভিসন্ধি! আবার তার চোখের ওপর সন্দেহ ঘনিয়ে আসে, বলে—কে তুমি? তোমার পরিচয় না দিলে আমি তোমায় হত্যা করব।

পাগল আবার হাঃ হাঃ করে হাসে।

আমায় হত্যা করে তুমি কি পাবে সাহেব? তোমার বীরত্ব নারীরক্তে কলুষিত হতে চায় না, আর আমার মতো এক সামান্য ঝুট্ আদমীকে হত্যা করে তুমি তোমার বীরত্ব উজ্জ্বল করবে? তার চেয়ে এস বন্ধুত্ব করি। পরিচয় জানতে চেও না, আর পরিচয় দিলেও বুঝতে পারবে না তুমি কিছু। শুধু এই জেনে রাখো, আমি এই হাজী আহম্মদের সব কিছু ধ্বংস করতে চাই। ও যেমন আমার সব কেড়ে নিয়েছে।

পাগল যে পাগলের মতো কথা বলবে তা বলে না। বরং তার কথা শুনে অতো বড় বীর যোদ্ধা শমসের খান সেও যেন কি ভাবে?

ওদিকে তখন বেগম মহলের দরওয়াজা ভাঙা হয়েছে।

হুড়মুড় করে ঢুকছে উন্মত্ত আফগান সৈন্যরা। তাদের চোখে লালসার উকিঝুঁকি।

রমণীদের মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকার তখন বাতাস ভারী করেছে। যে যার তখন বেছে নিয়েছে কম বয়সী, দেখতে সুন্দর সব মেওয়া ফলের মতো মেয়েদের। মেয়েরা চিৎকার করছে। সরমে জড়োসড়ো হয়ে কাপড় দিয়ে নিজেদের লোভাতুর অংশগুলো আড়াল করছে! সৈনিকরা এগিয়ে গিয়ে সে সব টানাটানি করে খুলে দিচ্ছে।

পাগল ও শমসের এগিয়ে চলে তাদের পাশে রেখে অন্দরের দিকে। পাগলের চোখে যেন ফুটে ওঠে অনেক অনেককাল আগের একটি দৃশ্য। কিন্তু হঠাৎ সে হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে দৃশ্যটা দেখে।

একটি সৈনিক একটি গোলাপ ফুলের মতো সদ্য যৌবন প্রাপ্তা মেয়ের কামিজ ধরে টানছে। মেয়েটির ওড়নার আবরণ কেড়ে নিয়েছে সৈনিকটি। মেয়েটির বুকের দুই সুউন্নত গোলাকার আর কামিজের আড়ালে লুকানো নেই। সৈনিকটি সেখানে হাত দিয়েছে। মেয়েটি হঠাৎ সেই সৈনিকের হাত তার সাদা দাঁতের সারি দিয়ে কামড়ে ধরেছে।

সৈনিকটি হঠাৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাম কামনা ভুলে গিয়ে মেয়েটির ফুলের মতো কোমল গণ্ডে চড় কষিয়েছে।

এই দেখেই পাগলের অট্টহাসি। শমসেরও না হেসে পারে না। ওরা গিয়ে

খাস অন্দর মহলের দরওয়াজার কাছে দাঁড়ায়।

অন্দর মহলের বিশেষ এক কক্ষের মধ্যে তখন আমিনা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ভয়ে কাঁপছে। ভেতর থেকে কক্ষের দরওয়াজা বন্ধ।

পাগল ও শমসের গিয়ে সেখানে দাঁড়ায়।

তখন অন্যান্য সৈনিকরা দরওয়াজার বাইরে থেকে কথা চালাচ্ছে। উত্তর দিচ্ছে ভেতর থেকে অশ্রুমুখী আমিনা।

আমিনার সুরত, আমিনার দুটি চোখের মায়ামোহ চাউনি, তার কথা বলার ঢঙ, এক সৈনিক পুরুষ জানতো। জানতো অনেকদিন আগে যখন আলিবর্দী মহারাষ্ট্রীয়-দের শায়েস্তা করতে গিয়ে সমস্ত পরিবার নিয়ে মেদিনীপুরে তাঁবু করেছিলেন তখন আমিনা পল্লী অঞ্চলে এক ডাকাতের পাল্লায় পড়ে। সেই সময়ে একটি সৈনিক তাকে বাঁচিয়েছিল। শুধু বাঁচায় নি, অজ্ঞান অচৈতন্য জ্ঞানহারা ভূ-লুণ্ঠিতা আমিনাকে বুকে তুলে নিয়ে সেই সৈনিক প্রভুভক্তের মতো আলিবর্দীর তাঁবুতে রেখে এসেছিল।

আমিনা তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে সব শুনে সেই সৈনিককে পুরস্কৃত করে। কিন্তু পুরস্কার নেয়নি আফগান সেনা মশির আলী।

আমিনা তখন মাথা নত করে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি নেবে না কেন পুরস্কার মশির আলী?

মশির আলী মাথা ঝাকিয়েই উত্তর দিয়েছিল—যে হাতে আমি একটি সুখের জিনিসকে স্পর্শ করেছি সে হাত তখনই পুরস্কার পেয়েছে। নবাব আলিবর্দী আফগা-নদের এখন দোস্ত। দোস্ত না হলে অন্য একটি প্রার্থনা বেগমসাহেবার কাছে পেশ করতাম।

আমিনা বুঝতে পেরেছিল সবই। লজ্জায় গণ্ড তার রাঙা হয়ে উঠেছিল। শুধু মৃদুকণ্ঠে মাথা নত করে ধীরে ধীরে বলেছিল—এসব কথা বলো না সৈনিক। এসব কথা শুনলে পাপ হয়। আমি বিবাহিতা রমণী, বিবাহিতা রমণীর প্রতি যে সম্মান জানানো উচিৎ তাই জানাবে সৈনিক।

সঙ্গে সঙ্গে মশির আলি বিরাট এক কুর্নিশ করে বিদায় নিয়েছিল। যাবার সময়ে শুধু বলে গিয়েছিল দুজনের মাঝে যে ফারাক যদি কোনদিন এক হয় আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমিনাবিবি।

মশির আলী দরওয়াজার ধারে দাঁড়িয়ে সে কথা বলে আমিনাকে।

আমিনাবিবি, আমি মশির আলী। আমাকে নিশ্চয় ভোল নি। আজ দেখো, দুজনে আমরা এক হয়ে গেছি।

আমিনা বিবিও ভেতর থেকে উত্তর দেয়—ছি, ছি এসব কি বলছ সৈনিক তুমি? আমি আজ বেওয়া রমণী। আমার কি এসব শোনা শোভা পায়?

মশির আলী তখন বলে—ওসব ভাল ভাল কথা বলা ছেড়ে দাও আমিনা। আমি জানি তুমিও আমাকে চাও, আমিও তোমাকে চাই। সেদিন তুমি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলে, ইচ্ছে করলে তোমাকে নবাবের তাঁবুতে ফেরত না দিয়ে তো অনেক

কিছু করতে পারতাম ।

ভেতর থেকে আমিনা বলে— তোমার মহানুভবতা ।

মশির আলী তখন বলে—তাহলে দরওয়াজা খুলে দাও। এখন পথ পরিষ্কার। স্বামী যখন তোমার মারা গেছে তখন পিছনে আর তোমার তাকাতে হবে না। তোমার জন্যে আমি অনেকদিন থেকে অপেক্ষায় আছি, সেই যেদিন তোমাকে বুকে তুলে নিয়ে নবাবের তাবুতে পৌছে দিয়েছিলাম। দু'হাতে এখনও তোমার স্পর্শ লেগে আছে। দরওয়াজা যদি না খোল তাহলে আমি দরওয়াজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকব। আর তোমাকে সেই সেদিনের মতো তুলে নিয়ে এই প্রাসাদ ছেড়ে অনেক অনেক দূরে চলে যাব।

আমিনা ভেতর থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে— তুমি পারবে না সৈনিক আমাকে জীবিত নিয়ে যেতে। যদি মরা দেহটার প্রতি তোমার কোন আকাঙ্খা থাকে তবে তাই নিও। দরওয়াজা ভাঙার চেষ্টা করলে আমি বিষ খাব, আমার হাতের আংটিতে আছে তীব্র বিষ। মুখের মধ্যে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহ নীল হয়ে, স্তব্ধ হয়ে যাবে।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাগলও শঙ্কিত হয়। এতক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশির আলীর প্রেমলীলা কৌতুকের মতো শুনছিল।

শমসের পাগলের দিকে তাকায়। গম্ভীর হয়ে বলে— এবার কি নির্দেশ? পাগল সেই এক চোখ দিয়ে আশ্বাস জানিয়ে হঠাৎ হৈ হৈ করে সেই সৈনিকদের দিকে এগিয়ে যায়।

দু একটা এলোপাথারি খণ্ডযুদ্ধও হয়। সৈনিকরা বুঝে উঠতে না পেরে শত্রু ভেবে সেই পাগলকে আঘাত হানে। পাগলও যুদ্ধ করতে জানে তা প্রমাণ হয়।

শমসের তারপর সৈনিকদের সরে যেতে বলে। সৈনিকরা হৈ হৈ করে সরে যায়।

তখন পাগল অদ্ভুত মোলায়েম কণ্ঠে দরওয়াজার কাছে গিয়ে বলে—বেটি আমিনা, এবার দরওয়াজা খোল। আফগান সৈন্যদের আমি হয়রান করে সরিয়ে দিয়েছি কিন্তু ওরা দলে অনেক, ওদের সঙ্গে পারা মুস্কিল, এই বেলা না পালিয়ে গেলে আর পালানো সম্ভব হবে না।

মোলায়েম কণ্ঠের স্নেহ জড়ানো কথায় কাজ হয়। বোকা মেয়ে আমিনা দরওয়াজা খুলে দেয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে পাগল সেই দরওয়াজা চেপে ধরে হাঃ হাঃ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

হতবুদ্ধি আমিনা হাতের আংটির ঢাকনা খুলে বিষ খেতে যায়। কিন্তু শমসের গিয়ে তার হাত চেপে ধরে। আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নেয়। আমিনা হাতের যন্ত্রণায় একপাশে ঢলে পড়ে।

শমসের চায় পাগলের দিকে—নির্দেশ।

শমসেরের চোখের তারায়ও লালসা খেলা করে। কিন্তু সে সর্দার প্রধান, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের চেয়ে দলের স্বার্থ টাই বেশী বোঝে।

পাগল শমসেরের দিকে চেয়ে হঠাৎ কুটিল ভাবে হেসে ওঠে।

সর্দার, মনের মধ্যে কি কোন আশা গুমরোচ্ছে না?

শমসের মাথা ঝাঁকায়। ভারী গালে তবু হাসির কুঞ্চন ফুটে ওঠে। চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি লুকোতে পারে না।

আমিনার মাখনের মতো গোলাপ ফুলের নিটোল দেহটি দেখেও কার না কামনা জেগে ওঠে? অনেকগুলি সন্তানের মা আমিনা। তবু যেন রূপের ও যৌবনের কমতি নেই।

ঘরের মধ্যে তখন আরও কয়েকটি রমণী। তারা ভয়ে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে জায়গা নিয়েছে। আমিনার এক ছেলে এক্রাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। ছোট ঢুটি মেয়ে অবাক হয়ে ঘরে আগত লোকের দিকে তাকিয়ে আছে।

পাগল একবার তরবারী তুলে এক্রামকে বধ করতে যায়, তারপর কি ভেবে করে না শুধু চাপাস্বরে বলে, তোমায় বধ করার চেয়ে আলিবর্দীর স্নেহের পুতলী সিরাজকে পেলে করতাম।

শমসের খান আবার বলে—নির্দেশ।

পাগল বলে—এই রমণীদের বে-পরদাভাবে উন্মুক্ত রাজপথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নগরের সব বয়সের মানুষেরা এই পর্দানশীনদের দেখবে লালসার চোখে।

হঠাৎ নিজের আনন্দেই পাগল হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। তার হাসির মধ্যেই প্রতিধ্বনি হয়।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! আজ আমার মন বড আনন্দে পূর্ণ হচ্ছে। শুধু এইদিন, এইদিনটির অপেক্ষায় আমি নেকড়ে বাঘের মতো থাবা ধরে অপেক্ষা করেছি।

তারপর লোক দেখতে পায়—নবাব পরিবারের পর্দানশীনাদের। যাদের কখনও দেখা যায় না। যারা শুধু প্রাসাদের গভীর অংশে থাকে। যখন বাইরে যায় তখন ঢাকা পাল্কীর মধ্যে থাকে। কখনও সেই পাল্কীর গায়ের পুরো পরদাটা উড়ে গিয়ে একটুখানি বেরিয়ে পড়ে না কারও সুরত।

সেই মেয়েদের নগরের লোক দেখে কাতার দিয়ে এসে পথের দু'পাশে দাঁড়ায়।

নগরের লোকেরা বলে—বাঃ কি দেখলুম? আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম। নবাব পরিবারের মেয়েদের এতো রূপ! আরে ওরা কি খায়! কি দিয়ে গায়ের চামড়া এত ঝকঝকে করে। বাঃ যদি পেতুম একটাকে, তাহলে জড়িয়ে ধরে চিরকালের জন্য পড়ে থাকতুম!

একজন বলে—দেখ, দেখ, রোদ্দুর লেগে চামড়া কেমন লাল হয়ে উঠেছে। ঠিক যেন কাশ্মীরী আপেলের মতো। ইচ্ছে করছে কামড়ে ধরে এক খাবলা তুলে নি।

আমিনা আর ভাবতে পারে না কিছু। দেখছেও না কোন দিকে তাকিয়ে। তার ওড়নাটি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সে লজ্জায় মাথা মাটির তলায় নামিয়ে দিয়ে

দু'হাতে বুক ঢেকে চলেছে। আর ডাকছে মনে মনে বাবাকে।

শমসের ও সেই পাগল মেয়েদের সারির পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। আর সবাই ঘোড়ার পিঠে। পিছনে আরও অনেক শকট যান। তাতে বহুমূল্য লুণ্ঠনের সামগ্রী।

পাগল চলতে চলতে শমসেরকে বলে—সর্দার ভাবছ কি? এরপর আলিবর্দীর মেয়ে তোমার। তুমি তাকে নিয়ে যা খুশী করতে পার। আমি শুধু চাই আহম্মদকে। তাকেনিজের হাতে তিলে তিলে অত্যাচার করে একদিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেব।

হাজী আহম্মদও ছিল বন্দী অবস্থায় একটি শকটের মধ্যে। সেইদিকে তাকিয়ে পাগল হঠাৎ থু থু ছেটায়।

আলিবর্দীর বাহিনী যখন পাটনায় গিয়ে পৌঁছোয় তখন দুটি নৃশংস ঘটনাই ঘটে গেছে।

একটি হাজী আহম্মদ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

ইতিহাস বলে: হাজী আহম্মদকে আফগানরা বহু অত্যাচার করে হত্যা করেছিল কিন্তু ভুল। ঐতিহাসিকরা ওতো খুঁটিয়ে বিচার করেন না। তাছাড়া তাঁরা প্রমাণ দিতে গেলে ঐ পাগলের পরিচয় নিয়েও ইতিহাসকারদের মাথা ঘামাতে হত। তাই তাঁরা এক কলমে লিখে শেষ করেছিলেন—'আফগানরা হাজী আহম্মদকে দারুণ নৃশংস ভাবে অত্যাচার করে হত্যা করেছে।'

কিন্তু তা যে নয় তার প্রমাণ, ঐ পাগল।

শমসের খান ও সরদার খান সম্পূর্ণ হাজী আহম্মদের ভার ঐ পাগলের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। বুড়োকে নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না।

পাগল হাজীকে একা পেয়ে যেন বর্তে যায়।

বৃদ্ধ হাজীর ওপর অত্যাচার করেছিল পাগল ঠিক যেমন করে একদিন হাজী পাগলের ওপর অত্যাচার করেছিল।

একটি তাগড়াই লোককে ডেকে পাগল বলেছিল—যতক্ষণ না এই শয়তান জ্ঞান হারায় ওকে চাবুক চালিয়ে যাও।

চাবুকের আঘাতে আঘাতে বৃদ্ধ হাজীর দেহের চামড়া ফুলে ফুলে ওঠে। তা থেকে রক্ত ঝরে। হাজী আহম্মদ সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারায়।

তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার চাবুক চালান হয়। আর পাগল আনন্দে অট্টহাস্য করে ওঠে।

এইভাবে দিনের পর দিন চলে। হাজী আর সহ্য করতে পারে না হাত জোড করে মিনতির ভঙ্গিতে বলে, আমার কসুর মাপ করে দাও দোস্ত।

দোস্ত! পাগল হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। সেদিন তুমি আমার কসুর মাপ করেছিলে?

কে তুমি, পরিচয় দাও? হাজী যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলে।

আমি তোমার দুষমণ। এ ছাড়া আজ আর আমার কোন পরিচয় নেই। শুধু

এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলাম। মনের জ্বালা কিছুতে নেভাতে পারিনি তাই বেঁচে আছি। এবার তুমিও মরবে, আমিও মরব।

হঠাৎ পাগল হাজীর দু'চোখ অন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে। তার যেমন একটি চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল তেমনি সে নেবে দুটি চোখ। এই কথা ভেবে রক্ষীকে বলে—আগুন নিয়ে এসো। আর দুটো বড় বড় শলাকা। সেই শলাকা লাল করে হাজীর দু'চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

অন্ধ হাজী পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু আল্লাকে ডাকে।

আর অট্টহাস্য করে পাগল।

অন্ধ হবার আগে দু' চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টি দিয়ে হাজী পাগলকে চিনতে পেরেছিল।

চিনতে পেরে বার বার ক্ষমা চেয়েছিল কিন্তু পাগল ক্ষমা করে নি।

অনেক যন্ত্রণার মধ্যে হাজী এক অন্ধকার বন্দীশালায় বসে মৃত্যু কামনা করেছে। একদিন গভীর রাত্রে প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে আমিনা তার ঘরে আসে।

অন্ধ হাজী বলে—কে?

আমি আমিনা বাবা।

আমিনা, মেয়ে বেটি। আমি আজ অন্ধ। আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

আপনার যন্ত্রণার খবর পেয়েই আমি অনেক কষ্টে এসেছি। এদের কাছে মুক্তি পাওয়া বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। এই বলে ওড়নার খুঁটে বাধা একটি কাগজের মোড়ক খুলে আমিনা বলে—বাবা, একটু হা করুন তো।

অন্ধ হাজী হা করে বলে - কি দিচ্ছ মা আমার মুখে?

আমিনা কোন রকমে চোখের জল সংবরণ করে দাঁতে দাঁত চেপে বলে—আপনার চির আরামের ওষুধ।

তখন হাজীর দেহের মধ্যে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বৃদ্ধ হাজী চিৎকার করে বলে—বেটি, তুমি আমাকে বিষ দিলে?

হ্যা, দিলাম বাবা। এ ছাড়া উপায় কি?

আমিনা আর এক মুহূর্ত দাড়ায় না। ওড়নাটা মুখের ওপর ঢাকা দিয়ে সে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পাগল খবর পেয়ে আপসোস করে। আরও সতর্কতা অবলম্বন করলে এত তাড়াতাড়ি হাজী তার কাছে থেকে পালাতে পারত না।

তারপর আর পাগলকে কেউ আফগানদের মধ্যে দেখতে পায় না।

আলিবর্দী তখন বিরাট বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেছেন। খবর চলে এসেছে আফগানদের মধ্যে। তারাও প্রস্তুত হচ্ছে নবাবের সঙ্গে লড়বার জন্যে।

কিন্তু ওদিকে সর্দার শমসের খানের মনে শান্তি নেই। তার মনে কি যেন ঢুকেছে। তার বেগমরাও বুঝতে পারছে না স্বামীর মনের খবর।

শমসের খান অস্ত্র ছেড়ে শুধু সরাবের পেয়ালা মুখে তুলেছে। আর নর্তকীদের

বলছে—নাচো। আচ্ছাসে এক দিল উজাড় করা নাচ দেখাও।

নর্তকী নাচছে। তার ঘাঘরা ঘুরছে। তার নিটোল দুটি পা অনাবৃত হয়ে শমসেরের চোখের সামনে নগ্ন হয়ে যাচ্ছে। তবু শমসের খুশি হচ্ছে না। তার খুশি যে কি কেউ জানে না। তার খুশির জন্যে কেউ চেষ্টাও করে না।

হঠাৎ একদিন শমসের অনেক ভেবে আলিবর্দীর বেটির দিকে এগিয়ে যায়।

তবে পাঠক জানেন, আমিনার তার পরের স্বভাব। ঘসেটি বেগমের প্রণয়ী হোসেন কুলীর সঙ্গে প্রণয, এতো ইতিহাস স্বীকার করে। সে যাই হোক, আলিবর্দী এসে সবাইকে উদ্ধার করেন।

মেয়ের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টির ফোকাস ফেলে জানতে চান—কই গরবর ?

আমিনা মাথা হেঁট করে শুধু বাবাকে সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু আলিবর্দী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন সবই। তাই শমসের খানকে হত্যা করার সময় তিনি তরবারীটা খুবজোরেই তার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

বিজয়ী নবাব আলিবর্দী এসব কথাই প্রাসাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন। তাঁর মনটাও খুব প্রফুল্ল নয়।

তারপর অতর্কিতে এই পাগলের কাণ্ড। তার মনে পড়ে গেল, কে যেন এক পাগল তাঁর দাদার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। তখন তিনি রক্ষীদের আদেশ দিয়েছেন—ওকে যেমন করে হোক আমার কাছে এনে হাজির কর।

সশস্ত্র রক্ষী ছুটে চলেছে পাগলের পিছন পিছন।

পাগল ছুটছে পবিত্রাহি। হঠাৎ মাঝখানে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। পাগলের শক্তির কাছে কেউ পারল না। পাগল একাই একজনের খাপ থেকে তরবারী টেনে নিয়ে কজনের মহড়া নিয়ে নিল। কজন রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পাগল আবার ছুটল। নবাব প্যালেস থেকে দূরে ভাগীরথীর দিকে এগিয়ে চলল পাগল। আর তার মুখে শুধু চিৎকার প্রতিশোধ প্রতিশোধ। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে পাগল কেঁদে উঠল।

এই সময় একজন তার শরীর লক্ষ্য করে দূর থেকে একটা বর্শা ছুঁড়ল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। পাগল ঘুরে পড়ে গেল। তারপর সে আর উঠে আত্মরক্ষা করতে পারল না। আত্মরক্ষা করতে চাইলও না সে। রক্ষীরা যখন এসে বার বার তাকে আঘাত করতে লাগল, তখন সে শুধু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে বলল—আজ আর আমার মরতে কোন দুঃখ নেই। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি।

আলিবর্দীর কাছে যখন মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল তখন তিনি রক্ষীদের ওপর চটে উঠলেন। বললেন—একেবারে খতম করে আনলে ? একে জীবিত আনতে পারলে না ? জীবিত আনলে জিজ্ঞেস করতাম কি তোমার কাহিনী ! কেন তুমি প্রতিশোধের জন্যে এতো পাগল হয়ে উঠেছিলে ?

আলিবর্দী আজ সব ভুলে গেছেন। আজ তিনি সরল প্রাণ। প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। প্রজাদের ভাল করার জন্যেই তাঁর প্রাণমন সব সময়ে কাঁদে। কিন্তু নবাবী পাওয়ার আগের কাহিনী?

নবাবী পেতে গিয়ে, মসনদের লোভের সিংহাসনে বসতে গিয়ে যে চক্রান্তের মাঝে নিজেকেও ঢোকাতে হয়েছিল, সে কথা ভুলে যান কেমন করে?

সেইজন্য এবার আমাদের চলে যেতে হবে অতীতে। সেই অতীত থেকে তুলে আনতে হবে কিছু ছিন্নমালা।

মুর্শিদাবাদ থেকে বেশ কিছুদূরে চরমারি গ্রাম।

চরমারিতে যেতে গেলে ভাগীরথীর তীর ধরে ঘোড়সওয়ার হয়ে যাওয়াই সুবিধে। হাঁটাপথে যাওয়া যায়, তবে ঘুরপথ। আর জলপথে পালতোলা নৌকায় গেলে সকালে বসে সন্ধ্যায় পৌঁছান যায়। তবে নদীতে ভাঁটার টান থাকলে সময়ে কিছু হেরফের হয়।

ছোট একটি গ্রাম। বাংলাদেশের গ্রামের যেমন চেহারা এরও তাই। তবে এই গ্রামের বিশেষত্ব চৌধুরীদের বাড়ী।

বাড়ী নয়, প্রাসাদ।

গ্রামের লোক চলতে চলতে এই প্রাসাদের সামনে দাঁড়ায়। কি ভেবে যেন জোড় হাত করে নমস্কার করে আবার চলতে থাকে।

বহু গল্প আছে এই প্রাসাদকে ঘিরে। গল্প বলেন গ্রামের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা।

সাদা চুলের মাথা নিয়ে থুনথুনে বুড়ি ফোকলা দাঁতে তাঁর নাতিনাতনীদের বলে যান। আমার তখন বয়স ছোট, এই চৌধুরী বাড়ী আগের মত এত ঝুরঝুরে ভাঙা ছিল না।

ইয়া ইয়া থামওয়ালা বাড়ী। বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার কারও হুকুম ছিল না। সব ঝাঁকড়া চুলওয়ালা, মোটা মোটা গোঁফের মোটা মোটা লোক দিনরাত সেই বাড়ীতে ঘুরে বেড়াত। আর রায়বল্লভ চৌধুরী।

রায়বল্লভ চৌধুরীকেও একবার দেখেছিলাম। তখন আমি ঝড়ের তাণ্ডব শুনে এক বাগানে আম কুড়োতে গেছি।

কাপড়ের কোঁচড়ে ভর্তি আম নিয়ে ফিরছি, হঠাৎ এক ঘোড়সওয়ারের সামনে পড়ে গেলাম।

ভয়ের চোটে আমগুলো কোঁচড় থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমিও

গড়াগড়ি দিলাম।

কিন্তু হঠাৎ দেখি, ঘোড়সওয়ার মাটিতে নেমে পড়েছে। পরিশ্রমে কপাল দিয়ে তাঁর ঘাম ঝরছে। কিন্তু কি সুন্দর দেখতে! যেমন গায়ের রঙ, তেমনি লম্বাচওড়া চেহারা। আর পরণে এক উজ্জ্বল পোশাক। যেন রাজপুত্র মনে হয়।

ঠাকুমা হেসে বললেন—তখন রাজপুত্রের গল্পই তো শুনতাম। রাজপুত্র ঘোড়ায় করে এসে রাজকুমারীকে সোনার কাঠি ছোঁয়া দিয়ে বাঁচিয়ে তোলে। আমার মনে হল যেন আমাকেও রাজপুত্র সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে বাঁচিয়ে তুললো।

মুগ্ধ বিস্ময়ে রাজকুমারকে দেখছি। আমগুলি পথের ওপর গড়াচ্ছে। ঝড়ের তাণ্ডবও কমে গেছে।

হঠাৎ দেখি রাজপুত্র পথের ওপর পড়ে থাকা আমগুলি কুড়োচ্ছে। কুড়িয়ে আমার কোঁচড়ে ভর্তি করে দিয়ে বলল—তুমি কোথায় থাক।

আমি দেখালাম ঐ দূরে বকুল গাছের তলায় আমাদের পাতায় ছাওয়া বাড়ীটা।

রাজপুত্র বলল—আমাকে চেনো? আমি থাকি ঐ বড় বাড়ীটার ভেতর। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?

আমি জানি ঐ বড় বাড়ীটার ভেতর যারা থাকে তারা রাতের অন্ধকারে ডাকাতি করে। গ্রামের লোক সেইরকমই সব বলাবলি করে। লোক জানে ওরা ব্যবসা করে। পাট, তামাক, মশলা, রেশম নানাবিধ ব্যবসা, কিন্তু সে সব ব্যবসা লোকচক্ষুর সামনে। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ব্যবসা হয় সে ব্যবসা ডাকাতি। কতদিন রাতে ঐ বাড়ীর ভেতর থেকে শোনা গেছে, নারীপুরুষের মর্মভেদী আর্তনাদ।

তাই ভয়ে ভয়ে বললাম—তুমি ঐ বাড়ীতে থাকো? তাহলে তুমি ডাকাতি করো।

আর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল—তোমাকে কে ওসব কথা বললো?

কেন সবাই তো বলে? ও বাড়ীতে ডাকাত থাকে।

ছোটবেলায় আমার মুখখানা ছিল ভারী সুন্দর। সেই রাজপুত্র আমার চিবুক ধরে বলল—লোকের কথা শুনো না।

তারপর একটু ভেবে বলল—আর যদি ডাকাতই থাকে, তবে তোমার কি? তুমি আমার সঙ্গে যাবে, খেলা করবে. তোমার মতো আরও একটি মেয়ে আছে আমাদের বাড়ীতে। মধুমালতী। দেখবে তার সঙ্গে তোমার খুব ভাব হয়ে যাবে।

হঠাৎ সেই পথে কে যেন আসছে। চট করে রাজকুমার ঘোড়ার ওপর উঠে বলে—তাহলে তুমি গেলে না তো?

সেই মানুষ যাবার সময় তাঁর নাম বলেছিল। যদি কখনও ইচ্ছে হয় ঐ বাড়ীতে যেও, এই কথা বলে চলে গিয়েছিল।

ঠাকুমা অনেক দূর থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—আর কখনও সেই মানুষের সঙ্গে দেখা হয়নি।

তাছাড়া অত্তো বড় বাড়ী। ও বাড়ীর ইতিহাস যেমন রহস্যের মধ্যে ঢাকা, ও বাড়ীর ধারে-কাছে গ্রামের লোক কেউ যেত না।

কিন্তু ঐ যে লোকে যেতে যেতে হাত জোড় করে নমস্কার করে? ওটা কেন করে?

ওটা একটা কেমন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

নমস্কার করে হয়তো ওদের মতো সৌভাগ্য যেন জীবনে হয় এমনি ধরনের কোন কামনা কারো কারো থাকে।

সেই বাড়ীর এখন কর্তা রাঘব চৌধুরী।

পুরোনো ব্যবসাগুলিই রাঘব চৌধুরী ঘষে মেজে চালিয়ে চলেছেন। আগের মতো প্রতিপত্তি নেই বলে বাড়ীটাও দিন-দিন সংস্কার অভাবে ভেঙে ধুঁইয়ে আসছে।

তাছাড়া খরচ অঢেল। একদল লেঠেল থাকে বাড়ী পাহারা দিতে। সেই লেঠেলদের খরচ জোগাতে রাঘব চৌধুরী প্রাণান্ত। তব তাঁর আশা তিনি কিছু করবেন। চিরকাল চৌধুরীরা কিছু করে এসেছে। করে কবে চরমারির মত্তো এক ছোট্ট গ্রামের বুকে তিন মহল্লা বাড়ী।

তবু রাঘব চৌধুরী পূর্বপুরুষদের মতো রাতের নিশাচর হবেন না বলে ঠিক করেন।

এদিকে ব্যবসাটাও কোন দিক দিয়ে বাড়ানো যায় তারও কোন পন্থা দেখতে পান না।

বিরাট প্রাসাদের অধিক অংশ ঘরই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বাসোপযোগী যে কটা আছে তাতেই তিনি বাস করেন। তবু মনের মধ্যে শান্তি পান না।

ছোটবেলায় বাবার আমলে দেখে এসেছেন, সমস্ত প্রাসাদটাই কি এক সুখে, আনন্দে জমজমাট হয়ে থাকত।

সন্ধ্যে থেকে ঘরে ঘরে রাজার বাড়ীর মতো বাতিদানে আলো জ্বলত। লোকে পূর্ণ থাকত সমস্ত বাড়ীটা। কাছারী বাড়ী আজও একটা আছে, তবে সেখানে আগের মতো নেই কোন কর্মোদ্যম।

বাড়ীর মধ্যে চৌধুরী বংশের বউ নির্মলা। রাঘব চৌধুরীর এক মেয়ে, দুই ছেলে। ছেলে দুটি ছোট। একটার বয়স তেরো, আর একটার দশ। শুধু মেয়ে সুভদ্রাই এই পনেরো উত্তীর্ণ হয়ে ষোলোয় পড়েছে।

আর আছেন রাঘব চৌধুরীর একমাত্র বিধবা বোন মহামায়া ও তাঁর মেয়ে সরলা। সরলাও সুভদ্রার মতো বয়সী, তবে সুভদ্রার চেয়ে বড নয়, ছোট।

মহামায়ার বিয়ে হয়েছিল বেশ অবস্থাপন্ন ঘরে। কিন্তু অকালে স্বামী মারা যায়। তখন সরলা আট বছরের। ঐ একটি সন্তানই মহামায়ার হয়েছিল।

রাঘব চৌধুরী একদিন কুসুমপুরে গিয়ে বোন ও বোনঝিকে নিয়ে এলেন। এসে বললেন—মায়া, তোমাদের আর ওখানে থাকতে হবে না। আমি যখন বেঁচে আছি, তখন বাকী জীবনটা আমার কাছেই থাকবে।

কুসুমপুরে যে জায়গা-জমি ছিল তার জন্য একটি লোক নিযুক্ত করলেন রাঘব

চৌধুরী।

সেই থেকে মহামায়া ও তাঁর মেয়ে রাঘব চৌধুরীর সংসারেই রয়ে গেছে।

সেও আজ কম দিনের কথা নয়।

এখন সরলা সেই আট থেকে পনেরোয় পড়েছে।

মেয়েরা বড় হয়েছে।

মেয়েরা বড় হতেই তিনি অন্দর মহলের ব্যবস্থা আলাদা করলেন।

অন্দরের মহলটি চৌধুরী বাড়ীতে বরাবর আলাদাই ছিল, তবে কোন নিষেধের বেড়া দিয়ে আলাদা করা ছিল না।

সুভদ্রা ও সরলা চৌধুরী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে খেলা করত।

সে সময়ে মেয়েদের পড়াশুনার রেওয়াজ ছিল না। তাই সুভদ্রা ও সরলা কোন পডাশুনা করেনি।

তারা শুধু মাটির পুতুল খেলেই দিন কাটাত। পুতুল খেলতে খেলতে, আর মাটির ঢেলা দিয়ে ছেলেমানুষের রান্নাবাডী খেলতে খেলতে একদিন রাঘব চৌধুরীর কডা নিদেশই শুনল—ভদ্রা ও সরু, তোমরা আর বাইরে যাবে না।

এই ক'বছরের মধ্যে সুভদ্রা ও সরলার দুটি আলাদা স্বভাব তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ছোটবেলাকার স্বভাব প্রায় একরকম হয়। তারতম্য ঠিক বোঝা যায় না। বড় হ'তে দেখা গেল সুভদ্রা একটু স্বভাবধর্মে চাপা হয়েছে। হাসে, সে হাসি খুব প্রাণখোলা নয়, কথা বলে—অর্ধেক কথা পেটে আর অর্ধেক কথা মুখে।

কিন্তু তার ঠিক বিপরীত সরলা। সরলা খিলখিল করে হাসে। জোরে জোরে কথা বলে, দাপিয়ে দাপিয়ে চলে। কাপড়-চোপড বয়সকালের মেয়ের ঠিক ঠিক জায়গায় থাকে না।

মহামায়া মেয়ের এই নির্লজ্জ স্বভাবে বারবার চোখ পাকান। সরু, বড় হয়েছ?

বড হয়েছি তো কি মা? সরলা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

মহামায়া স্পষ্ট কথা মেয়েকে বলতে পারেন না। কেমন যেন লজ্জা পান।

তবু তাদের বাইরে বেরোনোর ব্যাপারে কোন কড়াকড়ি ছিল না। গ্রামে তাদের মতো বয়সী মেয়েদের কারও কারও বিয়ে হল। তাদের চেয়ে কম বয়সী মেয়েদেরও হল।

বিয়েওলা বন্ধুরা শ্বশুরঘর থেকে ফিরে এসে অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শোনাল।

সরলা বড় বড চোখ করে শুনল। খিলখিল করে হাসল। রাঙা হয়ে বলল, তোদের বর তো ভারী দুষ্টু!

সুভদ্রা সরলাকে লজ্জায় ধমকায়। তুই কিরে সরু? তোর কি কোন লজ্জা-সরম নেই?

তারপর গ্রামের মুক্ত বাতাস। সবুজ গাছপালা। পাখীর কূজনের সাথেও এই দুটি মেয়ের যেন মনের সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ঝড় ওঠে গাছে গাছে। ফুলে ফলে ভরে যায় গাছগাছালি। গ্রামের পুকুরে বৌ-ঝিরা জলে পড়ে মাতামাতি করে।

চৌধুরী বাড়ীর দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পুকুর ঘাটে। পুকুরে তাদের নামতে মানা। গাছে তাদের উঠতে মানা।

তবু তারা চুপি চুপি পুকুরে নামে, গাছে ওঠে। ময়না, বুলবুল, টিয়া নানা ধরনের পাখীর পিছন পিছন ঘুরে ছোটাছুটি করে। স্বর নকল করে ডাকে।

খেলাঘরে বউ-বর খেলে।

বউ রাগ করে, বর অভিমান ভাঙায়।

সেই বউ-বর খেলতে খেলতে কত মেয়ের সত্যিকারের বিয়ে হয়ে যায়।

সুভদ্রা, সরলার দুঃখ হয়। সেই মেয়েটির জন্যে কদ্দিন ধরে মনটা কেমন করে. আবার সব পুরোন দিনের মতো ঠিক হয়ে যায়।

সেই রাঘব চৌধুরী একদিন বললেন—ভদ্রা ও সরু, আর বাইরে যাবে না।

সুভদ্রা বাবাকে ভয় করে। সরলা মামাকে।

এ বাড়ীর ইতিহাস তাদের শোনা আছে। এ বাড়ীর পূর্বপুরুষরা নাকি ডাকাত ছিল।

এখনও আছে মাটির তলায় অনেক চোরকুঠরী। সে চোরকুঠরীর দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার তালায় মরচে পড়ে গেছে।

ওরা শোনে, ঐ সব চোরকুঠরীর মধ্যে আগে কত নারী পুরুষকে দিনের পর দিন ধরে বন্দী করে রাখা হত। ঐ সব চোরকুঠরীর মধ্যে বিষধর সাপ ছিল। তারা ছোবল দিয়ে সেই নারীপুরুষের দেহ নীলবর্ণ করে দিত।

বাবাকে দেখে ভয় করে সেই জন্যে সুভদ্রার। মামাকে ভয় করে সেইজন্যে সরলার।

তাছাড়া রাঘব চৌধুরীর চেহারাটাই খানিকটা ভয়ের মতো। দশাসই মানুষ। বিশাল বুকের ছাতি। ফর্সা রঙ, পুড়ে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। চওড়া মুখের ওপর সবচেয়ে দৃশ্যমান দুটি বড় বড় চোখ, আর বিরাট এক গোঁফের ঝোড়া।

আর যখন রাঘব চৌধুরী লেঠেল সর্দার গোবিন্দ ঢালীর সঙ্গে লাঠি খেলেন সে দেখবার মতো।

লেঠেল সর্দার গোবিন্দ ঢালীও তেমনি। একমাথা ঝাকড়া চুল। মিশমিশে কালো চেহারা। কালোর ওপর তেলের প্রলেপ। আর ভাঁটার মতো দুটি চোখ। চোখ থেকে বেরোচ্ছে যেন আগুন। সেই আগুন-জ্বালা চোখে যখন লাঠি ধরে সে লাঠি ও শত্রুকেই ঘায়েল করে।

রাঘব চৌধুরী তার সঙ্গে লাঠি খেলেন।

দুটো লাঠি দুজনে ধরে যখন পরস্পরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ভয়ে সবাই শিউরে ওঠে।

দুজনে লাঠি থেকে যেন আগুন বেরোয়। রাঘব চৌধুরীও গোবিন্দ ঢালী হয়ে যান।

তবু কসরৎ এক সময়ে থামে।

রাঘব চৌধুরীর বিশাল দেহটা উত্তেজনায় যেন আরও বিশাল হয়।

সেই বিশাল চেহারা দেখে সুভদ্রা ও সরলা কথা বলতে পারে না।

তাছাড়া, এই মানুষটির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা কম।

মানুষটির বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধই বেশী। সারাদিন ব্যবসার কাজে বাইরে থাকেন। দুপুরবেলা বাড়ীও ফেরেন না। তাঁর ভাত যায় নদীর ঘাটে। যেখানে নৌকা বোঝাই হয়ে মাল দেশবিদেশে যায়।

সুমন্ত, দুষ্মন্তও খুব একটা বাড়ীর মধ্যে থাকে না। তারা পাঠশালায় যায়। পণ্ডিত আসেন পড়াতে। তারা পড়াশুনা নিয়েই সব সময় কাটিয়ে দেয়। ভেতরে আসেও তারা খুব রাত্রে।

এই রাঘব চৌধুরীই একদিন হুকুম দিলেন। আর সে হুকুম বড চরম।

সুভদ্রা মাথা হেঁট করে বাবার সামনে থেকে সরে গেল।

কিন্তু সরলা গেল না।

সরলা বুঝতে পারল, এবার বাইরের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ শেষ। এবার তাদের এই চার-দেওয়াল-ঘেরা বিশাল বাডীর অন্ধ কোটরে কোটরেই ঘুরে বেড়াতে হবে।

এই বিশাল বাডীর খিলানগুলি তার কিছুতে পছন্দ নয়। গুটি কয়েকমাত্র লোক। কে কোথায় ঢুকে থাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার ওপর কেমন ভয় করে। দরজা-বন্ধওয়াল ঘরগুলো যেন রাজ্যের হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই বাড়ীতে বন্দী হয়ে থাকতে হবে শুনে তাদের কান্না পায়।

তাই মামাবাবুকে ভয় করেও সে মামাবাবুর নিষেধ মানতে পারে না।

রাঘব চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—মামাবাবু, কেন?

রাঘব চৌধুরী তাকান বোনঝির দিকে।

প্রকৃতির নিয়মে এরা বড় হয়ে উঠছে। এদের একদিন বিয়ে দিতে হবে। তবু সরলাকে তাঁর ভাল লাগে। মেয়েটা যেন সুভদ্রা নয়। সুভদ্রার মতো অতো শান্ত নয়।

সরলার দিকে তাকিয়ে তিনি পুরু ঠোঁটে অল্প হাসির রেখা টানেন—যতটা কণ্ঠ মোলায়েম করা যায় তেমনিভাবে বলেন—তোমরা বড় হচ্ছ না? এখন কি বাইরে ঘুরে বেড়ান শোভা পায়? তাছাড়া, তোমরা চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে।

সরলা সরে আসে মামাবাবুর কাছ থেকে।

তারা বড় হচ্ছে! হ্যাঁ, বড়ই তারা হয়েছে। এখন তারা নিজের কথা কাউকে বলতে পারে না। কেমন যেন দিন দিন পরিবর্তনটা মনের মধ্যে অদ্ভুত এক জোয়ার তুলছে।

তাদের মতো বয়সী অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এসে কেমন তারা পালটে যায়।

আর পুতুল খেলে না। খেলাঘরের রান্নাবাড়ী খেলা করে না। আর কোন কিছুতেই তাদের কোন সখ নেই। শুধু একজনের কথা বলে।

সুভদ্রার ভাবনাও বোধহয় এমনি এক কোন আবর্তে হাবুডুবু খায়। তবু সুভদ্রা চাপা। সুভদ্রা কথা বলে কম।

বাবার নিষেধ মেনে নিয়ে সে সেই অন্দরমহলের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়।

সরলা শুধু পারে না।

তবে স্বভাব চঞ্চল। সে স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না।

একদিন একটি বন্ধ ঘর সে খুলে ফেলে।

অন্ধকার ঘর থেকে এক ঝলক গুমোট বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে সে অবাক হয়ে যায়। ধূলোমলিন ঘরটি কি অদ্ভুত সাজানো। যেখানকার যেটি সেখানেই আছে।

সুন্দর কাজ করা পালঙ্ক। পালঙ্কের উপর সুন্দর বিছানা। মেহগনি কাঠের দেরাজ। কোণে কোণে রূপোর বাতিদান দেয়ালের হুকে টাঙান আছে। আর দেয়ালে আছে ঢাল, সড়কি, তরোয়াল নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র।

মেঝেতে পুরু একটি দামী ফরাস পাতা। ফরাসের ওপর কয়েকটি ভেলভেটের তাকিয়া। সবই ধূলিমলিন।

ও ঘরটি দেখে সে কেমন যেন ভয় পায়।

রাঘব চৌধুরী কতদিন বলেছেন—তোমরা কোন ঘর কোনদিন না জিজ্ঞেস করে খুলবে না।

সেই কথা ভেবে সরলা ঘর বন্ধ করে সরে আসে কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে জেগে উঠে।

কৌতূহল তাকে বারবার খোঁচা দেয়। তবু কৌতূহল সে প্রকাশ করে না।

এ বাড়ীর সবই রহস্যময়। এ বাড়ীতে থাকতে কেমন ইচ্ছে করে না।

তবু সে ঐ বাড়ীর মধ্যেই সামান্য একটু এক চিলতে আকাশের নীচে তার পাখীর মতো চঞ্চল স্বভাব মেলে দেয়।

সুভদ্রা এই মেয়েটির জ্বালায় চুপ করে থাকতে পারে না।

সরলা মাঝে মাঝে বলে, দিদি। মাঝে মাঝে সে মুখ রাঙিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বলে—দিদি না ছাই! মাত্র তো ক' মাসের বড়!

সুভদ্রা গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে বলে তাকে একটু বড়ই দেখায়। তাছাড়া তার গড়নটা মায়ের মতো নয়, বাপের মতো।

সরলা সে জায়গায় ছোটখাটো রোগা ধরনের মেয়ে। তবু দেখতে দুজনেই সুন্দর। সরলার মুখখানি আরও অদ্ভুত। সরলার মুখখানি যেন সদ্যফোটা ফুলের মতো কমনীয়। খানিকটা শিশুর সারল্যই মুখের ওপর খেলা করে।

শিশুই তো! যৌবনের যে মুকুলটি ফুটে আকাশ রাঙা করেছে, সে রঙে আকাশ ঘোর হয়।

সুভদ্রারও তাই। তবে সুভদ্রার মুখের ওপর গাম্ভীর্য এসেছে বলে মনে হয় সুভদ্রা বহুদিন বয়ঃসন্ধি পার করেছে। কিন্তু তা যে নয় সুভদ্রার মা নির্মলা তার প্রমাণ।

নির্মলা ও মহামায়ার মধ্যে সেই নিয়ে কথা হয়।

নির্মলা বলেন—ভদ্রার বিয়েই আগে দেওয়া উচিত।

মহামায়া বলেন—না বৌদি, সরুকেই কেমন যেন রাখা যায় না।

নির্মলা হাসেন সরলার কথায়।

সরলাকে সবাই ভালবাসে। এতো ছেলেমানুষ বুঝি বড় একটা দেখা যায় না।

নির্মলা হেসে বলেন—ওর কথা বল না ঠাকুরঝি, ও বড় ছেলেমানুষ।

মহামায়া রাগ করেন।

তোমরা শুধু ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বলেই ওর মাথাটা খেলে। ভদ্রার চেয়ে বয়েস কি ওর কম হল?

তা হোক্। নির্মলা বলেন। সরু এখনও ছেলেমানুষই আছে। ওর ওপর এখন সংসারের গুরুভার চাপিয়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না।

মহামায়া তবু রাগ করেন।

বারবার তার সরলাকেই সাবধান করতে হয়। সরলা, বুকে কাপড় দে। বাইরের দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস্ কেন? তোর কি লজ্জা বলে কিছু নেই?

সরলা কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপই করে না।

মায়ের কথা শুনে সে খিলখিল করে হেসে ওঠে। মায়ের কথাটা নকল করে বলে—'সরলা বুকে কাপড দে'।

হাসতে হাসতে তার বুকের কাপড়ই সরে যায়। পুষ্ট বুকটি হাসির দমকে দমকে জলের ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে!

মহামায়া গিয়ে দাঁড়ান রাঘব চৌধুরীর সামনে।

দাদা, সরুর বিয়ের একটা ব্যবস্থা কর। আমার কুসুমপুরের যা আছে তা বেচে দিয়ে ওকে অন্তত পার করে দাও।

রাঘব চৌধুরী এ কথাটা অনেকবার শুনেছেন। সেই সরলা বড হওয়ার আগে থেকেই শুনে আসছেন। তখন বোনের কথায় হেসেছেন। বলেছেন—আগে তোর মেয়ে বড় হোক।

সেই মেয়ে আজকে বড হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, ওদের মতো বয়সী মেয়েদের অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু চৌধুরী বাডীর মেয়ে বলে গ্রামের মধ্যে কোন কথা হয় না। কথা হয় কিনা তিনি জানেন না, তবে তিনি শুনতে পান না।

কিন্তু সরলার বিয়ের চেয়ে সুভদ্রার বিয়েই দেওয়া উচিত। ওর যেন গডনটা এই বয়সেই কেমন ভারী ভারী।

সেই সুভদ্রার জন্যেই তিনি চিন্তিত। বোন সরলার কথা বলতে তিনিও হাসেন।

হঠাৎ হল কি তোর মায়া?

তারপর ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে বলেন—আমার কাছে যখন আছিস, আমি কি তোর মেয়ের বিয়ে দেব না? তবু সরলা ছেলে মানুষ, ওর চেয়ে সুভদ্রার বিয়েটাই দেওয়া উচিত। তা পাত্র পেলে দুজনার এক সঙ্গেই ব্যবস্থা করব।

তাই কর দাদা, অন্তত নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি। মেয়েটার কথা ভেবে ভেবে যেন

চোখে ঘুম আসে না। তারপর কি রকম দস্যি হয়েছে দেখছ তো! কোন কথা শোনে না। শুধু হাসি আর বকর বকর।

রাঘব চৌধুরী হাসেন বোনের কথায়।

তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে যায়। রাঘব চৌধুরীর মনেই থাকে না, মেয়েদের বিয়ের কথা।

হঠাৎ তিনি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যান। সেই ব্যস্ততার মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে যান কেউ তাঁর খোঁজ পায় না।

শুধু ভোর থাকতে ঘোড়ার ওপর বসেন। কত রাত্রে ফিরে প্রাসাদের বার-মহলে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন। আবার কখন উঠে চলে যান কেউ জানে না।



এদিকে বাংলার রাজধানী নিয়ে তখন ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে।

নবাব মুর্শিদকুলী মারা গেছেন। নবাবী মসনদ দিয়ে গেছেন নাতি সরফরাজ খাঁকে। সরফরাজের বাবা সুজাউদ্দিন ছেলের বিরুদ্ধে লড়বেন বলে তৈরী হচ্ছেন।

সুজাউদ্দিনকে মুর্শিদকুলী নবাবী দিয়ে যাননি বিশেষ কতকগুলি কারণে। একমাত্র মেয়ে জিনৎউন্নিসার সঙ্গে সুজাউদ্দিনের বিয়ে দিয়েছিলেন অনেক আশা করে। একটি ছেলেও ছিল মুর্শিদকুলীর কিন্তু সে ছেলে বড় হয়ে যে জীবনকে গ্রহণ করেছিল, সে জীবন কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি নবাব মুর্শিদকুলী। তখন তিনি নবাবও হন নি, সামান্য এক কর্মচারী। মুঘল বাদশাহের অধীনে কাজ করেন। ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আশা নিয়ে শুধু পরিশ্রম করেই চলেছেন। সেই সময় তার পুত্র এক বিধবা রমণীর ওপর বলপ্রয়োগ করে। সেই রমণী মুর্শিদকুলীর কাছে বিচার প্রার্থনা করে।

মুর্শিদকুলী একমাত্র পুত্রের এই ব্যবহারে মর্মাহত হন কিন্তু ক্ষমা করেন না। নারীর ইজ্জত নেওয়ার শাস্তি প্রাণদণ্ড, এমনি এক বিচার করে পুত্রকে নিজের মনের কাছ থেকে বিদায় দিয়ে, চিরতরে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন।

সেই মুর্শিদকুলী। যিনি পূর্ব জীবনে ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। মুসলমান হয়েছিলেন আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে।

মুর্শিদাবাদের নবাব হয়েও জীবনের সাফল্যের পথ পেয়েও কখনও রমণীর প্রতি তিনি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি। বরং প্রজারা কেউ রমণীর অবমাননা করলে তার চরম শাস্তিই দিয়েছেন। সেই মানুষের জীবনেই একমাত্র মেয়ের সোহাগ, যাকে তিনি পুত্রের মতোই একদিন সব সৌভাগ্য দিয়ে যাবেন এমনি আশা নিয়ে নির্ব্বাচন করে-ছিলেন, সে-ই একসময় তাঁর কন্যাকে ভুলে অন্য নারীতে আসক্ত হল।

উড়িষ্যার সুবাদার করে দিয়েছিলেন মুর্শিদকুলী সুজাউদ্দিনকে। সুজাউদ্দিন সেই উড়িষ্যাতে বসেই উপরি পাওয়া সৌভাগ্য পেয়ে নারী ও সুরাতে আকণ্ঠ ডুবে গেলেন।

জিনৎ বার বার স্বামীকে ফেরানোর চেষ্টা করেন। বার বার বলেন—তুমি আমার বাবার বিরাগ ভাজন হও না।

সুজাউদ্দিন তখন অন্য নারীর রূপসুধা পান করে সুখের এক রঙীন দেশে বিচরণ করছেন। স্ত্রীর কথা শুনে বলেন—তোমার বাবা বৃদ্ধ, তাছাড়া ধর্মভীরু, তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান, আমার তো সে সব নেই। আমি তুর্কজাতির বংশধর। পেয়েছি নিজের কৃতিত্বে নবাব পরিবারের অধিকার। তুমি যেমন আছ তেমন থাকো. আমি আমার কাজ করে যাই!

কিন্তু জিনৎ বাবার মতই অহঙ্কারী ও বাবার ধর্মে বিশ্বাসী। তা ছাড়া কে চায় স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে স্ত্রীকে ভুলে যাক্? জিনৎ স্বামীর কাছে আর থাকেন না, বাবার কাছে মুর্শিদাবাদে চলে যান।

সেই মুর্শিদাবাদেই তাঁর জন্ম নেয় পুত্র সরফরাজ খাঁ। তাও সে অনেক দিনের কথা।

মুর্শিদকুলী জামাইয়ের ওপর চটেছিলেন অনেক আগেই। জামাইয়ের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখেন নি।

কিন্তু আর একবার ক্ষুব্ধ হন সুজাউদ্দিনের আর এক আচরণে।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কি রকম সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন মির্জা মহম্মদ বলে একজন লোক। লোকে বলে তিনি আওরঙ্গজেবের দুধ ভাই ছিলেন। সে যা'হোক আওরঙ্গজেব এই মির্জা মহম্মদকে তাঁর রাজকার্যে বহাল করেছিলেন।

মির্জা মহম্মদের দুটি ছেলে ছিল হাজী আহম্মদ ও আলিবর্দী। হাজী আহম্মদ বাদশাহের রত্নাগারের জহরৎ রক্ষকের চাকরী পান, আলিবর্দী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি পান সেনাবিভাগের কর্ম।

এই সময় মির্জা মহম্মদ চাকরী করতে করতে মারা যান।

হাজী ছিলেন ধূর্ত প্রকৃতির লোক। তিনি ভাগ্য কি করে ফেরানো যায় সেই চেষ্টা করতেন। সবদা ফিকিরে থাকতেন সেই দুর্লভ সুযোগ কেমন করে হাতে আসে।

এদিকে জহরতের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ ঝলসে যায়। হঠাৎ একদিন মতলব করলেন, এই জহরতই তাকে সরাতে হবে। এক পুঁটলী জহরত সরালেই অর্থশালী হতে পারবেন। তারপর কোন এক জায়গায় গিয়ে ব্যবসা ফাঁদলেই আমীর হয়ে যাবেন।

মতলব কাজে পরিণত হল। প্রহরীর সঙ্গে বখরার ব্যবস্থা করে এক পুঁটলী জহরৎ সরিয়ে ফেললেন। এবং সেই পুঁটলী নিয়েই পরিবার সঙ্গে করে আরবের পথে রওনা হলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌছতে পারলেন না। বাদশাহী ফৌজ তাঁর পিছন পিছন ধাওয়া করল।

বাদশাহ খবর পেয়ে হাজীকে বেঁধে আনতে হুকুম দিলেন। আওরঙ্গজেবের বিচারে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি চরম প্রাণদণ্ড।

ধৃত অপরাধী যখন বাদশাহের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন বাদশাহের মুখমণ্ডল রাগে রক্তবর্ণ। তিনি গম্ভীর হুঙ্কারধ্বনিতে বললেন, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মুঘল বিচারে কি আশা করি তুমি জানো?

হাজী কোন কথা বলতে পারেন না। শুধু মাথা হেঁট করে তাঁর কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ করেন।

অনুতাপ করেন কি? মুখ দেখে ঠিক বোঝা যায় না।

হঠাৎ বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি চুরি করতে গিয়েছিলে কেন?

এর আগে একদিন বাদশাহ হাজীর পরণে বাদশাহের মতো কাল আলখাল্লার পোষাক দেখে শুধিয়েছিলেন এ পোষাক পরার কারণ।

হাজী তার উত্তরে বলেছিলেন, এ পোষাকের ধর্ম খোদার কাছে প্রার্থনা।

বাদশাহ খুশি হয়ে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন—বহুৎ সুক্রিযা কিন্তু ইয়াদ রেখো, এ পোষাকের সম্মান রাখবে।

বাদশাহ হাজীর ঐ পোষাকের দিকে তাকিয়েই আরও ক্ষুব্ধ হলেন, চিৎকার করে বললেন—তুমি চুরি করেছিলে কেন?

হাজী জানেন, মৃত্যু ছাড়া বাদশাহের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নেই। হঠাৎ তাঁর মৃত্যুর আগেই কেমন সাহস এসে গেল। বললেন—হুজুর, চুরি না করলে তো ভাগ্য ফেরানো যায় না।

বাদশাহের রাগ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন—মতলব?

চিরকাল গোলামী করতে করতে গরীবই তো থেকে যাব। গরীব থাকতে কার সাধ যায়?

বাদশাহ কিছুক্ষণ হাজীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কি ভেবে বললেন—তুমি ভাগ্য ফেরাতে চাও?

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে পরিহাস কিনা বুঝতে পারেন না হাজী আহম্মদ। তবু বলেন—হুজুরের মেহেরবাণী।

কিন্তু সবাই তো গরীব থেকেই গোলামী করে যায়। তুমি ধনী হতে চাও কেন?

তারপর বাদশাহ বোধ হয় হাজী আহম্মদকে ধনী করবারই হুকুম দিচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কি স্মরণ হতে বলেন—না, তুমি ঘোর অপরাধে অপরাধী। তবু তুমি আশাবাদী। আশাবাদীকে প্রাণদণ্ড দিতে চাই না। তার আশাই তাকে সারাজীবন কুরে কুরে খাবে। তাই তোমায় নির্বাসন দণ্ড দিলাম, তুমি মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যাবে। কখনও কোন অবস্থায় তোমাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে না দেখি, তাহলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

হাজী তারপর তাঁর স্ত্রী পুত্র নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন। মক্কায ছাড়া বাঁচবার কোন উপায় নেই। অন্তত সেখানে অনাহারের কষ্ট তো থাকবে না।

আলিবর্দীরও চাকরী যায় ভাইয়ের অপরাধে। কিন্তু তিনি ভাইয়ের মত মক্কার পথে যান না। তা ছাড়া তাঁর প্রতি নিবাসন দণ্ড ছিল না। তিনি বাংলা দেশের

উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং এসে মুর্শিদাবাদে নবাব মুর্শিদকুলীর সঙ্গে দেখা করেন।

কিন্তু মুর্শিদকুলী মির্জা মহম্মদ পরিবারের অপকীর্তির কথা শুনেছিলেন। দরবার থেকে আলিবর্দীকে দারুণভাবে অপমানিত করে তাড়িয়ে দেন।

সেই আলিবর্দীকে জায়গা দেন সুজাউদ্দিন। সুজাউদ্দিনের সঙ্গেও আলিবর্দীর আত্মীয়তা সম্বন্ধ ছিল। আলিবর্দীর মা ছিলেন সুজাউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। আত্মীয়ার আত্মীয়র ওপর সুজাউদ্দিনের মন দ্রবীভূত হয়।

তা ছাড়া তিনি শুনেছিলেন, শ্বশুর মুর্শিদকুলী এঁকে জায়গা দেন নি। শ্বশুরের বিরুদ্ধে অনেকদিন ধরে মন বিরূপ হচ্ছিল, তা ছাড়া শ্বশুরের সমস্ত কাজের বিরুদ্ধাচরণ করবেন বলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সুযোগ সহজে আসতে আলীবর্দীকে সমাদরে সেনাবিভাগের কাজে বহাল করেন।

সুজাউদ্দিন উচ্ছৃঙ্খল, সুজাউদ্দিন বিলাসপ্রিয়, বিলাসব্যসনে সময় ব্যয় করতে পারলে আর কিছু চান না। তবু তিনি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক ছিলেন। নিজে শক্তি-বৃদ্ধি করার জন্যেও আলিবর্দীকে জায়গা দিলেন।

আলিবর্দী জায়গা পেয়ে বিশ্বস্ততারই পরিচয় দিয়েছিলেন। আলিবর্দী বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাছেও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। শুধু ভাইয়ের অপরাধেই তাঁকে অপরাধী হতে হয়েছিল।

আলিবর্দী একদিন সামান্য সেনা থেকে সেনাপ্রধান উপাধি পেলেন। ওদিকে দাদার কথাও তাঁর অজানা নয়। মক্কায় গিয়ে দাদা হাজী কি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে-ছেন, তার কটা চিঠিতেই আলিবর্দী জানতে পেরেছেন।

তাই একদিন সুজার কাছে দাদার কথা পেশ করলেন।

সুজাউদ্দিনের মনে সেই সংকল্প। দল ভারী করে একদিন শ্বশুরের সিংহাসন উদ্ধার করতে হবে।

নবাব মুর্শিদকুলী যে তাঁকে বাংলা উড়িষ্যার নবাবী দেবেন না তা তিনি জানেন। আলিবর্দীর প্রার্থনা শুনে তিনি লাফিযে উঠলেন।

এখুনি দ্রুতগামী সংবাদদাতাকে পাঠিয়ে দাও মহামান্য সেই হাজী আহম্মদকে উডিষ্যার দরবারে আমন্ত্রণ জানাবার জন্যে। দরকার হলে তাঁর জন্যে আমি প্রাসাদে উৎসবের সূচনা করব।

কিন্তু আলিবর্দী সুজাউদ্দিনকে কিছুই করতে দিলেন না। বড়ভাইকে পত্র লিখে দিলেন তাঁর পরিবার নিয়ে উডিষ্যায় সুজাউদ্দিনের দরবারে চলে আসার জন্যে।

যত সহজে ঘটনাগুলি একের পর এক লেখা হয়ে যাচ্ছে, তত সহজে ঘটে নি।

হাজী আহম্মদও সুদূর মক্কা থেকে এই বাংলাদেশে এসেছিলেন অনেক কষ্ট করে। মক্কা থেকে আসবার সময় বেগমকে মক্কার মাটিতেই গোর দিয়ে এসেছিলেন।

সুজা হাজীকে পেয়ে আনন্দিত। হাজীর সঙ্গে কথা বলে তিনি আরও সন্তুষ্ট।

হাজী অতি সহজেই সুজার দরবারে জাযগা পেলেন। এবং সুজার প্রধান উপদেষ্টা হয়ে কার্যভার গ্রহণ করলেন।

হাজীর তিন ছেলে তখন উপযুক্ত, তাদেরও উপযুক্ত পদ দিলেন সুজাউদ্দিন।

হাজীর পরণে সেই মোল্লার পোষাক। চোখ দুটি শুধু ঘোরে কিসের আশায় যেন। তাঁর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, আবার তার মনের মধ্যে কোন মতলব ঘুরছে।

আলিবর্দীকে ডেকেও একদিন বললেন—আমি যদি তোমাকে একদিন বাংলার নবাবী পাইয়ে দিই, তুমি বিনিময়ে কি দেবে?

বাংলার নবাবী!

তখন মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য ম্লান হয়ে এসেছে। আওরঙ্গজেব মারা গেছেন। তাঁর তিন ছেলে মুয়াজ্জম, আজম, কামবক্স পরস্পর যুদ্ধের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে। শেষে দুই ভাইকে মেরে মুয়াজ্জম বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেছেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ রাজকার্যে এতই অনুপযুক্ত যে তাকে লোকে 'শাহ ই বেখবর' অর্থাৎ বিবেক হীন রাজা উপাধি দিয়ে উপহাস করে।

তবু সেই বাহাদুর শাহই ক বছর রাজত্ব করলেন। তারপর তাঁর মৃত্যুর পর আবার সিংহাসন নিয়ে হানাহানি শুরু হল। এবার বাহাদুর শাহর চার ছেলে যুদ্ধে লিপ্ত। খবর যেটুকু বাংলাদেশে এসেছে তাতে জানা যায় বাহাদুর শাহর জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসনে বসবেন।

কিন্তু সেও যে কদিন থাকবেন তার ঠিক নেই।

সেই সময়ে হাজীর এই প্রস্তাবে আলিবর্দীর মনের মধ্যে লোভের ইসারা জাগে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভাইয়ের প্রস্তাবটা নাকচ করে দিতে পারেন না।

শুধু অন্যমনস্কের মতো বলেন—অসম্ভবটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

হাজীর মুখে তখন কুটিল হাসির রেখা। ভাইয়ের কাছে কোনো কথাই ফাঁস করেন না। শুধু বলেন—তুমি মসনদ চাও কিনা বলো?

মসনদ কে না চায়? এ তো সামান্য ধনী হওয়ার সুযোগ নয়, ধনীর ধন! তবু বলেন—না দাদা, ও সব করে কাজ নেই? শেষকালে কি হতে কি হয়ে যাবে, তারপর এই আশ্রয়টাও হারাব?

হাজী ভাইকে আশ্বাস দেন।

কিছু ভাবতে হবে না তুমি তোমার বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে যাও।

ইতিহাস আর এক জায়গায় নীরব হয়ে আছে। হাজী আহম্মদের যে একটি মেয়ে ছিল কোন ঐতিহাসিক তাঁর গ্রন্থে বলেন নি।

সেই মেয়ের নাম দৌলতী।

হাজী যখন উড়িষ্যায় সুজাউদ্দিনের দরবারের প্রধান উপদেষ্টা, তখন সে পূর্ণ যৌবনা।

সুজাউদ্দিন বিলাসপ্রিয় মানুষ। বিলাসের মধ্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করলে রাজকার্যও ভুলে যান।

হাজী আহম্মদ সুজাউদ্দিনের রাজকার্যের অনেক ভার নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন।

এই নেওয়ার জন্যেও স্মজাউদ্দিন খুশি, আবার যখন দেখলেন—রঙমহলে নিত্য নতুন মেয়ের আমদানী হচ্ছে, সেই মেয়ে কোথা থেকে আসছে কে দিচ্ছে জানতে পেরে আরও তিনি প্রধান উপদেষ্টার ওপর খুশি হয়ে উঠলেন।

হাজী আহম্মদকে ডেকে বললেন—উজীরসাহেব, আপনি যে আমাকে একেবারে দখল করে ফেললেন!

হাজী আহম্মদ ধূর্ত মানুষ, সবই বোঝেন, তবু না বোঝার ভান করেন।

নবাবসাহেব, আমি গোলামের গোলাম, আপনার সেবা করতে পারলেই এ জীবন ধন্য।

এই সব ভাল ভাল কথাই মোলায়েম ভঙ্গিতে বলতেন হাজী আহম্মদ।

তারপর দৌলতীর কথা।

হাজী আহম্মদ তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন খাস প্রাসাদেই। পরিবার বলতে মেয়ে আর তিনি। আর তিনটি ছেলে অন্যত্র থাকত।

আলিবর্দী বাইরে থাকতেন তাঁর পরিবার নিয়ে। কারণ তাঁর তখন মেয়ে তিনটি ডাগর হয় নি। হতেও বেশীদিন নেই? সেই ভয়ে বাইরে থাকাই বিবেচনা করেছিলেন।

হঠাৎ একদিন হাজী তাঁর মেয়েকে বললেন—দিনরাত ঘরে বসে বসে কি সব করো? প্রাসাদের চতুর্দিকে কত উদ্যান, ফুল বাগিচা পাখীর কুজন। সেখানে যেতে তোমার ভাল লাগে না?

পাঠক হয়ত বলবেন—এ হতে পারে না। বাপ তার মেয়েকে কখনও বিপদের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। তাহলে পাঠককে বলবো, হাজীর চরিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন। জীবনের সাফল্য আনতে গিয়ে, ফকির থেকে আমীর হতে গিয়ে তিনি কি কি করেছেন?

নিজের মেয়েকে নিয়েও এই রাজনীতির খেলা খেলেছিলেন।

দৌলতী পূর্ণ যৌবনা নারী। সৌন্দর্য খুব একটা রঙমহল সাজানোর মতো না হলেও যৌবনের জৌলুসে তাকে সুন্দর দেখাত।

তবে স্বভাবের দিক দিয়ে নম্র প্রকৃতির মেয়ে। দুটি ডাগর চোখের গভীর দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে থাকত।

বাবার কথা শুনে সে বুঝতে পারে না বাবার কথার অর্থ। একদিন বাবাই বলেছিলেন—দৌলত, এ সুবাদারের প্রাসাদ। চতুর্দিকে লোভের হাতছানি। নিজেকে খুব সামলে রাখবে।

আর এই বাবাই বলছেন—প্রাসাদের চতুর্দিকে কত কিছু ছড়িয়ে আছে, সেখানে ঘুরে বেড়াতে পার না!

দৌলতী আর কিছু না ভেবে প্রাসাদ উদ্যানেই ঘুরে বেড়ায়। সত্যিই, প্রাসাদের চতুর্দিকে কতকিছু দেখার জিনিস।

ফুলবাগিচায় ফুলের সমারোহ। গাছে গাছে নানাধরনের ফুল ফুটে আছে। সদ্য ফোটা

ফুলের সৌন্দর্যে বাগিচা রাঙা। সেই ফুলের দিকে ধেয়ে আসে ভোমরার দল।

কৃত্রিম ঝরণা থেকে জল উৎসারিত হয়ে চলেছে। বাতাসে কত ধরনের সুগন্ধ। দেওয়ালের ওপাশে কোথা থেকে যেন নারীকণ্ঠে গান ভেসে আসে। ভাল করে কথাগুলো ধরা যায় না কিন্তু সুর ধরা যায়।

দৌলতী এই সব শুনে মোহিত হয়। অপরাহ্নে ফুলবাগিচায় শ্বেতমর্মর বেদীতে বসে থাকে।

মাঝে মাঝে তার বাঁদী এসে মনিবাণীর কাছাকাছি থাকে।

সুজাউদ্দিন হাজী আহম্মদের থাকবার জন্যে বিশেষ ভাল ব্যবস্থাই করেছিলেন। দৌলতীর তাই কোন অভাব নেই।

দৌলতীর নবাবকে কখনও দেখতেও ইচ্ছে করে না। শুনেছিল মাঝে মাঝে নবাব এসব জায়গায় আসেন।

হঠাৎ একদিন দৌলতী অপরাহ্নে গোলাপ বাগিচায় বসে আছে, আশমানে গোধূলির খেলা চলেছে। পাখীরা উড়ে যাচ্ছে দূর দূর পথ দিয়ে।

তার বাঁদী কাছাকাছি কোথাও ছিল না। দৌলতী আকাশের দিকে কতকক্ষণ তন্ময় হয়েছিল সেও জানে না।

হঠাৎ চোখ পড়ল সবুজ মখমলের মতো ঘাসের ওপর। দূর থেকে লম্বা চওড়া কে একজন অদ্ভুত সুন্দর পোষাক পরে আসছেন।

মানুষটির অদ্ভুত সাজপোষাক দেখে দৌলতী কতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল জানে না, যখন সরে পড়তে গেলো তখন মানুষটি এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে।

সুজাউদ্দিন দৌলতীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি কে? কখনও তোমাকে এ প্রাসাদে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না?

সুজাউদ্দিন তাঁর স্বাভাবিক কামনার চোখেই তাকিয়েছিলেন। নিত্য নতুন মেয়ের আমদানীতে এমন হয়েছে যেন নিত্য নতুনই প্রবৃত্তিটা জেগে উঠছে। সেই চোখেই দৌলতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দৌলতী কখনও এমন পুরুষের সামনে দাঁড়ায় নি। নারী মনের তীব্র বেদনায় সে সঙ্কুচিত হয়ে সরে যেতে চাইল।

কিন্তু সুজাউদ্দিন দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি? তুমি কি রঙমহলে এসেছো নতুন যুবতী আওরত?

হঠাৎ দৌলতী মাথা নত করে সঙ্কুচিত হয়ে বলল, আমি উজীর সাহেবের বেটি দৌলতী হুজুর।

সুজাউদ্দিন কৌতুক অনুভব করেন।

ও আচ্ছা! তুমিই তাহলে উজিরসাহেবের বেটি!

পরক্ষণে বললেন সুজাউদ্দিন—আমাকে চেনো?

দৌলতী অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। মৃদুস্বরে বলল—আপনি নবাবসাহেব?

সুজাউদ্দিন দৌলতীর উপস্থিত বুদ্ধিতে খুশি হন—বলেন—বুঝলে কেমন করে?

দৌলতী চোখ তুলে মৃদু হাসে, তারপর বলে—আপনার পোষাক।

হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে ওঠেন সুজাউদ্দিন।

তারপর বলেন—তুমি উজীর সাহেবের বেটিই বটে।

হঠাৎ সুজাউদ্দিন কথা বন্ধ করে তার নারী ভোগ্য চোখে দৌলতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর মৃদু হাসি ওষ্ঠে নিয়ে বললেন—আমার অন্দর মহলে তুমি যাবে?

থর থর করে কেঁপে উঠল দৌলতী। ত্রস্তে চলে যেতে চাইল সেখান থেকে।

কিন্তু গতিরোধ করলেন সুজাউদ্দিন।

বললেন—ডর কিঁউ। তোমার বাবা আমার প্রিয়পাত্র। আমার এ প্রস্তাব তিনি রাখবেন। তুমি শুধু বলো তুমি রাজী আছ কিনা!

দৌলতীর চোখে জল এসেছিল। কণ্ঠ বুজে গিয়েছিল। বুকটা ধড়ফড় করেছিল। তারপর এক সময়ে অনেক কষ্টে চলে গিযেছিল লুব্ধ এক পুরুষের দৃষ্টির সামনে থেকে। কিন্তু চিরকালের জন্যে সে সরে যেতে পারে নি। তারপর কি হোল কেউ জানে না।

একদিন দৌলতী দেখল তার সামনে সুজাউদ্দিন। রাত গভীর। একটি সুন্দর সাজানো ঘর। কারা যেন তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে এসেছে। ফোলা ফোলা চোখের কোলে তখনও তন্দ্রার জড়তা।

হঠাৎ সুজাউদ্দিনকে মাতালের মতো টলতে টলতে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সে আর ঠিক থাকতে পারে না।

চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলে —আমায় বাঁচতে সাহায্য করুন নবাব। আমাকে এমন করে নষ্ট হতে দেবেন না।

কিন্তু তার কথা সমাপ্ত হয় না। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ঘর, আর মাতালের বুকের মাঝখানে দৌলতীর সব জোর নিমেষে মিলিয়ে যায়।

হাজী আহম্মদ অভিনয় করেন বাঁদীর সামনে। আস্ফালন করেন নবাবের এই স্পর্দ্ধা তিনি কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

ঘুমন্ত দৌলতীকে যখন সুজাউদ্দিনের লোকেরা ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল তখন বাঁদী সেখানে উপস্থিত ছিল। বাঁদী বাধা দেয় নি, শুধু চোখের জলে ভেসেছিল। এক নারী হয়ে আর এক নারীর এই অবস্থায় সে চোখের জল রোধ করতে পারে নি।

তারপর দৌলতীকে নিয়ে নবাবের লোকেরা চলে গেলে সে গিয়ে উজীর সাহেবকে খবর দিয়েছিল।

হাজী যেন কিছুই জানেন না, এমনি ধরনের আচরণ করেছিলেন। তারপর আস্ফালন করে বলেছিলেন—এর জন্যে সুজা খাঁকে উপযুক্ত জবাব দিতে হবে।

আর সুজা খাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পরদিন বলেছিলেন—আপনার সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

সুজাউদ্দিনও বুঝতে পারেননি এই মানুষটিকে। যে নিজের মেয়েকে দিয়েও অদ্ভুত শান্ত।

আলিবর্দী শুনে বলেছিলেন—দাদা, এ তুমি কি করলে? দৌলতীকে নবাবের কাছে দিতে তোমার এতটুকুও মনে লাগল না।

হাজী আহম্মদ ভায়ের কথায় চটে উঠেছিলেন।

আমি দৌলতীকে দিয়েছি, না সুজাউদ্দিনই দৌলতীকে কেড়ে নিযেছে?

তবু সে কাহিনীও বহুকাল আগের।

মুর্শিদকুলী মারা গেছেন। নবাবী গদি দিয়ে গেছেন নাতি সরফরাজ খাঁকে।

সুজাউদ্দিন শুধু এই দিনটির অপেক্ষায় ছিলেন কিন্তু এ দিন আসতে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লেন।

উজীরসাহেব, আপনি বহুদিন ধরে আমাকে সান্ত্বনা দিযে আসছেন। এবার কোন ব্যবস্থা করুন।

মহম্মদ শাহ দিল্লীর মসনদে। তাঁর কাছে মুর্শিদকুলী মরবার আগেই নাতির জন্যে সনন্দ আনতে লোক পাঠিয়েছেন। এ খবর হাজী আহম্মদের কাছে অজানা নয়। তাঁর লোকও দিল্লীর দরবারে যাওয়া আসা করছে। সুজাউদ্দিনের জন্যেও সনন্দ আনার জন্যে লোক গেছে বহুবিধ নজরানা সঙ্গে নিয়ে।

সে নজরানার পরিমাণ দেখলে মহম্মদ শাহ যে সনন্দ না দিয়ে পারবেন না এও তিনি জানেন।

মুর্শিদাবাদেও তাঁর লোক মোতায়েন আছে। সরফরাজ খাঁ গদি পাবে কি? তার আগে গুপ্তঘাতকের হাতে মারা যায় কিনা তারও ঠিক নেই।

কিন্তু এসব কোন কথাই হাজী আহম্মদ সুজাউদ্দিনকে বলেননি। শুধু সুজাউদ্দিনকে আরও উন্মাদ হবার সুযোগ দেন।

তারপর এক সময়ে বলেন—কিন্তু এই আসন্ন সময়ে আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

যদি আপনি বাংলার নবাবী পান, যদি পাবার জন্যে আপনাকে আমি কোশিষ করি, আপনি কখনও আমাকে মৃত্যুর আগে আমার স্থান থেকে বহিষ্কৃত করবেন না!

সুজাউদ্দিন কান্নার মতো মুখ করে বলেন—একি কথা বলছেন হাজীসাহেব? আপনি কি ভাবেন সে কাজ কখনও আমি করতে পারি?

হাজী মাথা নেড়ে এক চোখ ছোট করে বলেছিলেন—কবুল করতে হবে। আল্লার নামে শপথ করে বলতে হবে। আজ আপনি বিপদগ্রস্থ। আজ বিপদ উদ্ধারের জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছেন কিন্তু নবাবী পেলে যদি ভুলে যান?

কোরাণ স্পর্শ করে সুজাউদ্দিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—বিপদে যে আমার বন্ধু, সেই আমার চিরকালের বন্ধু। কোরাণ শপথ করে প্রতিজ্ঞা করছি, এ প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ করবো না। যদি ভঙ্গ করি, তাহলে আমার দোজাকেও স্থান

হবে না।

তারপরই দেখা গেল। কাটরার মসজিদের সিঁড়ির নীচে নবাব মুর্শিদকুলীকে গোর দেবার জন্যে শোভাযাত্রার দল এগিয়ে চলেছে।

শূন্য নবাবী দুর্গ। যে দুর্গের প্রাসাদ চল্লিশটি স্তম্ভের ওপর নির্মিত। যার নাম চেহেল সতুন।

সেই দুর্গের মধ্যেও কেমন যেন নিস্প্রাণ সব। দরবার কক্ষ বন্ধ। কক্ষের দরজার এক তোড়া চাবী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সতর্ক প্রহরায় সঙ্গীনধারী রক্ষী। কার হাতে চাবীর তোড়া দেবে বুঝতে পারছে না।

উত্তরাধিকার সরফরাজ খাঁ নবাবের মৃত্যুর সময়ে প্রাসাদেই ছিলেন। তারপর কি ভেবে চলে গেলেন মায়ের কাছে। জিনৎও ছিলেন বাবার কাছে। মরবার পর চোখে ওড়না দিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদে ছিলেন। তারপর তিনিও পাল্কী করে চলে গেছেন নিজের খাস তালুকে। যেখানে তিনি মাঝে মাঝে থাকতেন সেখানেই বরাবরের থাকবার জন্যে চলে যান।

তাই দুর্গের রক্ষীদের অসুবিধে হয় তারা কি করবে?

এদিকে নগরের মধ্যেও দোকান পাট বন্ধ। সবাই পথে পথে ঘুরে আশু একটা ভয়ের মধ্যে দিয়ে ঘুরছে।

এমনিভাবে চলে যায় কদিন।

হঠাৎ একদিন সকালে সকলে শোনে—সরফরাজ খাঁই সিংহাসনে বসছেন। তিনি নেকটাখালি থেকে যাত্রা করেছেন।

প্রাসাদের সামনে নবাবী ফৌজ নতুন নবাবকে স্বাগত জানাবার জন্যে মোতায়েন হয়েছে। মাঝে মাঝে কামান গর্জন করে উঠছে।

সুজাউদ্দিনও আর ছেলের নবাবী পাওয়াতে উড়িষ্যায় বসে থাকেন নি। চলে এসেছেন মুর্শিদাবাদের পথে। কিন্তু নতুন নবাবকে আহ্বান জানানোর জন্যে আসেননি। যুদ্ধসাজে এসেছেন। সঙ্গে সশস্ত্র সেনা। আলিবর্দী সেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করছেন। শুধু হাজী সঙ্গে আসেন নি। হাজীকে সঙ্গে আসতে বলেছিলেন সুজাউদ্দিন। হাজী তার উত্তরে বলেছিলেন—আপনারা যান, আমি পরে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।

কেন পরে আসছি সে কথা সুজাউদ্দিনকে বলেন নি। সুজাউদ্দিন শুধু থমকে দাঁড়িয়ে প্রধান পরামর্শদাতার মুখের রেখা পড়তে চেয়েছিলেন, তারপর কিছু না ভাবতে পেরে ঘোড়ার ওপর উঠে বসেছিলেন।

ছেলে যদি সিংহাসন না ছাড়ে তবে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এই পরিকল্পনা নিয়েই সুজাউদ্দিন মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন।

আর ঠিক সময়ে হাজীর সামনে দ্রুতগামী সংবাদদাতা এসে জানায়—মহম্মদ শাহর সনন্দ নিয়ে লোক আসছে তিনি সুজাউদ্দিনকে বাংলার নবাবী দিয়েছেন।

শুধু এইটুকুর অপেক্ষায় হাজী ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই খবর পেতেই

তিনি ঘোড়ার উপর উঠে বসেন।

যে পথ দিয়ে সুজাউদ্দিন মুর্শিদাবাদ গেছেন সে পথ দিয়ে হাজী আহম্মদ যান না। ঘুর পথে গিয়ে দুজনের সামনে দাঁড়ান।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ একজন।

হাজী বলেন—শেঠজী, বাংলার গদিতে কাকে বসাবেন ঠিক করেছেন?

এই জগৎশেঠ ফতেচাঁদই তখন মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে বড় অর্থশালী।

নবাব মুর্শিদকুলীও একে সমীহ করতেন। টাকার দরকার হলে নিতেন।

হাজী আহম্মদের কথায় শেঠজী শুধু হাসেন। —কেন কি জন্যে এই প্রশ্ন করছেন?

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ তখনও হাজীকে চিনতেন না।

হাজী পরিচয়ও দেন না। শুধু বলেন—আপনার ইচ্ছাটা শোনবার জন্যেই আমি এত পথ এসেছি।

তবে আমার ইচ্ছেটা শুনে যান। সিংহাসনে যেই বসুক আমি তাঁর দোস্ত। তবে? এই বলে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ হাসেন।

হাজীর পরণে সেই কালো আলখাল্লা। চোখ দুটি কিসের আশায় যেন জ্বলছে। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের শেষ কথাটা ধরে নিয়ে আবার বলেন—তবে-টা কি শেঠজী?

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বলেন—লেকিন, বাপ আর বেটার মধ্যে ঝগড়া। তবে বাদশাহী সনন্দ যে পাবে তারই মসনদ। এর মধ্যে আমাদের আর কি করার আছে?

যদি ধরুন দুজনেই বাদশাহ সনন্দ পায়? বাদশাহ মহম্মদ শাহ দুজনের কাছ থেকে নজরানা নিয়ে যদি দুজনকেই সনন্দ দিয়ে দেন, তাহলে কি করবেন?

জগৎশেঠ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—সেটা অবশ্য একটা মুস্কিলের ব্যাপার। হ্যাঁ, সেও হতে পারে।

হঠাৎ হাজী বললেন—সেই মুস্কিলটাই হয়েছে শেঠজী কিন্তু গদিতে দুজন তো বসতে পারে না। একজনকে সরে যেতে হবে। সেই একজন কে সরবে?

জগৎশেঠ বললেন—নবাব মুর্শিদকুলী নাতিকেই নবাবী দিয়ে গেছেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে হাজী বললেন—বাপ বেঁচে থাকতে নিশ্চয় ছেলে সিংহাসনে বসতে পারে না।

হ্যাঁ সেটাও একটা যুক্তির কথা।

তখন হাজী বললেন—আমি এসেছি সেই সুজাউদ্দিনের হয়ে। আপনি যদি তাঁকে সাহায্য করেন, দরবারে আপনার একটা অন্য স্থান হবে।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ হাসলেন, তারপর বললেন—আমি কি সুজাউদ্দিনের প্রধান উপদেষ্টা হাজী আহম্মদের সঙ্গে কথা বলছি?

হাজী আহম্মদ খুশী হলেন, বললেন—আপনার অনুমানের জন্যে ধন্যবাদ।

হ্যাঁ, আমি তাঁরই জন্যে আপনার কাছে এসেছি।

জগৎশেঠ হেসে বললেন—কিন্তু বাপ বেটার যুদ্ধ তো এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। আমার জবাবের আর কি কোন দরকার আছে?

তখন হাজী বললেন—আপনি শুধু সুজাউদ্দিনের হয়ে সমর্থন করুন, তারপর যা করার হয় আমি করব।

হাজী আহম্মদ জগৎশেঠের কাছ থেকে কথা নিয়ে রায় রায়ান আলমচাঁদের কাছে গেলেন। তাঁরও সমর্থন নিয়ে ফিরলেন। তারপর ঠিক হল, সুজা নবাবী পেলে তাঁরা চার জনেই হবেন নবাবের প্রধান। হাজী আহম্মদ, জগৎশেঠ, ফতেচাঁদ ও আলমচাঁদ।

তারপর হাজী চললেন সরফরাজ খাঁর মা জিনৎউন্নিসার কাছে।

জিনৎউন্নিসাও খুব আনন্দে ছিলেন না। একদিকে স্বামী, অন্য দিকে ছেলে। যুদ্ধ যে একটা হবে সে তিনি জানেন। এবং সে যুদ্ধে একজনকে তিনি হারাবেন। স্বামীকে অনেকদিন কাছে পান নি। অনেক অভিমান মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে, তবু সে তো স্বামী!

তাই কি একটা অমঙ্গল শোনার অপেক্ষায় অধীর হয়েছিলেন।

সেই সময়ে হাজী গিয়ে হাজির হলেন।

হাজী কখনও এই নারীকে চাক্ষুস দেখেন নি। পদানশীনা হলেও তো সুজাউদ্দিনের বেগম হিসাবে দেখতে পেতেন কিন্তু জিনৎ কোনদিনও উড়িষ্যায় যান নি। যা গিয়েছিলেন বহু আগে, যখন আলিবর্দী ও হাজী আহম্মদ কেউ উড়িষ্যায় আসেন নি।

হাজী পরিচয় দিয়ে পাঠালেন।

জিনৎ ভেতর থেকে খবর পাঠালেন, দেখা হবে না।

তখন হাজী জানালেন—দেখা করলে তাঁরই ভাল হবে। তাঁর ভালোর জন্যে তিনি এসেছেন।

তখন জিনৎ পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়ালেন।

হাজী বললেন—আপনি কার মৃত্যু চান—স্বামীর না পুত্রের?

যে কথা অহরহ ভাবছেন জিনৎ, অপর একজনের মুখে শুনে থর থর করে কেঁপে উঠলেন।

হাজী বুঝলেন, কাজ হয়েছে।

তখন বললেন—আমি এক প্রস্তাব দিতে পারি তাতে দুজনেই বাঁচবে, আর নবাবীটা শুধু একজনের হবে, আপনি কার ভাগ্যে নবাবী সমর্থন করেন?

প্রশ্নটা তুলে ধরে হাজী চুপ করে থাকলেন কিন্তু অপর পক্ষ থেকে উত্তর না আসতে বললেন—বাপ বেঁচে থাকতে নিশ্চয় ছেলের সিংহাসন পাওয়া উচিত নয়। আপনি ইচ্ছে করলে ছেলেকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

অনেক বাদে পর্দার ওপাশ থেকে জিনৎউন্নিসা মৃদুকণ্ঠে বললেন—কিন্তু বাবা সরফকে নবাবী দিয়ে গেছেন, সে নবাবী থেকে আমি কি করে তাকে বঞ্চিত করি?

বঞ্চিত তো তাকে করতে বলছি না। যে ক'বছর সুজা বেঁচে থাকেন, তিনি নবাবী

করবেন, তারপর তো ছেলে এমনই পাবে।

জিনৎ চুপ করে রইলেন দেখে হাজী বললেন—বেশ, আপনার যখন সমর্থন নেই তখন যুদ্ধই লাগুক, তারপর যার নসীবে যে পায় সিংহাসন জিতে নেবে।

এই কথা বলে হাজী চলে যাবেন ঠিক করলেন।

কিন্তু জিনৎ সেই সময়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—দাঁড়ান! আমি সফরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে, সরফরাজ যেন একদিন নবাবী পায়।

মুর্শিদাবাদের কোন এক প্রান্তরে দুই দল দুই দিক থেকে এসে অপেক্ষায় ছিল। শুধু দামামা বেজে উঠলেই হল।

সরফরাজ ভাবছিলেন পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?

সুজাউদ্দিন পুত্রের জন্যে বুকের মধ্যে কি যেন যন্ত্রণা বোধ করছিলেন।

অথচ নবাবী! বাংলা, উড়িষ্যার শুধু নবাবী নয়, অসংখ্য দৌলত।

সুজাউদ্দিনের উপপত্নীর ছেলে মহম্মদ তকী বাপের পাশে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছিলেন—কেন দাঁড়িয়ে সময় নিচ্ছ আব্বাজান, সৈন্যদের আদেশ দাও।

সুজাউদ্দিন কি জন্যে যেন অপেক্ষা করছিলেন।

আলিবর্দী দুবার এসে বললেন—আমরা যদি আগে আক্রমণ করি, আমাদের জয় সুনিশ্চিত। আপনি আদেশ দিন নবাবসাহেব।

তবু সুজাউদ্দিন আদেশ দিতে পারেন না। দূরে তাকিয়ে থাকেন ছেলের ফৌজের দিকে।

মাথার ওপর সূর্য। সূর্যের আলোতে উন্মুক্ত মাঠের এ পাশ ওপাশ রাঙা। বাতাস থমকে আছে গাছের পাতার ওপর।

হঠাৎ এসময়ে দেখা যায় সরফরাজ খাঁর ফৌজ ফিরে যাচ্ছে। আর তার পরেই আসেন হাজী আহম্মদ।

হাজী আহম্মদ সুজাউদ্দিনকে বাংলার নবাব বলে কুর্নিশ করলে সৈন্যের মধ্যে থেকেও বাংলার নবাব মতিমুল-অল-মুল্ক, সুজাউদ্দৌলা আসনদ জঙ্গ বাহাদুর বলে জয় ঘোষণা হয়।

বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে যে নবাবী পাওয়া হয় তার জন্যে সুজাউদ্দিন হাজী আহম্মদের কাছে চিরঋণী থাকেন।

এমনিভাবেই ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছিলেন হাজী আহম্মদ। তাই পরবর্তী কালে সুজাউদ্দিন যখন বুঝতে পেরেছিলেন, এতটা আস্থা স্থাপন করা উচিত হয়নি তখন অনেক পথ চলে গেছেন।

তবে সে ব্যাপার অনেক পরের।

তারপর বেশ কয়েকদিন চলে গেছে।

মুর্শিদাবাদ মরেছিল মুর্শিদকুলীর রাজত্বে। মরেই গিয়েছিল। কোন খানাপিনা নেই, আমোদ আহ্লাদ নেই। মেয়েছেলের দিকে তাকালেই নবাবী কানুনে শির-চ্ছেদ। তার ওপর যদি কোন বেসামাল অবস্থা করা হয় তো কথাই নেই।

চকবাজারে বেশ্যারা আছে, তাদের বিরুদ্ধেও কেমন যেন কড়া কানুন। ব্যবসা করবে, কিন্তু কোন বেলেল্লাপনা করবে না।

এই নিয়েই মুর্শিদাবাদ ছিল। বহু সাবধানে, বহু সন্তর্পণে লোকেরা জীবন ধারণ করত। আর মনে মনে উপরওয়ালাকে ডাকত, কবে এই নবাবের মৃত্যু হবে।

সেই মৃত্যুই হয়েছে, তবু থমকে ছিল নবাবী নগর।

মদের দোকানে ভীড় ছিল না। বনিতালয়ে লোকে ঢুকত না। ব্যবসার ঠাট্ও খুব একটা কেউ সাজিয়ে বসে নি।

শুধু চাপাস্বরে জল্পনা কল্পনা। কে নবাব হবে?

যদি সরফরাজ হয় তাও ভাল, আর তার বাবা হলে আরও ভাল।

বাপের দিকেই যেন লোকের দৃষ্টিটা বেশী।

সুজাউদ্দিনের খোলামেলা আমোদ আহ্লাদের জীবন সবাই জানত। সুজা হলে আর কড়া কানুনের মাঝে পড়তে হবে না।

অন্য যা অপরাধ, সে অপরাধের শাস্তি হোক। কিন্তু আমোদ আহ্লাদ করলে, মদভাঙ খেলে, মেয়েছেলের দিকে তাকালে কোন অপরাধ হবে না।

এমনি একটা অনুমান করেই নগরের লোকেরা অধীর প্রতীক্ষায় ছিল।

তারপর একদিন সে প্রতীক্ষার শেষ হল।

সুজাই নবাব হলেন বাংলা, উড়িষ্যার।

আরও লোকে শুনল, যে বেগমকে নতুন নবাব এতকাল দূরে দূরে রেখেছিলেন, সেই বেগমই পাইয়ে দিলেন স্বামীকে নবাবী।

তারপর নবাবী প্রাপ্তিতে নগরের মধ্যে সাতদিন ধরে উৎসব রচনা হল।

লোকের কথাই ঠিক।

প্রথম দরবারে বসে নবাব সুজাউদ্দিন আমীর ওমরাহদের সামনে ঘোষণা করলেন আমার রাজ্যে কেউ নিরানন্দ হয়ে থাকবে আমি তাকে বরদাস্ত করব না। কাজ করবে, কাজের মধ্যে আনন্দ করবে। আনন্দকে বাদ দিয়ে শুধু কাজই আমি পছন্দ করি না। যে মানুষ আনন্দ করে না, সে খুন করতে পারে।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চকবাজারে সরাবের দোকান বেড়ে গেল। যারা লুকিয়ে লুকিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করত, তারা প্রকাশ্য স্থানে আসর জাগিয়ে ব্যবসা সুরু করে দিল।

খবর পেয়ে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, রাজস্থান থেকে খানদানী সব বাঈজীর দল আসতে লাগল।

ক'দিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ হয়ে উঠল যৌবনের আগুনে নতুন এক মাশুকের মতো। যে মুর্শিদাবাদ মুর্শিদকুলীর রাজত্বে একেবারে মরে গিয়েছিল। গ্রীষ্মকালের দাবদাহে

পোড়া মাটির মতো শুষ্ক, গাছের পাতায়ও কোন আনন্দ ছিল না, সেই মুর্শিদাবাদ ফাগুনের বসন্ত ঋতুর মতো শুধু কোকিলের সুর স্বর শুনে, মৃদুমন্দ মলয় পবনের ছোঁয়া পেয়ে ভাসতে লাগল।

ঘরে ঘরে একটা ত্রাসের ভাব জেগে উঠল। যাদের ঘরে কুমারী যুবতী মেয়ে ছিল তারা এই নতুন নিয়মকে মেনে নিতে পারল না।

ঘটতে লাগল ঘটনা।

এই সেদিনই এক গ্রামের বুকে কোন এক গৃহস্থের যুবতী মেয়েকে নিয়ে ঘটনাটা ঘটল।

মেয়েটি দেখতে সুন্দরী। তার চলা টলায় একটু ঠমকী ঠমকী ভাব।

গ্রামের এক দোকানী ছেলে। মেয়েটিকে দেখে কিছুতে বুকের ধড়ফড়ানি কমাতে পারে না। যখনই সে মেয়েটিকে দেখতে পায় তার কাজকর্ম কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে থমকে যায়। ভাল লাগে না কিছু। রক্তের মধ্যে কেমন যেন তার বাজনা বাজে। বার বার তার ইচ্ছে হয় মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। একটু গায়ে হাত দিতে। আর যদি আরও একটু সাহস পায় তাহলে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খায়।

এই সব ভাবতে ভাবতেই সেই দোকানী ছেলের দিন যায়।

সে সামান্য দোকানের কর্মচারী। আতর বেচনেওয়ালার দোকানে কাজ করে।

আর মেয়েটি একটি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। তাদের পাতায় ছাওয়া বড় বাড়ী। বাড়ীর মধ্যে ধানের গোলা। সবজী বাগান পুকুর, আরও গরুবাছুর, সে এক এলাহি কাণ্ড। সেই মেয়েকে পেতে গেলে এ জন্মে হবে না।

তবু দোকানী ছেলের মনে কষ্ট।

তার পর সে-ই একদিন আবিষ্কার করল, মেয়েটির সঙ্গে একটা ছেলের ভাব আছে। তবে সেটা খুব গোপন।

ছেলেটি রোজ বিকেল বেলা মেয়েটিদের যে পুকুর আছে সেই পুকুরের ধারে একটা বাবলাগাছের পাশে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে।

মেয়েটি মাঝে মাঝে সেই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। তারপর চলে যেতে যেতে দু' একটা কথাও ছুঁড়ে দেয়।

যেমন, 'অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?' আর কিন্তু এস না। বোকারাম, হ্যাদা-রাম, চোখের দৃষ্টিটা যেন কি?'

তারপর হঠাৎ সেই দোকানী ছেলে দেখল মেয়েটি সেই ছেলেটির সামনে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরেছে। মেয়েটি হাসছে অদ্ভুত এক মুখের ভঙ্গি করে। মুখখানির ওপর কে যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে।

দোকানী ছেলে আর পারে না। তার কেমন যেন মনে হয় সে মরে যাবে। জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

তারপরই ঘটে কাণ্ডটা।

তখন নবাব পালটাপালটি হয়ে গেছে। নতুন নবাব সুজাউদ্দিনের ঘোষণাটা সবাইকে

রাঙিয়েছে। যুব সমাজের মাঝে একটা সমুদ্রের ঢেউ বয়ে গেছে।

হঠাৎ দোকানী ছেলে মনস্থির করে নেয়।

আগে তার ভয় ছিল নবাবের ভয়। মুর্শিদকুলী ভীষণ কড়া। এ সব ঘটনার খোঁজ পেলে তিনি অন্য সব কাজকর্ম ফেলে দিয়ে এই সবের বিচার নিয়েই বসেন। আর বিচার তো কিছুই নয়, একেবারে জহ্লাদের কাছে প্রেরণ।

নবাবটা যেন জীবনে কখনও মেয়েছেলের ধারে কাছে যায় নি।

সেই নবাবের সময়েতেই দোকানী ছেলে ভয়ে ভয়ে ছিল তারপর নবাব পরিবর্তন হতে আর নবাবের ঘোষণা শুনে একদিন দোকানী ছেলে এক শিশি আতর নিয়ে এসে সেই পুকুর পাড়ে দাঁড়াল।

পেয়ারের ছেলেটি এসে সেই বাবলাগাছের ধারে মেয়েটির সঙ্গে অনেক আদর সোহাগের খেলা খেলল।

তারপর একটু অন্ধকার ঘোর ঘোর হতে হাতটা মুচড়ে দিয়ে চলে গেল। এই সময়ে দোকানী ছেলে অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটির সামনে দাঁড়ায়।

মেয়েটি ভুত দেখার মতো মুখ করে চমকে ওঠে।

দোকানী ছেলেটি সামনে দাঁড়িয়ে সাহস দিল—ভয় নেই, আমি ভুত নয়, তোমাকে একশিশি আতর দেবার জন্যে এসেছি।

মেয়েটি আতর তো নিলই না, উলটে এমন রাগ রাগ মুখের ভাব করল যে দোকানী ছেলের মুখে কথা সরে না।

তারপরেই ঘটল কাণ্ডটা।

একদিন এই সন্ধ্যের সময় আকাশে তখন ঘন চাপ চাপ ভুসো অন্ধকার ছেয়ে গেছে।

মেয়েটি ফিরছিল যেন কোথা থেকে।

দোকানী ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল একটা মাঠের মধ্যে কতকগুলি ধান গোলার আড়ালে। হঠাৎ মেয়েটিকে পিছন থেকে জাপটে ধরে সেই ধান গোলার আড়ালে নিয়ে গেল। তারপর শক্ত করে বেঁধে ফেলল হাত পা। মুখের মধ্যে গুঁজে দিল একদলা কাপড়।

মেয়েটি কোন চিৎকারও করতে পারল না, হাত পা ছুঁড়তে পারল না। বড় বড় চোখ করে শুধু তাকিয়ে রইল দোকানী ছেলের দিকে।

আর দোকানী ছেলে, যে আদিম পিপাসা নিয়ে দিনের পর দিন বুকের মধ্যে পোকার কামড় সহ্য করছিল, সেই আদিম পিপাসাই সে মিটিয়ে নিল। আগে মনের মধ্যে প্রেমের একটা ছোঁয়াচ ছিল, পরে সেই প্রেম আর প্রেম ছিল না। প্রেমের পরবর্তী পরিণতি লালসাতেই পরিণত হয়েছিল।

তারপর খবর গেল নবাবের কাছে। নবাব সুজাউদ্দিন তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন—ভোগ করার জিনিস ভোগ করেছে তো কি হয়েছে?

হুজুর, জোর করে ইজ্জত নেওয়া।

কেন মেয়েটি স্বীকার ছিল না?

হুজুর, মেয়েটি কুমারী।

নবাব বললেন—কুমারী তো কি হয়েছে ? কুমারী বলেই কোন ইচ্ছা থাকে না !

কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই মিটিয়ে দেওয়া যায় না।

মেয়েটির বাবা এসে দরবারে বললেন।

হুজুর, আমরা কি বউ ছেলে নিয়ে নিরাপদে বাস করব না ? আপনার কি কোন নিয়ম কানুন নেই ?

তখন সেই দোকানী ছেলেকে খুঁজে আনার ব্যবস্থা হল।

দোকানী ছেলে এমনিই ভয় পেয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ফৌজ খুঁজে খুঁজে তাকে ধরে নিয়ে এল। দোকানী ছেলে ভয়ে কাঠ। তবে তার সাহসও আছে, নবাবের ঘোষণাটা তার মনে আছে।

নবাব আনন্দ করতে বলেছেন, সে কাজ কর্ম ফেলে রেখে তো আনন্দ করে নি। মেয়েটাকে ভাল লেগেছিল কিন্তু মেয়েটা কিছুতে তাকে ভাল বাসবে না। তাই মনের সাধ মিটিয়ে মেয়েটাকে ভোগ করে নিয়েছে।

তবু দোকানী ছেলের বুকের মধ্যেটা কেমন ভয়ে দুরু দুরু করতে লাগল।

বিচার শুরু হল।

নবাব জিজ্ঞেস করলেন দোকানী ছেলেকে—তুমি মেয়েটিকে বেইজ্জত করেছ কেন ?

দোকানী ছেলে প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। হঠাৎ সে সাহস পেয়ে বলল—হুজুর আপনার ঘোষণাই ছিল, যে যে রকম আনন্দ করতে পারবে সেই আনন্দই করবে। তাই মেয়েটিকে জোর করে আমি আনন্দ করেছি।

কেন মেয়েটির ইচ্ছা ছিল না ?

হুজুর মেয়েটি অন্য একজনকে আনন্দ দিত।

স্পষ্ট উক্তি। নবাব মেয়েটির বাপের দিকে চাইলেন। মেয়েটিও বিচার সভায় দাড়িয়েছিল। তার একমাথা চুল সামনের দিকে ঝুলেছিল।

নবাব বললেন—তুমি কি বিচার চাও বলো ? অপরাধী তার অপরাধ কবুল করেছে।

হুজুর, আমি অপরাধীর শাস্তি চাই। মেয়েটির বাবা সরোষে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে নবাব বললেন—বেশ, ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দাও।

হুজুর, আমি একজন সমাজের প্রতিষ্ঠিত লোক। ঐ ছেলেটি সামান্য এক দোকানে কাজ করে।

নবাব তখন রেগে বললেন—তুমি তোমার মেয়ে নিয়ে চলে যাও। অপরাধীর শাস্তি যা দেবার আমি দিয়েছি।

তখন মেয়েটির বাবা হাউমাউ করে কেঁদে বললেন—হুজুর একটা কোন ব্যবস্থা করুন। আমি এখন এই নষ্ট মেয়েকে নিয়ে কি করব ?

নবাব আর তার কোন জবাব দিতে পারেন না।

এমনি ঘটনাই চতুর্দিকে ঘটতে লাগল।

যারা বিপদে পড়ল, তারা আড়ালে গাল পাড়ল। যারা আনন্দই চায়, স্ফূর্তি চায়, তারা নবাবের দীর্ঘজীবন কামনা করল।



চকবাজারের রাতগুলো যেন নবাবের রঙমহলের মতো।

নিত্য নতুন লোকের আনাগোনা লেগেই চলেছে। এমনটা মুর্শিদকুলীর আমলে ছিল না।

দিল্লী আজ অস্তমিত। দিল্লীর প্রাসাদে আছেন বাদশাহ কিন্তু বাদশাহের আর সে মেজাজ নেই। মেজাজ দেখাতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার। সব অর্থ তো আওরঙ্গজেবের কাল শেষ হতে হতেই ফুরিয়ে গেছে।

যেখানে অর্থ, সেখানেই লোকের সমাগম বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলাদেশই যেন দিল্লীর সেই মেজাজ পেয়েছে। সেই বাদশাহী মেজাজ।

আর সুজাউদ্দিন সেই মেজাজে অভ্যস্ত।

তারও রাজকার্য খুব বেশীক্ষণ চলে না। তাড়াতাড়ি দরবার শেষ করে তিনি আরাম কক্ষে যান।

সেখানে খসবু সরাব ও খুবসুরত আওরত মোতায়েন।

রাজকার্যের যা ঝামেলা সে সব উজীরসাহেব হাতে নিয়েছেন। উজীরসাহেব শুধু নয়, সৈন্য বিভাগে আলিবর্দী, রাজস্ব বিভাগে হাজী সাহেবের বড় ছেলে নওয়াজেস, হাজী সাহেবের আর দুই ছেলেকে পাঠানো হয়েছে রংপুর ও রাজমহলের সুবাদার করে।

তারপর আছেন জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও রায় রায়ান আলমচাঁদ। তাঁরা দিনরাত বলে চলেছেন নবাবসাহেব, কোন চিন্তা করবেন না, আপনি সর্বদা আমোদ আহ্লাদ নিয়ে থাকুন, আমরা যখন রাজ্যের সমস্যা নিয়ে আছি, তখন ভাবনার কি আছে?

তাই নবাব কিছুই ভাবেন না। শুধু সুরা আর নারী।

নবাবের সুরা, নারীর প্রতি আসক্তি দেখে নগরের লোকেদেরও আসক্তি বেড়ে চলল।

তাই চক বাজারে এত ভীড়।

সন্ধ্যে হলেই নতুন নতুন বাড়ীর দোতালায় চিকের আড়াল পড়ে যায়। আর খানদানীর বাঈজী ঠমকী তালে তান ধরে গজল ঠুংরীর।

ঘোড়ার ওপর চড়ে পরদেশী ঘুরে বেড়ায়।

আতরওয়ালা কালুমিঞা পরদেশীর দিকে তাকিয়ে কাকে যেন ইসারা করে।

সাঁ করে বেরিয়ে যায় পায়জামা পরা একটা লোক। পরদেশীর ঘোড়ার পিছু পিছু চলতে চলতে হঠাৎ মুখের একরকম শব্দ করে পরদেশীর দিকে তাকায়। পরদেশীর দৃষ্টি

পড়লে মুখস্থ বুলি আউড়িয়ে যায়। ভাল মাল, খাসা মাল, একেবারে আনকোরা দেখতে বহুত খুবসুরত। সবে জোয়ানী হয়েছে।

পরদেশী যদি অন্য খোঁজে এসে থাকে তাহলে এ কথায় কান দেয় না। আর যদি ছোঁক ছোঁক করে তবে পায়জামা পরা লোকের পিছু পিছু সুড সুড করে চলতে থাকে।

সুজাউদ্দিনের আমলে মুর্শিদাবাদের এই চকবাজারই দিল্লীর মেজাজ পেয়েছিল।

একদিন ভোরের কাহিনী বললেই এ দিনের মুর্শিদাবাদকে বোঝা যাবে।

ভোরের আলো আম্রকুঞ্জের ভেতর দিয়ে অনেকক্ষণ আকাশ রাঙা করেছিল। সূর্যের আলো ধীরে ধীরে জাগছে। তার অঙ্গাবরণে ভাগীরথীর জল কিশোরী মেয়ের মতো চঞ্চল।

মসজিদে মসজিদে মোল্লারা দিনের আগমনকে শুভকামনা জানিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জাগছে গত রাতের নেশার আমেজকে ভুলতে ভুলতে।

নেশাই করে রাত্রিবেলা মুর্শিদাবাদ। যারা নেশা টেশা পছন্দ করে না, তারা ভাগীরথীর ধারে গিয়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে। তবে সে সংখ্যাও খুব কম।

যাই হোক্ মুর্শিদাবাদ জেগেছে, তখনও চোখে নেশার আমেজ। আমেজ ভুলে এখনও সে ভাল করে তাকাতে পারছেনা। এখনও যেন তার মনে গতরাত্রের স্মৃতি। সে স্মৃতিতে কার যেন মিঠেল পায়ের শুধু ঘুঙুর নিক্কণ। সারেঙ্গীতে তান তুলে কে যেন ভরাট বুকের ঝলক দিয়ে জলদতানে গজল ধরে দিয়েছে।

নবাব প্যালেস থেকে ভোরের সানাই বেজে গেছে। সেনাবাড়ী থেকে রাতে ঘুম না হওয়া বৃদ্ধ, তরল রক্তের অক্ষম সেনা বেরিয়ে পড়েছে ভোরের শীতল বায়ু সেবন করতে।

নবাব প্যালেসের সবচেয়ে উঁচু গম্বুজটা ধীরে ধীরে সূর্যের আলোয় রাঙা হচ্ছে। তোরণদ্বারের ডিউটি বদল হয়েছে। কামানের গাড়ীগুলি রাতে এলো মেলো হয়ে গিয়েছিল সেগুলি ঠিক করেছে বেতনভুক কর্মচারীর দল।

নবাব সুজাউদ্দিন এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। দরবারের তাড়া থাকলেও তাকে কেউ ঘুম ভাঙায় না। অনেকদিন দরবার নবাব ছাড়াই হয়ে যায়।

তাঁকে ঘুম ভাঙাতে নিষেধ করেন প্রধান উজীর দেওয়ান হাজী সাহেব। কড়া হুকুম। কেউ এই নিয়ম ভঙ্গ করলে তার চরম শাস্তি মিলবে। বরং নবাবের ঘুম যাতে আরও গাঢ় হয় তার জন্যেই জেনানা মহলের কাছে কড়া নির্দেশ আছে।

বালিশ মাথায় দিয়ে শোন্ না সুজাউদ্দিন। যুবতী মেয়ের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমোন। সেই যুবতী মেয়ের কোল যেন ভারী ও পুষ্ট হয় সেই দিকে লক্ষ্য থাকে সমস্ত জেনানামহলের।

সেই নরম কোমল কোলে শুয়েই নিদ্রা যান বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন।

ভোরের স্নিগ্ধ আলো মুখের ওপর পড়লেও ঘুম ভাঙে না। হয়ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি সারারাত যে মেয়েদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলেছেন, সেই খেলাই খেলেন।

কিম্বা যে মেয়েটি দারুণ শরীরটা দুলিয়ে অসম্ভব ভরাট দেহটা থেকে একটি একটি

করে বসন খুলে ফেলেছিল, তার কথাই ভাবেন।

এই সময়ে চকবাজারে জর্দার দোকান খুলতে খুলতে আলীসাহেব এগিয়ে আসে সরাইখানার মালিকের কাছে।

আলীহোসেনের বয়স অল্প। এখন জোয়ান শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। আলী হোসেন রোজ গল্প বলে সরাইখানার মালিককে।

সরাইখানার মালিক বৃদ্ধ। তবু শুনতে তার ভাল লাগে।

আলীসাহেব তার অভিজ্ঞতালব্ধ গল্পই শোনায়।

প্রত্যহ এক একটি ঘটনা আলীসাহেবের জীবনে ঘটে। আর বৃদ্ধ সরাইখানার মালিক যেন কোন উপাদেয় জিনিষ খাচ্ছে এমনি ভাবে ঢোক গিলে বলে—তারপর আলী ভাই?

প্রত্যহ ভোর বেলা দোকান খুলতে খুলতেই এসব গল্প হয়। সারাদিন অনেক ঝামেলা থাকে। সরাইখানার লোক? জর্দ্দার দোকানে ভীড। তাছাড়া সারাদিন তো গল্প ঘটে। সে গল্প বলবার ফুরসৎ কই? তাই সারাদিন গল্প ঘটলে আলীসাহেব পরদিন সরাইখানার মালিককে বলে।

আর মালিক ভাবে—কেন আমি এত তাডাতাডি বৃদ্ধ হতে গেলাম? আর আজকের নবাবীটা তার জোয়ান কালে এল না কেন?

আলীহোসেন সেদিন বলছিল, আগের দিন ঘটে যাওয়া একটা উত্তেজক গল্প। একেবারে সত্যি কাহিনী।

বুঝলে না সরাইচাচা, কাল যে দোকানটা একটু তাডাতাডি বন্ধ করেছিলাম সে কি লক্ষ্য করেছিলে?

সরাইখানার মালিক মাথা নেড়ে বলে—কই লক্ষ্য করিনি তো? তা কাল কি হল?

হল আর কি? এক বিপন্না নারী, সে কি বলব সরাইচাচা, রূপ যে এত হয় তা আগে জানতুম না। শুধু রূপ নয়, রূপের সঙ্গে স্বাস্থ্য। নবাবের হারেমের মেয়েদের দেখিনি, শুনেছি নবাবের হারেমে এমনটি অনেক আছে।

সরাইখানার মালিকের তখন চোখ গোল গোল হয়ে গেছে। সকালের মিঠেল রোদেও যেন প্রখর তাপ।

সরাইখানার মালিক বলে—তাহলে সেই মেয়েটাকে নিয়ে কি করলে?

নিয়ে গেলাম বিবির কাছে। কিন্তু বিবি তো দেখে খাপ্পা!

তখন তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলি—মেয়েটাকে ভাল খানাপিনা দিয়ে আয়াসে রাখো। এ চিজ আমার সুখের জন্য আনিনি। খোদা আমাদের কিছু মোহর পাইয়ে দেবার জন্যে মেহেরবান হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তখন বাকী কথাটা শুনে বিবির কি আনন্দ। বিবি তার আয়াসের জন্যে এতে করছে যে কি বলব!

আর সরাইখানার মালিক তেতো খাওয়ার মতো মুখের অবস্থা করে আলী হোসে-

নের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—তা তুমি কি তাকে সত্যিই নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেবে? একবার নিয়ে শোবে না?

আলী হোসেন সে কথার কোন জবাব দেয় না। অন্যপাশে ঘুরে দোকানের বাকী ঝাঁপগুলি খুলতে থাকে। এক একবার সরাইখানার মালিকের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে হাসে।

সরাইখানার মালিক কেমন যেন সেই গল্পে বধ হয়ে যায়। শেষে এক সময়ে মিন মিন গলায় বলে—আলীভাই, একবার দেখাও না সেই খুবসুরতকে। অন্তত দেখেও প্রাণটা শান্ত করি।

আলী হোসেন তখন গল্প শেষ করে দোকানের পাট খুলে ফেলেছে।

এমনি গল্পই সে বলে। আর সরাইখানার মালিক এক একদিন কেমন যেন গল্পের আবর্তে পড়ে হিম হয়ে যায়।

কিন্তু এ শুধু গল্পই নয়। আলী হোসেন হয়ত কল্পিত কোন গল্প বলে আনন্দ পায়। তবে এমন ঘটনাই ঘটে।

ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চকবাজারের যেন গোটা যুগের একটা ছবি ফুটে ওঠে।

আর ব্যবসা।

এই সেদিন মুর্শিদাবাদে হাজার হাজার ঝাড়বাতির দরকার হল। সেই ঝাড়বাতির ব্যাপারীরা এল পারস্য থেকে। শুধু ঝাড়বাতি নয়, চিকের জন্যে একধরনের জালি কাপড়।

নিত্য নতুন যত বিলাস বাড়ছে। ততই অভাবটা যেন নতুন করে জেগে উঠছে। সেই অভাব মেটানোর জন্যে ব্যাপারীরা আসছে।

সেই ব্যবসার জন্যেই একজন লোককে দেখা গেল। সে হল চরমারির রাঘব চৌধুরী।

রাঘব চৌধুরী অনেকদিন ধরেই চকবাজারে ঘুরছিলেন। সেই যেদিন থেকে সুজা-উদ্দিন নবাবী গদিতে বসেছেন।

তিনি প্রাসাদের দিকে যান নি, চলে এসেছেন বরাবর এই চকবাজারে। কিন্তু চকবাজারে এসেও খুব সুবিধে করতে পারেন নি।

অথচ মনের মধ্যে একটা নতুন ব্যবসার পত্তন করবার বড় ইচ্ছে। নতুন একটা ব্যবসা ফাঁদতে পারলেই বংশের হৃত সৌভাগ্যটা আবার ফিরে পাবেন।

সেই ইচ্ছেতেই প্রত্যহ ভোর থাকতে চরমারি ছাড়েন। দুপুরে একটা সরাইখানায় খেয়ে নেন, অনেক রাত্রে বাড়ীর পথে রওনা হন।

মাঝে একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলেন। লোকটা আসলে যে এক মেয়ে ছেলের দালাল বুঝতে পারেন নি।

শুধু দালাল নয়, লোকটা অপরিচিত লোককে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাজারের পিছন দিকে এক বাড়ীতে নিয়ে যায়। তারপর একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়ে চোখে ধাঁধা

লাগিয়ে সব কেড়ে নেয়। তারপর একরকম ন্যাংটো করে ছেড়ে দেয়।

সেই লোকটির পাল্লায় রাঘববাবু পড়ে যান।

লোকটি বলে—আপনাকে রোজই দেখছি চকবাজারে ঘুর ঘুব করেন? তা আপনার দরকারটা কি? আমাকে বলতে পারেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

লম্ব চওড়া দশাসই মানুষ রাঘববাবু। ঠিক আন্দাজ করতে পারেন না লোকটার ফন্দি। তাছাড়া কদিন ধরে ঘুরে ঘুরে মেজাজটা কেমন খিঁচড়ে যাচ্ছে। তাই বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

লোকটিকে বলে ফেলেন—তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য।

সঙ্গে টাকা পয়সা তাহলে কিছু আছে?

ত কিছু তো রয়েছেই।

লোকটির চোখ মুখে কেমন যেন জেল্লা খেলে যায়। আর লোকটি রাঘববাবুকে নিয়ে সেই বাজারের পিছনে গলিপথে চলে যায়।

অনেকগুলি গলিপথ ঘুরে ঘুরে এক চিক দেওয়া বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তোলে রাঘব-চৌধুরীকে। তারপর সিড়ি টপ্‌কে টপ্‌কে এক ঘরে।

সেই লম্বা ধরনের আসরের মতো সাজানো ঘর দেখেই রাঘববাবু সব বুঝতে পারেন।

তিনি ফেরার জন্যে পিছন দিকে পা বাড়ান।

লোকটি পথ আটকে দাঁড়ায়। কোথায় যাচ্ছেন মহাশয়?

এ সব কোথায় তুমি নিয়ে এসেছ আমাকে?

লোকটি ঠোটের কোণে হাসি ঝোলায় কিন্তু হাসিটি বেরুতে দেয় না। বলে—কেন ব্যবসা করবেন তো? ব্যবসার জন্যেই আপনাকে নিয়ে এসেছি। খুব ভাল ব্যবসা।

রাঘববাবু আর কথা বলতে পারেন না।

সামনে তখন এসে দাড়িয়েছে সুবেশা এক তরুণী। মেয়েটির শরীর ঘিরে দামী অলঙ্কারের জৌলুস। তাছাড়া পোষাকও বেশ জমকালো।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে বলে—হ্যা আমরা খুব ভাল ব্যবসা করি। দিন নেই, রাত নেই, এই নিয়েই আছি। কই দাড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন!

লোকটি চলে গেল হঠাৎ। যাবার সময়ে বলে গেল ভাল করে মেহমানকে মদত কর। আমি আসছি।

রাঘববাবু তবু বসলেন না। দাড়িয়ে দাড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। ভাবলেন—এবার থেকে একখানা ছোরা জামার মধ্যে লুকিয়ে আনবেন। কিন্তু এখন তিনি উদ্ধার পাবেন কেমন করে?

সেই যুবতী রমণী বোধ হয় রাঘববাবুর মনের কথা বুঝল। বলল—আপনি বসুন, আপনাকে ডর করতে হবে না। রঙ্গন নিশ্চয় আপনাকে ভুলিয়ে এনেছে।

মেয়েটির গলায় কি যেন ছিল. রাঘববাবু দুধ সাদা চাদরের এক কোণে থেবড়ে বসে পড়লেন।

'তখন মেয়েটি সুর্মা আঁকা প্রসাধন চর্চিত ঢলঢলে মুখে জেনে নিল সমস্ত ব্যাপারটা। তারপর বলল— আপনি মুস্কিলে পড়েছেন। যে আমাকে এনে দিয়েছে, আপনাকে যদি আমি ছেড়ে দিই, তাহলে সে আমার মাথা রাখবে না। তারপর বলল—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব সজ্জন ব্যক্তি। আপনি বসুন, আমি কি করতে পারি দেখি।

মেয়েটি একসময়ে এক গেলাস সরবৎও খাওয়াল রাঘববাবুকে।

তারপর বলল—আপনি যান। হঠাৎ একটু মাথাটা নত করে সলজ্জ হেসে বলল—জামাকাপড়, চুল একটু এলোমেলো করে নিন।

রাঘববাবু কিছু না বুঝে মেয়েটির নির্দেশই পালন করলেন।

মেয়েটি বলল—যান, আমি রঙ্গনকে উলটো চাপ দেব, বলবো কি তুই সব খদ্দের ধরে আনিস্? আমারই লোকসান হয়ে গেল।

রাঘববাবু সবই বুঝলেন, তবু আর দাঁড়ালেন না। একবার তার দাঁড়িয়ে দেহপসারিণী মেয়েটির হাতে কটা টাকা দিতে ইচ্ছে করল। সত্যি তো তারই লোকসান হয়ে গেল।

তবু তিনি সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না।

খুব জোর মেয়েটির কৃপাদৃষ্টিতে পড়ে পালিয়ে এসেছেন। টাকা তাঁর কাছে কিছু আছে। কাপড়ের দড়ির বাণ্ডিলে কোমরে গোঁজা।

কোন এক সুবিধে দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বলে সঙ্গে আনেন।

তারপর থেকে আর এমনি বিপদে পড়েন নি। সতর্ক হয়েছেন।

সঙ্গে একটা ছোরাও কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন।

তবু কোন সুবিধে সুযোগ দেখতে পান নি। একবার ইচ্ছে হয়েছিল চকবাজারে একটা দোকান দিয়ে বসবেন। তামাক, মশলা তো তাঁর ব্যবসার ঠাটে আছেই। তার সঙ্গে এখান থেকে কিছু জিনিস কিনে নেবেন।

কিন্তু এসব ছোটখাট ব্যবসার দিকে তাঁর মন নেই। ব্যবসা তো তাঁর একটা আছেই। তার আয়ে তিন মহল্লা বাড়ীর সবগুলি ঘর খুলে রাখা যায় না।

সেইজন্যে বড় কোন ব্যবসা। বড় কোন ব্যবসার জন্যেই তিনি নবাবী নগরে এসেছেন।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে সেই সন্ধানটা পেয়ে গেলেন রাঘব চৌধুরী। তবে অনেক পরে।

হাজী আহম্মদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে।

নবাবী পাইয়ে দিয়েছেন সুজাউদ্দিনকে।

সুজাউদ্দিন নবাব হয়েছেন। প্রত্যহ লাল ভেলভেট মোড়া হীরা মুক্তা পান্না চুনির কাজ করা সিংহাসনটায় বসেন। বেশ আরামে বসেন। বসে বসে দারুন খুশি খুশি চোখে আমীর ওমরাহদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

হাজী বসে থাকেন সামান্য দীনের মত। তাঁর আসনটা ছিল মূল্যবান, সেটা বদলে তিনি সামান্য এক কমদামী আসন নিয়েছেন। আগেও কোন ভাল পোষাক

পরেন নি, মুক্তার মালা গলায় দেন নি, পরেও পরেন না। সেই তাঁর চিরাচরিত পোষাক। কাল আলখাল্লায় সারা শরীর মোড়া। এক মুখ দাড়ি, দাড়িতে চিকচিকে মেহেদি রঙ। মুখে সর্বদা বিচিত্র হাসিটি ঝুলে থাকে। দাড়ির ভেতর থেকে তাঁর হাসির রেখা দেখায় যেন বিদ্রূপের মতো। হাজী আহম্মদ বিদ্রূপই করেন তুনিয়াকে।

তুনিয়া যতই তাঁর পেছনে চক্রান্ত করুক। তিনি তুনিয়াকে একদিন কলা দেখাবেন, এমনি একটা সঙ্কল্প থাকে তাঁর হাসির মধ্যে।

মনে পড়ে, সেই জহরৎ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। আজ ভাবেন, ধরা পড়ে মঙ্গলই হয়েছে, না'হলে আরবের কোথায় দোকান ফেঁদে বসতেন, তারপর হিন্দুস্থানে আসা আর হয়ে উঠত না।

এই সব কথাই ভাবেন দরবারের সেই বিশেষ আসনটিতে বসে।

বসে বসে যেন অনেক সঙ্কল্প মাথায় মধ্যে আবার ভীড় করে আসে।

সেদিন আলিবর্দী চুপি চুপি বলতে এসেছিলেন—দাদা নবাবী তো পেল সুজাউদ্দিন, তারপর পাবে তার ছেলে সরফরাজ। সুজাউদ্দিনের উপপত্নীর ছেলে মহম্মদ তকীও বাবার পর সিংহাসন পাবার জন্যে উঁচিয়ে আছে। সে বলে—বাবা আমাকে না দিলে আমিও যুদ্ধ ঘোষণা করব।

জিনৎ-উন্নিসা অনেকদির পর আবার স্বামীর কাছে এসেছেন।

হাজীর তুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে দিয়ে মিলিয়ে দিয়েছেন।

জিনতের রাগ।

স্বামী কেন এ জীবন যাপন করবে? কেন আমার বাবা নবাবী করেন নি? নাচ, গান, একটু আধটু উপভোগ করা, তু এক পাত্র সরাব খাওয়া এতো খারাপ নয় কিন্তু গাদা গাদা মেয়েছেলে নিয়ে স্বামী তাঁর আর এক জীবন যাপন করছেন!

হাজী তার উত্তরে বুঝিয়েছেন—সবাই তো আর সমান নয় বেগমসাহেবা। বেগম-সাহেবাই বলেছেন হাজী জিনৎকে। একটু শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়ে মনের সেই আগের ধোঁয়াটে ভাবটাকে সরিয়ে দিয়েছেন।

আর কি আশ্চর্য, জিনৎ বেগম সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে গেছেন।

পর্দার আড়ালে আর থাকেন নি। সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাজী মুর্শিদকুলীর মেয়েকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বয়েস হয়েছে জিনতের। তবু যেন বয়েসটা বোঝা যায় না। মেয়েদের আবার বয়েস!

তুধে আলতা গায়ের রঙ। মুখের আদলটাই যেন সবচেয়ে সুন্দর। পরণে দামী পোষাক। জরি দিয়ে বেণী বাঁধা। ঠোঁটে তাম্বুল রঙ। তবে মুর্শিদকুলীর মেয়ে বলে মনে হয় চিবুকের দৃঢ়তা দেখে।

মনে মনে হাজী আহম্মদ এই মেয়ের দৃঢ়তা ভাঙাবারই চেষ্টা করেন! বলেন—এখন আর অভিমান নিয়ে থাকা উচিত নয় বেগমসাহেবা। আপনার অভিযোগ যেটা সেটা বুঝি, কিন্তু নবাবের মন তো খারাপ নয়? আপনার জন্যে তিনি কত তুঃখ করেন।

আবার বিগলিত হয়েছেন জিনৎউন্নিসা। তাম্বুল অধর মেলে তিনি সলজ্জ হয়ে

হেসেছেন।

হাজী আহম্মদ আবার বলে যান।

আমরা যখন রয়েছি, আর আপনার মহামান্য বাবা যখন জীবিত নেই, তখন আপনার আর নবাবকে এমন দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। তিনি অনুতপ্ত, তিনি চান আপনার সঙ্গ।

জিনৎকে আর বলতে হয়নি। হয়তো তাঁর মনও চাইছিল স্বামীর সঙ্গ।

তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে চলে এসেছেন নবাব প্রাসাদে।

সুজাউদ্দিন জিনৎকে দেখে দারুণ খুশি। বহুকাল পরে বেগমকে পেয়ে যেন তিনি শিশুর মত আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান।

হাজী আহম্মদের দিকে তাকিয়ে আনন্দাশ্রু ফেলে বলেন– উজীরসাহেব, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব ভাষায় খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি আমায় নবাব করে দিয়েছেন। বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে শুধু আপনার বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আজ পেলাম আমার একমাত্র প্রিয় বেগমকে, যার জন্যে মনে বেদনা নিয়ে অহরহ দিনপাত করেছি।

শুধু বেগমকেই ফিরিয়ে নিয়ে এলেন না উজীর সাহেব। একদিন অভিমানী সরফরাজ খাঁকেও ফিরিয়ে আনলেন।

তবে সরফরাজ খাঁ ভীষণ এক বোখা। উজীরসাহেবের পীড়াপীড়িতে বাপের সঙ্গে এসে দেখা করল।

সুজাউদ্দিন ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গায়ে হাত বুলোলেন। কুশল প্রশ্ন করলেন।

জিনৎও এসে বললেন—বেটা, তুই এখানেই থেকে যা।

সরফরাজ একবার মার দিকে অগ্নিকটাক্ষে তাকাল কিন্তু থাকল না। ঘোড়া ছুটিয়ে আবার চলে গেল নিজের আবাসে।

সুজাউদ্দিন হাজীর দিকে তাকিয়ে বেদনায় মুখ নীল করে জানতে চাইলেন—বেটা কি কখনও আমাকে ক্ষমা করবে না?

হাজী আশ্বাস দিলেন।

তারপর কি যে করলেন তিনিই জানেন। সরফরাজ নবাব প্রাসাদে থাকে না, তবে প্রায়ই আসে বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

এইসব দেখেই আলিবর্দী দাদাকে বললেন—সবই তো দেখছি মিলমিশ হয়ে গেল। আর সে মিল করালে তুমি। তবে আমার ভাগ্যে আর সিংহাসন আসবে কবে? শুধু শুধু কেন যে লোভটা বাড়িয়ে দিলে?

হাজী আহম্মদের ভাইকে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—কেন তুমিই তো বলেছিলে এ আশ্রয়টা হারিয়ে যাক্ তা আমি চাই না দাদা। কিন্তু সে কথা বলেন না। শুধু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ওপরে হাত তুলে বলেন—খোদাকে ডাকো আলিবর্দী।

আজকাল হাজীসাহেব শুধু ঈশ্বরকেই ডাকেন। দরবারে বসেও আমীর ওমরাহদের

সামনে ঈশ্বরের দোহাই দেন।

ঈশ্বরের দোহাই দিলে একটা সুবিধে হয় হঠাৎ তর্ক থেমে যায়। বিরোধী পক্ষও ভয় পায় কি ভেবে যেন।

এই ঈশ্বরের দোহাইটা শিখেছেন হাজী বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে। বাদশাহ ঔরঙ্গজেবও মোল্লার পোষাক পরতেন। খানাপিনার ব্যাপারে নিতান্তই গরীবি খানা। পোষাকও সাধারণ দীনের মতো। এসব দেখে সাধারণত লোকের ধারণা হয়, এ লোকটি নিতান্তই সাধাসিধে।

এই ভাবেই চলেন হাজী সাহেব।

দরবারে তাঁর কথার বিরুদ্ধচারণ করতে কেউ সাহস করে না। কেউ বিরোধ উপস্থিত করলেও নবাব হাত তুলে তা নাকচ করে দেন।

নবাব বলেন—উজীরসাহেব যা বলেন তা ভেবেই বলেন। আপনারা শুধু শুধু মহামান্য উপদেষ্টার অসম্মান করছেন।

তাই হাজী জানেন – তিনি যা কিছুই করুন, তা যত অন্যায়ই হোক নবাবের মনে সন্দেহ উপস্থিত হবে না।

নবাব হাতে থাকলে আর কার সাধ্য কিছু বলে। তাই নবাবকেই তিনি নানা-রকম মদত দিয়ে বশীভূত করে চলেন।

সেদিন ব্যবসাদারদের নিয়ে দরবারে এমনি একটা তর্ক হচ্ছিল।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও রায় রায়ান আলমচাঁদ যেন বুঝতে পেরেছিলেন এই মানুষ-টিকে হাতে রাখাই দরকার। তাই দরবারে বসে কোন প্রতিবাদ করেন না। দরকার হলে সমর্থনই করে যান হাজী সাহেবকে।

তর্ক করেন অন্যেরা।

সেই তর্কই হচ্ছিল সেদিন।

হাজী সাহেব বলছিলেন—সরকার থেকে ব্যবসাদারদের কোন সাহায্য দেওয়া হবে না। দরকার হলে সরকারই সেই ব্যবসা করবে।

তার উত্তরে আমীর ওমরাহরা বলেন—তাহলে দেশে ব্যবসার উন্নতি কি করে হবে? দেশে পণ্য উৎপাদন কি করে হবে? সব কি অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে নিজেদের অভাব মেটাতে হবে? সেরকম করলে কোন দেশই উন্নত হতে পারে না। তাই ব্যবসার দিকে সরকারের চোখ দিতে হবে। ব্যবসাদারদের সাহায্য দিতে হবে। প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে ব্যবসাদারদেরই হাতে আনতে হবে।

নবাব একবার উজীরের দিকে চান, আবার স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট আমীর ওমরাহদের দিকে চান।

হঠাৎ একজন ওমরাহ জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে দেখিয়ে বলেন—উনিও তো বড় ব্যবসাদার। উনিই বলুন না সরকারের কর্তব্য কি?

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ভীষণ পান খান। শুধু পান খান না, পানের সঙ্গে এমনি অম্বুরী জাতীয় মশলা খান যে ভুর ভুর করে মুখ থেকে সুগন্ধ ছড়ায়। এই মশলা

নাকি আসে ফরক্কাবাদের বিশেষ এক দোকানদারের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে দরবারের অনেক অনেক আমীর ব্যক্তি জগৎশেঠের কাছ থেকে এই মশলা চান। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ তাঁর সোনার কৌটা থেকে বের করে একটি একটি ছোট রাংতায় মোড়া গুলি আমীরদের হাতে দেন।

সেই জগৎশেঠ বলেন—আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? বেশ তো আলোচনা চলছে।

না, শেঠজী, আপনারও তো একটা আলাদা মতামত আছে!

আমি আবার মতামত দিতে যাব কেন? আমার যে ব্যবোসা আছে, সে ব্যবোসা আমি নিজের মতেই চালাই। সরকারের সাহায্য আমি চাই না।

তর্ক তবু সমান তালে চলতে থাকে।

একসময় নবাব বিরক্তবোধ করেন।

তাঁর তখন আরাম কক্ষে গিয়ে কোমল কিছু জীবন্ত মাংসের পিঠে ঠ্যাসান দেবার বাসনা জাগছে। একেই দরবারে কোনদিন তাঁর বেশীক্ষণ বসতে ভাল লাগে না। শুধু আসেন একটা ভয় সর্বদা তাকে তাড়া করে বলে। যদি দরবারে না বসলে নবাবীটা হঠাৎ কেউ হাতিয়ে নেয়?

তাই বিরক্ত হয়ে সভাসদদের বলেন—ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নিন। সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশীক্ষণ আপনারা সময় নষ্ট করবেন না।

ব্যাপারটা মিটিয়ে নেন হাজী নিজেই।

ব্যাপারটা না মেটালে এই ব্যবসাদাররা তাঁর পিছনে লাগতে পারে ভেবে আমীরদেরই সমর্থন করেন।

ব্যবসাদাররা সরকার থেকেই পাবে সাহায্য। হ্যাঁ, শিল্পের উন্নতি করতে গেলে সরকারের সাহায্যই দরকার।

ব্যবসাদারদের সমর্থন করে কিন্তু হাজী একেবারে চুপ হয়ে যান না।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল তিনি চকবাজারের দিকে ঘুরছেন।

কদিন শুধু এলোমেলোভাবে ঘুরলেন। কেউ কেউ তাঁকে চিনল, আভূমি সেলাম করল। কেউ চিনল না, কোন বিদেশী ফকির ভেবে দলে ভেড়াতে চাইল।

হাজী সাহেব শুধু ঘুরে চলেন।

তাঁর সেই কুটিল মুখখানি, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি যেন ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে ওঠে।

বার বার তাঁর মনে পড়ে আলিবর্দির কথাটা।

'দাদা, আমার ভাগ্যে সিংহাসন আসবে কবে?

হাজী তাকিয়ে থাকেন সমস্ত মুর্শিদাবাদের দিকে।

সাচ্চা চুমকির পোষাক পরে যেন মুর্শিদাবাদ জোয়ানী এক আওরত হয়ে উঠেছে। একটি আলো ঝলমল শিশিরবিন্দুর মতো টলমল করছে মুর্শিদাবাদ। চকবাজারের দুপাশে থরে থরে সাজান দোকান। কত হরেক রঙের নক্সা কাটা কার্পেট, হাতির

দাঁতের জন্যে মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত, সেই হাতির দাঁতের নানারকম জিনিস সাজানো রয়েছে দোকানে। সাদা পাথরের নানারকম কাজের জিনিসও সাজানো। তাজমহল দেখা যাচ্ছে। সুন্দর সুন্দর ছোট বড় মডেল তাজমহলে যেন আগ্রার সৌন্দর্যই এনে দিয়েছে। আর্মানী ফরাসী, নানাধরনের বিদেশী সাহেবও ব্যবসার জন্যে এসে জমায়েত হয়েছে।

হাজী আরও এগিয়ে চলেন, দেখতে পান সরাবের দোকান। দোকানের আড়ালে সুন্দরী স্বল্পবাসা বিদেশিনীরা বিক্রি বাণিজ্য করছে। চটুল হেসে খদ্দেরকে খুশি করছে।

তারপর সরাইখানা। সরাইখানার মধ্যে দারুণ হৈ হুল্লোড। পথে কেউ কেউ হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেছে। কি এক খেমটা ধরেছে কালোসাৎ ধরণের একটা লোক।

ভীড় জমে ওঠে। হঠাৎ অল্পবয়স্ক এক সদ্য যৌবনা মেয়ে কার কাছ থেকে যেন চেয়ে আনা কাঁচুলি, ঘাগরা পরে সেই ভীড়ের মাঝেই নাচতে শুরু করেছে।

হাজী অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন সেই মেয়েটির দিকে।

তালগাছের মাথার ওপর শকুন বসে কোন্ দিকে যেন চেয়ে আছে।

তারপর কি ভেবে হাজী চলতে থাকেন।

রঙমহলে সুন্দরী মেয়ের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এবার একটু সরবরাহ কমাতে হবে।

নবাব যেন দিন দিন ভারী লোভী হয়ে উঠছেন। সেদিন জেনানামহলের সর্দারণী বলছিল—হুজুর, নবাব আজকাল রোজ নয়া ফরমাইস করেন কিন্তু এতো নয়া লেড়কী মিলবে কোথায়?

নয়া সরবরাহ যোগাড়ের জন্যে বেশ কিছু লোক মোতায়েন আছে। তারা বিশ্বাসী। অপর্যাপ্ত উৎকোচের বিনিময়ে তারা নিয়ে আসে কোথা থেকে যেন সব মেওয়া ফলের মতো মেয়ে।

সেদিন দরবারেই কে একজন সরকারের কোন্ কর্মচারীর নামে নালিশ এনেছিল। কর্মচারীটি নাকি বেশ কিছুদিন ধরে এক গ্রামের মধ্যে ঘুর ঘুর করছিল। তার ঘোরার জ্বালায় গ্রামের বৌঝিরা পুকুরে যেতে পারছে না। এর কোন বিহিত না করলে সমূহ বিপদ। কর্মচারীটির অভিসন্ধি বোঝা যাচ্ছে না।

আর সেই অভিযোগ আনা হয় হাজীর কাছে।

হাজী চলতে চলতে তাই হাসেন।

তিনি সেই লোককে আশ্বাস দিয়েছিলেন। আর কর্মচারীটিকে আলাদা ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ঐ গ্রামে কি এমন কোন সুন্দরী আছে?

কর্মচারীটি চোখের ট্যারচা দৃষ্টি ফেলে বলেছিল—হুজুর, অমুক গৃহস্থের একটি মেয়ে একেবারে খাসা আপেল। সবে যৌবনের কুঁড়িটি ফুটেছে। আর গায়ের রঙ যেন গোলাপ পাতার মতো টকটকে।

একদিন সেই মেয়েটিও নবাব প্রাসাদে আসে।

নবাব প্রাসাদে যারা এসে পোষ মানতে চায় না তাদের কদিন কতকগুলি ভয়াবহ স্থানে রাখা হয়।

প্রাসাদের নীচে কতকগুলি ছোট ছোট আলোহীন অন্ধকার ঘর আছে। সেই ঘরে বেয়াড়া মেয়েগুলি থাকে। তারপর নবাবকে স্বীকার করলে তাদের ধোওয়া মোছা করে ভাল খোলতাই জামা কাপড় পরিয়ে নবাবের সামনে ধরা হয়।

হাজী ভাবেন—লাভ কি এতে? নবাবকে প্রত্যহ এই নতুন নতুন সুখ দান করে তাঁর কোনই মুনাফা হয় না।

কিন্তু লাভ যে একদিন হবে হাজী জানেন। নবাব দিন দিন কেমন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সুরা ও নারীর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, এটাও কি একটা লাভ নয়?

এই সময়ে দরবারে একটা নতুন সমস্যার উদয় হয়।

সমস্যা ঠিক নয়, বরং লাভ। বিহারের শাসন ভার বাংলার নবাবের অধীনে এসে যায়।

হাজী ভাবছিলেন তখন বড় এলোমেলো ভাবে। হঠাৎ একটা সুযোগ এসে যায়। ভাইকে আর একটু উঁচুতে তোলবার লোভ সংবরণ করতে পারেন না।

ফকিরউদ্দৌলা ছিলেন বিহারের শাসনকর্তা।

কিন্তু তিনি বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলেন। সে কথা জানতে পেরে সুজাউদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান।

বিহার বাংলার অধীন হয়।

বিহারের শাসনভার ভাইকে পাইয়ে দেবার জন্যে হাজী আহম্মদ আবার তাঁর কূটবুদ্ধির জাল বিস্তার করেন।

সুজাউদ্দিন বিহারের অধিকার পেয়ে প্রিয় পুত্র সরফরাজকেই সেখানকার শাসনকর্ত্তা করে পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

হাজী আবার দাঁড়ান জিনৎ বেগমের সামনে।

জিনৎ অনেকদিন পর স্বামীর সঙ্গ পেয়ে খুশি। আর সেই স্বামীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন দেওয়ান হাজী সাহেব। তিনি সেইজন্যে হাজীর কাছে কৃতজ্ঞ। বলেন—উজীর সাহেব, আপনার কিছু বলবার আছে?

হাজী নিজেই অনুগতর মতো ভঙ্গি করে বলেন—বেগমসাহেবা, নবাব শাহজাদা সরফকে পাঠাতে চাইছেন বিহারের শাসনকর্ত্তা করে, তা আমি বলছিলাম কি, শাহজাদা সরফকে না পাঠিয়ে শাহজাদা মহম্মদ তকীকে পাঠানোই ভাল। কারণ মহম্মদ তকীর অনেক দিনের ইচ্ছে তিনি বিহারেব শাসনকর্ত্তা হবেন।

জিনৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—কিন্তু বিহারের শাসনভার তো একজন যোগ্য লোককেই দেওয়া উচিত। আমার ইচ্ছে নয় নবাবের কোন পুত্রই এই গুরুভার নিক্। কারণ তারা এখনও ছেলেমানুষ, ঠিক মত প্রদেশ শাসনে উপযুক্ত নয়।

এটাই আশা করেছিলেন হাজী, তাই মনে মনে খুশী হয়ে মুখে বলেন—তাহলে কাকে এ ভার দেওয়া যাবে?

জিনৎ বলেন এ বিষয়ে আমি নবাবের সঙ্গে কথা বলি, তারপর আপনাকে জানাবো।

নবাবের সঙ্গে জিনতের দেখা হবার আগেই হাজী আলিবর্দীকে পাঠিয়ে দেন নবাবের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করতে। শুধু দেখা করতে নয়, নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে। মানে, নিজের হয়ে প্রচার চালাতে।

তারপরই দেখা হয় জিনৎ বেগমের সঙ্গে নবাবের। নবাব সঙ্গে সঙ্গে বলেন—একমাত্র উপযুক্ত লোক আছে আমার সেনানায়ক আলিবর্দী খাঁ।

জিনৎ একটু ভেবে সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করেন তাঁকে।

তারপরই খেলাৎ তৈরী হয়। উৎসব রচনা করে আলিবর্দীকে পাটনার শাসনকর্তা বলে ঘোষণা করা হয়।

আলিবর্দী নতুনভাবে সম্মানে ভূষিত হন মহবতজঙ্গ বাহাদুর।

পাটনা যাবার মুখে আড়ালে ডেকে হাজী আহম্মদ আলিবর্দীকে বলেন—খুশি হয়েছ তো!

আলিবর্দী বলেন—এ তো প্রদেশ শাসনকর্তার পদ, নবাবী কোথায়?

একমুখ দাড়ির মধ্যে হাজী আর হাসিটা লুকিয়ে রাখতে পারেন না। ভাইয়ের বোকামী দেখে বলেন—ধীরে ধীরে। একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

তারপর একদিন এই পাটনার স্বাধীন নবাবী হাজী আহম্মদ আলিবর্দীকে পাইয়ে দিয়েছিলেন। একেবারে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ফরমান নিয়ে এসে ভাইকে কায়েমী করে নবাবীতে বসান।

সেই নবাবী প্রাপ্তিতে নবাব সুজাউদ্দিন সর্বপ্রথম উজীরের ওপর ভীষণ চটে ওঠেন। কিন্তু তখন করবার তাঁর কিছু ছিল না। একেবারে হাত পা বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রে ডোবেন।

তবে সে অংশ অনেক পরের।

হাজী মহম্মদ ভাইকে বিহারে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। আর বলে দেন, শাসনভার পেয়ে যেন অন্যদিকে মন দিও না। ভুলে যাবে না আমরা গরীব। গরীবকে মাথা তুলে ধনী হতে হবে। তার জন্যে তাকে সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

আলিবর্দী দাদাকে আভূমি সেলাম করে নিজের আনুগত্য দেখিয়ে বলেন,—দাদা তোমার বুদ্ধির কাছে আমি নগণ্য।

ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েও হাজী আহম্মদের মনে শান্তি ছিল না।

মাঝে শোনেন, রংপুরে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ নবাবের মতো এক রংমহল বানিয়েছে। খুব সরাব খাচ্ছে আর নর্তকীর নাচ দেখছে। শুধু তাই করেই ক্ষান্ত নয়, অন্য দিকেও হাত বাড়িয়েছে।

খবরটা রংপুর থেকে নিয়ে আসে এক ফৌজ।

নবাব সেই ফৌজীকে আহম্মদের কাছে পাঠান। আর হাজী আহম্মদ শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছেলেকে বেঁধে আনতে হুকুম দেন।

নবাব ফৌজ সারি বেঁধে চলে যায় রংপুরে।

রংপুর থেকে যখন সৈয়দ আহম্মদ এসে পৌঁছায় সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড।

হাজী আহম্মদ সাধারণ গৃহস্থের মতো বয়স্ক পুত্রকেও সর্বসমক্ষে প্রহার না করে ছাড়েন না।

সেই নিয়ে নবাবী নগরেও খুব একটা আলোচনা হয়। সবাই দেখায় হাজী আহম্মদের মহানুভবতা। পুত্রকে শায়েস্তা করতে এমনি বাপেরই প্রয়োজন।

জিনৎ এসে না দাঁড়ালে হয়ত হাজী আহম্মদ পুত্রকে মেরেই ফেলতেন।

জিনৎ বললেন—উজীরসাহেব, আমি সৈয়দের হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। এবারের মতো ওকে মাফ করে দিন।

সৈয়দ চলে গেল রংপুরে।

আবার নবাব প্রাসাদে নেমে এল কর্মচাঞ্চল্যতা।

হাজী আহম্মদ বসে বসে ভাবেন, কোন্ দিক দিয়ে নবাবী কায়েম করবেন। নবাবী সিংহাসনটা দেখে যেন তাঁর চোখের আর পলক পড়ে না।

মনে মনে অনেক ছল চাতুরীর আশ্রয় নেন। একদিন দেবেন কি গুপ্তঘাতককে দিয়ে নবাবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে?

আবার ভাবেন, তাহলেই বা নবাবী মিলবে কেমন করে? সরফরাজ আছে, তকী আছে।

এই সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একদিন আলোর সন্ধান পান।

এক ব্যবসাদার আসে তাঁর সঙ্গে আলাদা দেখা করতে।

ব্যবসাদার উজীর সাহেবকে আলাদা কিছু নজরানা দিতে চায়, আর তখনই হাজীর মনে পড়ে কৌশলটা।

তারপরই তিনি এক সরাইখানার মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। গোপনে সেখানে ব্যবসাদারদের সঙ্গে মিলবেন এবং তাদের কিছু বাড়তি সাহায্য দেবেন, তারা গোলাম হয়ে যাবে। দরকার হলে এরাই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

এই পরিকল্পনা নিয়েই তাঁর কাজ শুরু হয়।

হাজী প্রত্যহ দরবার শেষের পর পদব্রজে এক মসজিদে এসে নামাজ পড়তেন।

প্রাসাদের লোকেরা জানে তিনি নামাজ পড়তেন প্রত্যহই প্রাসাদের বাইরে যান।

নামাজ সত্যি সত্যি পড়েন গিয়ে মসজিদে। ঈশ্বরকে আকুল হয়ে ডেকে বলেন—আমার গরীবি জীবন মোচন করে সাধ পুরিয়ে দাও। আমি তোমার গোলাম হয়ে যাব। চোখের জলও ফেলেন মসজিদের প্রাঙ্গনে।

তারপর বেরিয়ে আসেন থমথমে মুখ নিয়ে। শ্যাম সজীব ঘাসের জাজিম মাড়িয়ে এসে দাঁড়ান চকবাজার থেকে একটু দূরে এক নিরালা সরাইখানায়।

এই সরাইখানার নীচেটা দিনরাত হৈ হুল্লোড়ে পূর্ণ থাকে। সেখানে নানাধরনের লোক দিনরাত নানা অন্যায় করে। জুয়া, মদ, মেয়েছেলে, তার সঙ্গে ছুরি মারামারি।

হাজী আহম্মদ সব জানেন। ইচ্ছে করলে নবাবী ফৌজ আনিয়ে নীচের লোক-

গুলোকে ধরে নিয়ে শূলে চড়াতে পারেন।

কিন্তু সে সব কিছু করেন না। বরং তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সরাইওয়ালার কাছ থেকে ওপরের একটা ঘর কিছুক্ষণের জন্য ভাড়া নেন।

নিজের পরিচয় গোপন করেন। যথাসম্ভব ছদ্মবেশেই আসেন সেই সরাইখানায়।

তারপর ব্যবসাদারদের যোগাড় করে নিজের কাজ চালু করে দেন, ব্যবসাদাররা জানতে পারে তাঁর আসল পরিচয় কিন্তু তারা কাউকে বলবে না বলে কবুল করে। এইভাবে চলতে থাকে হাজী সাহেবের নতুন খেলা।

রাঘব চোধুরী তখনও পাননি এই আস্তানার খোঁজ।

তিনি তখন বেনিশানা হয়ে ঘুরে চলেছেন নবাবী নগরে।

শুধু মধ্যে একটা কিছু করেছেন, চরমারিতে তার যে ব্যবসা আছে, যে মাল বাইরে পাঠাতেন, তার কিছু মুর্শিদাবাদ বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করেছেন।

এই নিয়েই ছিলেন। কিন্তু এ নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

হঠাৎ একজনের কাছ থেকে উজীরসাহেবের খোঁজ পান।

উজীরসাহেব ঐ বুড়ো বটগাছের পাশের সরাইখানায় রোজ আসেন, সেখানে তাঁর পরিচয় উজীর সাহেব নয়, এক ভিনদেশী ফকির কিছু কাজ কারবার করবার জন্যে এদেশে এসেছে। ফকির সাহেবের নিজের কিছু প্রয়োজন নেই, তিনি আল্লাকে ডেকেই বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। শুধু তিন গণ্ডা নাতি নাতনীর জন্যে আবার কাজ কারবারে নেমেছেন। তাদের কিছু গুছিয়ে দিয়ে এবার তিনি সংসার ছেড়ে মক্কায় চলে যাবেন।

এমনি এক প্রচার বাইরে প্রকাশ করে উজীরসাহেব সেই হল্লার সরাইখানায় মাঝে মাঝে জুয়ার আড্ডায় বসে যান।

জুয়া খেলেন অভ্যস্ত জুয়াড়ীর মতো।

ছেলে ছোকরারা ফকির চাচার খেলা দেখে চোখ গোল গোল করে। বলে—চাচা, এ খেলা কি তোমার নতুন? না, বহুদিন ধরে হাত পাকিয়েছ?

চাচার চোখ দুটি কেমন যেন জুয়াড়ীর চোখে চোখে ফেরে।

সস্তা মেয়েছেলেও এসে পাশে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

উজীরসাহেব সেই চটুল ভঙ্গির মেয়ের দিকে তাকিয়ে রসিকতা করেন।

জুয়াড়ীরা বলে—চাচা, এসবও চলে?

উজীর বলেন—সবই চলত, তবে আজ আমি ফকির। আল্লার ভজনা নিয়েই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই।

তবু সেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে দাড়িতে হাত বুলিয়ে চোখ মটকে হাসি এগিয়ে দেন।

তারপর জুয়ার টাকা জিতে এক মুঠি মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ওপরের সিঁড়ি ধরেন। ওপরের একখানি ঘর কিছুক্ষণের জন্যে ভাড়া নেন।

কারা কারা যেন ওপরে ফকির সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

সে সরাইখানার মালিকও জানে না।

শুধু লোকগুলি যারা আসে তারা যে এক একজন জমিদার ধরনের লোক দেখে মনে হয়।

ফকিরকে কিছু জিজ্ঞেস করলে কিন্তু অন্যমূর্তি। তিনি আর তখন হাস্য পরিহাস করেন না, সেই ভয়ঙ্কর চোখ দুটি ছোট করে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন—আপনা কাম দেখো।

তাই অনেকেই জানে। ফকির সাহেব যে সে লোক নয়। অমনি পরিহাস কণ্ঠ নিয়ে থাকেন বটে, আসলে গভীর জলের মাছ। টাকা যেমন উপায় করেন, খরচ করতে তেমনি জানেন।

আর যারা ওপরে আসে তারা জানে ইনি কে?

কিন্তু বাইরে প্রকাশ করবার হুকুম নেই। প্রকাশ করলেই নবাবী কানুনেই অন্য বিচার হবে।

এমনি এক বিচারও একদিন হয়ে গেল।

হাজী আহম্মদ তখন সবে ব্যবসাদারদের সঙ্গে একটা রফায় বসেছেন।

তিনি কিছু মুনাফা চান না। শুধু উপকার করে যাবেন। এই ব্যবস্থা নিয়েই কাজে হাত দিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্যবসাদারদের আর্জি—আপনি অন্তত কিছু বখরা নিন।

হাজীর চেহারা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিকে তাকিয়েও জমিদারগোছের লোকেরা কথা বলতে পারেন না।

ঠিক যেন শকুনের দুটি চোখ। আর ঠোঁটের হাসি যে এত ধারাল, কেউ না দেখলে বিশ্বাস করবে না। হাজী কথা বলেন টেনে টেনে। অনেক কথা বলেন না শুধু চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি দিয়ে শেষ করেন।

তবু লোকে সুবিধা পাবার জন্যে আসে। দরবারে আর্জি জানালে তো সরকার থেকে যে ব্যবস্থা সবার জন্যে হবে তাই পাওয়া যাবে। সেই সরকারী লোক যদি আলাদা কোন সুবিধে দেয়, আর সে সুবিধে যদি নিজেদের অনুকূলে হয়, তাহলে মন্দ কি? তাছাড়া উজীরসাহেবের ডাক, এ ডাক উপেক্ষার শক্তি কারও নেই।

নবাব সুজাউদ্দিনের সময়ে লোকে বুঝতে পেরেছিল, নবাবসাহেব যদি কোন অপরাধ ক্ষমা করেন, উজীর সাহেব করবেন না।

অথচ নবাবীর সব কিছু নির্ভর করছে এই উজীরের ওপর।

হাজী আহম্মদের কৌশলের পুরোপুরি তখন পূর্ণ অবস্থায় আসে নি। শুধু তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন, এই অল্প বিস্তর ধনী লোকগুলিকে নিজের হাতে আনবেন। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, এদের সাহায্য পাবেন। এদের সাহায্য পেলে বাংলার নবাবী হাতে পেতে কোন অসুবিধা হবে না।

এই পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার মুখেই একজনের দুঃসাহস জাগল।

তিনি সেই সরাইখানাতেই হাজির মুখের সামনে বললেন—উজীরসাহেব, আপনার চালাকি বুঝতে পেরেছি। আপনি চান সরকারী ব্যবস্থা বানচাল করে দিতে। আর নিজের ব্যক্তিগত একটা বাসনার পূর্ণ রূপ দিতে।

হাজী আহম্মদ সেই বড় টেবিলটার ওপাশে বসে অভিযোগকারীর চোখের দিকে জুল জুল দৃষ্টিতে তাকান। কোন রকম রাগ প্রকাশ করেন না। শুধু টেনে টেনে বলেন—আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, ঠিকই অনুমান করেছেন। তাহলে আসুন উভয়ে মিলে সেই বাসনাই পূর্ণ করি।

কিন্তু অভিযোগকারী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন - কখনও নয়। নবাবের রাজত্বে বাস করে নবাবের বিরুদ্ধাচারণ করা ঘোরতর রাজদ্রোহিতা। আমি আপনার সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করতে পারব না।

এই বলে সেই নন্দনপুরের জমিদার হরিহর মিশ্র বেরিয়ে যান।

আর তার কদিন পরেই, নবাব দরবারে বসে আছেন। সেদিন হরিহর মিশ্রও গেছেন নবাবের কাছে কি এক আর্জি নিয়ে।

হরিহর মিশ্র দরবারের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন।

রক্ষী এসে জানায়, দরবারে হরিহর মিশ্র নামে নন্দন পুরের এক জমিদার দেখা করতে চান।

নবাব বলেন—তাঁর কি আর্জি জেনে এসো ? এখন গুরুতর বিষয়ে দরবারে আলাপ আলোচনা হচ্ছে. বিশেষ দরকার ছাড়া কারও কোন বিষয়ের আলোচনা হবে না।

কিন্তু উজীর হাজী জানতেন হরিহর মিশ্র আজ আসবেন। তার মত ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন।

নবাবের কানে কানে তাই কি বলেন।

নবাব মাথা নেড়ে রক্ষীকে বলেন—নন্দনপুরের তালুকদারকে সালাম জানাও রক্ষী।

হরিহর মিশ্র দরবারে এসে আভূমি সেলাম জানান। নবাবের দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

এবার উজীর হাজী নবাবের কানে কানে কি যেন অনেকক্ষণ বলেন।

নবাব হঠাৎ একটি গোলাপ ফুল শুঁকতে শুঁকতে সুবেশধারী লম্বা কোট পরিহিত হরিহর মিশ্রর দিকে তাকিয়ে বলেন—নন্দনপুরের তালুকদার, আপনার বকেয়া সব রাজকর খাজাঞ্চিখানায় জমা হয়েছে তো !

না হুজুর, সেই কথাই বলবার জন্যে এসেছি। আমাকে আর কদিন সময় দিন। হরিহর মিশ্র একান্ত অনুগতর মতো জোড়হাত করে বলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে নবাব সুজাউদ্দিন গর্জে উঠে বলেন—তুমি দয়া চাও কাফের, আর আমার নামে চতুর্দিকে দুর্নাম করে বেড়াও।

হরিহর মিশ্রর তখন অবাক হওয়ার পালা।

হুজুর, আমি আপনার দুর্ণাম করেছি ?

উজীর হাজী নির্লিপ্তকণ্ঠে বলেন—হুজুর, সাক্ষী আছে। আমাদের চর রহিম আলীই সেই খবর নিয়ে এসেছে।

হাজী সাহেব এক রক্ষীকে রহিম আলীকে ডেকে আনবার জন্যে পাঠান।

রহিম যেন দরবারের পাশের গলিতেই দাঁড়িয়েই ছিল।

হ্যাঁ, হুজুর, আমি নিজের কানে শুনেছি। তারপর হরিহর মিশ্রর দিকে তাকিয়ে বলে—এই হিন্দু জমিদার একদিন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে অনেক লোক জড়ো করে নবাব খোদাতাল্লার দুর্ণাম গাইছিল।

হাজী সাহেব রহিম আলীকে আর বেশী কথা বলতে দেন না। তাড়াতাড়ি বলেন—তোমার কাজ শেষ হয়েছে তুমি আসতে পারো।

রহিম আরও কিছু বাডতি কথা বলতে যাচ্ছিল, নবাবই তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করেন। তারপর হরিহর মিশ্রর দিকে তাকিয়ে বলেন—তোমার আর কিছু বলবার আছে?

উজীর হাজী টেনে টেনে বলেন—বলবার আর আছে কি? এইসব লোকের বিষদাঁত এখুনি ভেঙে না দিলে ভবিষ্যতে মুস্কিল হওয়ারই সম্ভাবনা।

হরিহর মিশ্র উজীর সাহেবের দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধভঙ্গিতে কিছু বলতে যান।

আর সঙ্গে সঙ্গে নবাব সুজাউদ্দিন গর্জে ওঠেন।

আনসার আলী, এই রাজদ্রোহী বেসরমকো বন্দীশালামে লে যাও। এর কি বিচার হবে আমি জানি না। তবে তার আগে এর স্পর্দ্ধার জন্যে খানা না দিয়ে ভুখে ভুখে রাখবে।

উজীর হাজী তাঁর দাড়ির আড়ালে ঠোঁটে সেই বিচিত্র হাসিটি টেনে ধীরে ধীরে বলেন—বিচার আর কি হবে হুজুর, আগাছা উপড়ে ফেলাই তো চিরকালের নিয়ম।

দরবারের বিশেষ রক্ষী আনসার আলী। সে একাধারে নবাবের দেহরক্ষী, অন্যদিকে দরবারের হুকুমে বন্দীদের ব্যবস্থা করা তারই হেফাজতে।

দেখতে যেমন ভীষণাকৃতি। তেমনি তার সাজপোষাক। এগিয়ে এসে হরিহর মিশ্রর হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলে।

হরিহর মিশ্র এতক্ষণ যেন একটা অলীক নাটক দেখছিলেন কিন্তু রক্ষী এসে সত্যি সত্যিই তাঁকে বন্দী করতে তখন আর চুপ করে থাকতে পারেন না, চিৎকার করে বলেন—নবাবসাহেব শুনুন, আমার আরও কিছু বলবার আছে। ঐ উজীর সাহেব—।

কিন্তু তাঁকে আর আনসার আলী বলতে দেয় না। তার বিশাল হাতখানি দিয়ে নন্দনপুরের জমিদারের লিকলিকে হাতটা চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায়।

দরবার গৃহ কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়।

নবাব ভেলভেট মোড়া সিংহাসনে বসে উসখুস করেন। অনেকক্ষণ দরবারে বসে আছেন। দরবারে সরাব পান করা নিষিদ্ধ। তবু যেন একপাত্র সরাব পেলে জিবের শুকনো ভাবটা কেটে য়ায়।

এই সময়ে হাজী সাহেব নবাবের দিকে ঝুঁকে নিম্নস্বরে অনেকক্ষণ ধরে কি বলেন।

নবাব জোরে জোরে মাথা নাড়েন। দু চারবার তাঁর মুখে বাঃ বাঃ তোবা তোবা শোনা যায়।

তারপর লজ্জিত হয়ে চোখের দৃষ্টি এমন করেন যার মধ্যে ফুটে ওঠে শুধু কৃতজ্ঞতা।

সেই রাত্রে কজন ফৌজী সেনা ভিনদেশী ডাকাতের ছদ্মবেশে ঘোড়ায় চড়ে নন্দনপুরের দিকে এগিয়ে যায়।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অন্ধকার আকাশ।

মুর্শিদাবাদ থেকে নন্দনপুর, আজিমগঞ্জের পাশ দিয়ে তিনক্রোশ পথ যেতে হয়।

নবাবের ফৌজীরা দ্রুতগামী অশ্বারোহী। দলেও অনেকজন ছিল।

যখন তারা নন্দনপুরের মধ্যে এসে পৌছোয় তখন গভীর রাত্রি।

নন্দনপুরের একটি মানুষও জেগে ছিল না যাতে এদের আগমন বুঝতে পারে।

ছদ্মবেশী ফৌজের লক্ষ্য জমিদার বাড়ী।

অন্ধকার গ্রাম। কাছের মানুষ পর্যন্ত চেনা যায় না। তবু সঙ্গে একজন ছিল যে জানত জমিদার বাড়ী কোন্‌দিকে।

কিছু কিছু এলোমেলো মাঠ পেরিয়ে কটা ঘন ঘন দীর্ঘসারির গাছ, তারপরই জমিদার বাড়ী।

জমিদার বাড়ীর সীমানা ঘিরে উঁচু পাঁচীল।

ফটকের গেট বন্ধ ভেবে সেই ঘোড়সওয়াররা হঠাৎ এক পাঁচীলের কাছে এসে দাঁড়ায়, তারপর উঁচু পাঁচীলের ওপর কাঠবেড়ালীর মতো উঠে পড়ে।

ওপার থেকে চিৎকার ওঠে—কে রে?

কিন্তু তার স্বর আর দ্বিতীয়বার বের হয় না।

ঘোড়সওয়াররা তখন লাফিয়ে পড়েছে জমিদার বাড়ীর মধ্যে। আর যারা রাতের প্রহরা দিচ্ছিল, তাদের ধড় এককোপে মুণ্ড থেকে নেমে গেছে।

দু একজন বিকট আকার চিৎকার করেছিল, সেই চিৎকারে জমিদার বাড়ীর ভেতর মহলের কেউ কেউ সজাগ হয়ে ওঠে।

তার মধ্যে জমিদারের তিন বৌ ও যুবতী এক কন্যা হৈমন্তী।

হৈমন্তী এলোমেলো কাপড় চোপড় ঠিক করে ঘরের বাইরে আসে।

তখন সারা বাড়ী মশালের আলোয় রাঙা।

আর মৃত্যু তাণ্ডব।

ডাকাত, ডাকাত বলে চিৎকার।

ডাকাত পড়েছে সব সাবধান।

দাসদাসীরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। জমিদারের তিন বৌ, শেষেরটি সবে এসেছে একবছর।

সেতো কেঁদেই একসা।

এতক্ষণ গোলমালটা বার মহলেই ছড়িয়েছিল, হঠাৎ ভেতর মহলেও আসতে লাগল।

কে যেন গর্জে উঠে বলল—খবরদার, জমিদারবাবু বাড়ী নেই, তোমরা ভেতর মহলে ঢুকে মেয়েদের কোন অসম্মান করবে না।

কিন্তু তারও আর কোন কথা শেষ পর্যন্ত বের হয় না। একটা বিরাট চীৎকারের মাঝে সব লীন হয়ে যায়।

এই সময়ে হৈমন্তী দেখল, কে যেন তাকে পিছন থেকে তুলে নিল।

হৈমন্তী নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অলিন্দের এক সরু জায়গা দিয়ে অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় তার চেষ্টা করছিল।

সে বুঝতে পেরেছিল ভেতর মহলেও ডাকাত ঢুকেছে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এসে তাকে আক্রমণ করবে বুঝতে পারে নি।

তাই তাড়াতাড়ি আর্তস্বরে বলে—তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমার গায়ে ছাড়াও অনেক গহনা আমার ঘরে আছে।

তখন তার কানের কাছে কে যেন চাপাস্বরে বলল—আমরা ডাকাত নই। শুধু তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

আমাকে? অন্ধকারে হৈমন্তীর সুন্দর বড় বড চোখ দুটি আরও বড় হয়ে ওঠে।

চাপাস্বরে আবার উত্তর আসে—হ্যাঁ গো, আমাদের নবাব তোমায় চেয়েছে। সেখানে থাকবে, বেগম হবে, তোমার রূপের ইনাম পাবে।

হৈমন্তীর এবার চিৎকার করবার পালা কিন্তু সে চীৎকার করবার আগেই একদলা কাপড এসে তার মুখের মধ্যে কে পুরে দিল।

তারপর নবাব সুজার সামনে হৈমন্তী।

হাজী সাহেবের কথাই ঠিক। এমন মেয়ে নাকি নবাবসাহেব সারজীবনে দেখেন নি?

এসব কথা বাইরের কেউ জানে না। জানলেও খুব একটা আমোল দেয় না।

তাছাড়া নবাব সুজাউদ্দিন একজন আমোদপ্রিয় মানুষ।

মাঝে মাঝে প্রাসাদে উৎসব হয়।

প্রাসাদ সাজানো হয় আলোর মালায়। সারাদিন ধরে প্রাসাদের তোরণদ্বারে সানাই বাজে নানান সুরে।

কামানের তোপ দাগা হয় মুহুর্মুহু।

দেশবিদেশ থেকে কত লোক আসে নৌকায় করে।

কত তাঞ্জাম আসে নানারঙের আবরণে মুড়ে। তার মধ্যে নাকি রহিস আদমীদের সব জেনানা।

সেনারাও সেদিন সামরিক পোষাক পরে থাকে না।

চকবাজারের সরাবের দোকানগুলোয় সেদিন অনেক বিক্রী।

সেইজন্যে কিছু লোক পরম্পরায় নবাবের কীর্তি কাহিনী বাইরে প্রচার হলেও কেউ আমোল দেয় না।

যুব সমাজের তো দারুণ স্ফূর্তি। তারা এক বাক্যে নবাবের হয়ে তর্ক তুলে দেয়।

এমনি এক উৎসব মুখর প্রাসাদের সামনেই একদিন রাঘব চৌধুরী এসে দাঁড়ালেন।

তিনি অনেকবার সরাইখানার হাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু পারেন নি। কাদের সঙ্গে দেখা করলে নাকি তারা হাজীর সঙ্গে যোগাযোগটা করিয়ে দেয় কিন্তু তারা কারা বুঝতে পারেন না।

তাছাড়া ভয়, যদি উজীর সাহেব প্রথম সাক্ষাতেই চটে যান।

এই ভেবে একদিন প্রাসাদের সামনে এসেই দাঁড়ান।

শুনেছিলেন, এদিন প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত। যে কেউ ঢুকে তার আবেদন জানাতে পারে. এই ভেবেই এসেছেন অনেক আশা করে। আর সেই আশাই তাঁর সফল হয়।

হাজী সাহেব তাঁর দৈন্য পোষাক পরেই প্রাসাদের বহির্ভাগে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। রাঘব চৌধুরী তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ও আভূমি সেলাম করলেন।

হাজী সাহেব একজন লম্বা-চওড়া, উঁচুধরনের মানুষকে দেখে যার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাকে বিদায় দিয়ে এগিয়ে এলেন।

তারপর পরিচয় হল দুজনের মধ্যে।

রাঘব চোধুরী সাহস পেয়ে বললেন—আমি আপনার সঙ্গে পরিচয় করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি।

হাজী সাহেব বললেন—তাহলে বহুৎ তকলিফ হয়েছে। এবার বলুন আপনার কি আর্জি?

রাঘব চৌধুরী বললেন—" 'র প্রয়োজন।

হাজী সাহেব চতুর্দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি সরাইখানায় দেখা করবেন তাহলেই আপনার আর্জি মঞ্জুর হবে। •বে সেখানে আমি উজীর সাহেব নই, ফকির আসাদুল্লা। আমি আমার জন্যে কিছু করি না, নাতি-নাতনীদের জন্যে আবার ব্যবসায় নেমেছি।

হাজী আহম্মদের সঙ্গে একদিন পরিচয় হল রাঘব চৌধুরীর। তিনি যতটা কঠিন মনে করেছিলেন ততটা নয় দেখে সন্তুষ্ট হলেন।

একদিন রাঘব চৌধুরী সরাইখানায় এসে ফকির আসাদুল্লা খাঁর সঙ্গে দেখা করলেন।

তারপরেই লোকে দেখতে পেল চকমারির চৌধুরী বাড়ীর আবার বাড়বাড়ন্ত।

চরমারির লোকেরা ভাবলে – তবে কি রাঘব চৌধুরী আবার পূর্বপুরুষের ব্যবসা ধরেছেন?

কিন্তু তাও যে নয় তার সাক্ষী, কতকগুলি নতুন তাঁত বসল গ্রামের মধ্যেই।

শুধু তাঁত নয়, হঠাৎ একদিন দেখা গেল, গাদা গাদা কাঠ নদী দিয়ে ভেসে এসে

চরমারীর ঘাটে লাগল, সেব সব কাঠ তুলে পাহাড় করা হল নদীর ধারে।

নিত্য নতুন লোক দরকার হতে লাগল রাঘব চৌধুরীর। গ্রামের অনেকেই চাকরী পেল রাঘব চৌধুরীর কাছে।

চৌধুরী বাড়ীর তিন মহল্লা প্রাসাদ সংস্কার হল। যে ঘরগুলি বন্ধ ছিল সে ঘরগুলি খোলা হল।

বার মহলে ব্যবসার অফিস ঘর ম্লান হয়েছিল, সে ঘর আবার সরব হল।

চরমারি গ্রামটাই যেন আবার জেগে উঠল।

রাঘব চৌধুরীর সঙ্গে এর মধ্যে হাজী সাহেবের বেশ কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেছে।

প্রথম প্রথম রাঘব চৌধুরী হাজী সাহেবেকে ভীষণ ভয় করত। বড় টেবিলের ওপাশে বসে কাল আলখাল্লায় ঢাকা মূর্তিটা কি ভীষণ। এক মুখ দাড়ির মধ্যে ছোট ছোট দুটি চোখ। আবার টেনে টেনে ধীরে ধীরে কথা বলেন। কথাগুলি কেমন যেন কাটা কাটা।

রাঘব চৌধুবী কোন প্রস্তাব দিতেই ভয় পেতেন।

হাজী সাহেব হাসতেন তাঁর দাড়ির মধ্যে হাসিটা আরও ক্রুর দেখাত। বলতেন— ডর কিঁউ চৌধুরী সাহেব, দোস্তি যখন হয়ে গেছে তখন আপনার ভালই আমি চাইব।

হাজী সাহেব কদিনের মধ্যে অনেক কিছুই করলেন।

রাঘব চৌধুরীর ব্যবসা ছিল পাট, তামাক ও মশলা।

তিনি রাঘব চৌধুরীকে দিলেন রেশম বস্ত্রের জন্য কতকগুলি তাঁত।

মুর্শিদাবাদে তখন রেশমবস্ত্র বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। সেই রেশমবস্ত্রের কিছুটা তৈরীর ভার চলে গেল চরমারিতে।

কতকগুলি বাগান ইজারা পাইয়ে দিলেন উজীরসাহেব। সেই বাগানের কাঠ দুর্মূ্লা। তার মধ্যে শুধু চন্দন কাঠই এতো পেলেন রাঘব চৌধুরী যে সেই কাঠ বিক্রী করে তাঁর সমস্ত অভাব দূর হল।

এদিকে সুভদ্রা ও সরলা আরও খুশি।

তাদের সেই ভাঙা বাড়ীটা সারানো হয়েছে। আর হাওয়া দিলে দুমদাম বালি খসে পড়ে না। তাছাড়া বড় বড় ঘরগুলো আর অন্ধকার নয়, সুন্দর রঙের পোচ পড়তে আলো ঝল-মলে হয়েছে।

আগে পায়রারা দিনরাত দোতলার কার্নিশে বসে বকবকুম করত, আর মলত্যাগ করে নীচের জায়গাগুলি অপরিষ্কার করে রাখত। হুস্ বলে তাড়া করলেও উড়ে যেত না।

তারা হয়ত পতিত বাড়ী বলে এতো দৌরাত্ম্য করত।

বাড়ী সংস্কার হতে পায়রাগুলো যে কোথায় উড়ে গেল কেউ জানে না।

তাছাড়া মাঝে মাঝে রাঘব চৌধুরী এসে যেসব কথা বলেন— তাতে আরও ভাল লাগে।

রাঘববাবু বলেন—দেখবে, একদিন এই চৌধুরীরা জমিদার হবে।

চৌধুরীদের পূর্ব-পুরুষদের অনেকদিন থেকে সখ ছিল, জমিদার হওয়ার কিন্তু সে সখ তাঁর মেটে নি। সেই কথাই বলেন রাঘব চৌধুরী। শুধু বলেন না হাজীসাহেবের কথা।

হাজীসাহেব বলে দিয়েছিলেন—আপনাকে আমি যথেষ্ট সাহায্য করব কিন্তু কখনও আপন প্রিয়জনকেও আমাব নাম বলবেন না। যদি বলেন, তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হলে আমাকে দায়ী করবেন না।

রাঘববাবু বুঝতে পারেন না কেন উজীরসাহেব এই সাহায্য করেন? শুধু তাঁকে করেন না, এমনি তো অনেকেই আছেন।

কিন্তু সে সব কথা নিয়েও বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে পারেন না।

এত কাজ ভীড় করে তাকে ঘিরে ধরে যে ভাবনারও ফুরসৎ পান না। তাছাডা সপ্তাহে দুবার মুর্শিদাবাদ যেতে হয়।

মুর্শিদাবাদে গেলে আর সেদিন কোন কাজই হয না। তবু তিনি জোরে ঘোডা চালান, ফেরেনও জোরে। কিন্তু তবু অনেক রাতই হযে যায় ফিরতে এক একদিন।

মহামাযা কিছুতেই দাদাকে নাগালের মধ্যে পান না।

নাগালের মধ্যে পেলে একবার জিজ্ঞেস করতেন—দাদা, সরুর বিযের কিছু করলে না?

সরলা আগের চেয়ে যেন আরও দামাল, আরও দুষ্টু হযেছে। বাড়ন্ত হয়েছে অনেক।

মহামায়া নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেন।

সরু, আমি কি তোর জন্যে মরে যাব?

কেন মা মরবে কেন? সরলা অযথাই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

সুজাউদ্দিন সিংহাসনে বসবার পর এই হযেছিল, দেশের লোকেরা যে যেখানে পারত মেয়ের বিযে দিয়ে দিত। মেয়ের বয়স খুব কম হলেও ক্ষতি নেই। শুধু সকলে জানে, নবাব ফৌজ কুমারী মেয়ে সুন্দর দেখলে ধরে নিযে যায়, বিবাহিতদের দেখলে নিয়ে যায় না, সে যতই সুন্দরী হোক্।

চরমারির লোকেরাও তাই করত।

এমনিভাবে গ্রামের অনেক ছোট মেয়েরও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

কেউ কেউ বিকেলে চৌধুরী বাড়ীতে সুভদ্রা, সরলার কাছে বেড়াতে এল। হঠাৎ আর এল না। শোনা গেল অমুকদিন তার বিয়ে।

সেই সব শুনেই মহামায়ার রাগ।

দাদা যে কি করছে? এত কিছু করে, আর দুটো ছেলে ধরে আনতে পারে না। যখন নবাবের লোক এসে ঘাড়ে পড়বে তখন বুঝবে ঠ্যালা!

সুভদ্রার মা নির্মলা ননদকে ঐ সব অমঙ্গলের কথা বলতে মানা করেন।

রাঘববাবু অবশ্য একটা ব্যবস্থা করেছিলেন, বাড়ীর ওপর জবর একটা পাহারা

দিয়েছিলেন।

লেঠেল সর্দার গোবিন্দ ঢালী তো আছেই। তাছাড়া আরও দল বাড়িয়েছিলেন।

হাজী আহম্মদ বাইরে মাল রপ্তানীর জন্যে অনেকগুলি দ্রুতগামী নৌকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

রাঘব চৌধুরীর অনেকগুলি নৌকা ছিল, সে সব নৌকাও সারা বছর জলে জলে ঘুরে বেড়াত। তার সঙ্গে এগুলি মিলতে আরও জোরদার হয়।

এইসব নৌকা পাহারা দেবার জন্যেও লেঠেল দরকার, সেইজন্যে লেঠেল তিনি বাড়িয়েছিলেন।

তাঁরও ভয় হয় মেয়ে দুটির জন্যে কিন্তু ফুরসৎ কোথায়? আগে যা-ও বা সময় পেতেন ইদানিং একেবারেই পান না।

তাছাড়া বাইরে কাউকে জানাতে চান না তাঁর দুটি মেয়ে আছে।

যুবতী মেয়ে দেশে কুমারী হয়ে আছে এ যেন বিরল।



তবু চরমারিতে যুবতী মেয়ে ছিল। আর তার নাম সীতা।

সীতা মাঝে মাঝে চৌধুরী বাড়ীতে আসত।

সীতার বাবাই মেয়ের বিয়ে দেন নি। পারেন নি মেয়ের বিয়ে দিতে।

ঘণ্টা নাড়া পুজোরী বামুন। দু'চার ঘর বামুন কায়েত গ্রামে গ্রামে যা আছে তাদের পুজো করেই দিন চলে। ঠিক চলে না।

মেয়ে আর বাপের চলে যায়।

রাখাল ভট্টাচার্য মেয়েকে আর কিছু দিতে পারেন নি, দিয়েছিলেন সংস্কৃত পাঠ শিক্ষা।

সীতা অন্য মেয়ের মত নয়। সে অনেক পড়েছে। তাই পড়ার চেহারাটা তার অন্যরকম। কথা যখন বলে—তখন বেশ শুদ্ধভাষায়।

কিন্তু বয়েস হয়ে চলেছে। আঠারো গিয়ে উনিশে পড়েছে। ভরা যৌবনের মেয়ে। এরকম ভরা যৌবনের মেয়ে বিবাহিত না হয়ে গ্রামে গ্রামে খুব কম আছে।

মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না কেন? শেষকালে কি নবাব ফৌজের চোখে পড়বে? একথা রাখাল ভট্টাচার্যকে কেউ বললে রাখাল ভট্টাচার্য কপালে হাত দেন।

যদি কপালে তাই থাকে হবে?

কিন্তু কপাল নিয়ে বসে থাকলে কি চলবে? ব্যবস্থা একটা করো। তাছাড়া অন্যলোকও তো আছে? ভরা যৌবনের মেয়ে। চোখ লাগতেও তো পারে?

রাখাল ভট্টাচার্যের অর্থ নেই সত্যি কথা। অভাবী মানুষ, শুধু থাকবার জায়গাটুকু

সম্বল। তাও খড়োচালের বাড়ীটা খড় অভাবে বর্ষাকালে থাকাই যায় না। শুধু জল ঝরে। যে মানুষ কয়টি খড়ের অভাবে ঘরের চালটা ছাইতে পারে না সে দেবে মেয়ের বিয়ে ?

তাছাড়া আর একটা কারণ ছিল মেয়ের বিয়ে না দেবার। রাখাল ভট্টাচার্য একা থাকবেন সেটা সহ্য করতে পারেন না।

মাঝে মাঝে বলেন—সীতা, তোকে একদিন হারাবো এ যেন ভাবতেই পারি না।

হারাবে কেন বাবা ?

হারাবো কেন ?

রাখাল ভট্টাচার্য ম্লান হাসেন। তারপর বলেন—ওরে তুই যে আমার মেয়ে ? এই তোকে এতদিন ধরে রেখেছি লোকে কত কথা বলে জানিস। সবাই বলে—রেখো বামুনটা এক নম্বরের স্বার্থপর। তাই ভাবছি, মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু বেচে দিয়ে তোকে পার করব।

তাও করেন না রাখাল ভট্টাচার্য।

সৎব্রাহ্মণ বলে রাখালকে সাহায্য করতেন রাঘব চৌধুরী।

অবসর যখন থাকত তখন রাখাল ভট্টাচার্য এলে তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের অনেক তত্ত্বকথা শুনতেন। তার বিনিময়ে রাখাল ভট্টাচার্যকে কিছু দক্ষিণা দিতেন।

এমনি সাহায্য দিলে নেবে না বলেই ঘুরিয়ে দেওয়া।

সেই সময় রাঘববাবু বলতেন—ভট্টাচার্য মশাই মেয়েটার বিয়ে দিন। যদি কোন সাহায্য দরকার হয় আমি করব।

তবে সে সব কাহিনী অনেক আগের।

তখন সীতার এতো বয়সও হয় নি।

সীতা এখন সুভদ্রা, সরলার চেয়ে একটু বড।

রাঘববাবুর অন্যদিকে মন।



নবাব ফৌজ শুধু গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই মেরে কেটে ধরে নিয়ে চলে যায়।

সীতা অন্য কোথাও খুব একটা যায় না। প্রায়ই বিকেলে চৌধুরী বাড়ীতে বেড়াতে আসে। এসে সে তার গাম্ভীর্যের মুখোস খুলে ফেলে।

নির্মলা, মহামায়ার সঙ্গে বসে সংসারের নানান বড় বড় কথা বলে, আবার সুভদ্রা ও সরলার মধ্যে এসে তাদের মত হয়ে যায়।

সরলা সীতাকে দেখে বলে সীতাদি, চলো আমরা তিনজনে মিলে নবাবকে

আক্রমণ করি।

সীতা হাসে, বলে—আক্রমণ করতে গিয়ে যদি হারিয়ে যাস্!

ইস্, হারিয়ে গেলেই হল!

আমাকে একখানা ছুরি দাও না, আমি নবাবের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আসব।

সুভদ্রা বোনের কথায় রাগ করে। বলে—তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না!

তবু নবাবের ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত। নবাব ফৌজের ভয়ে কারও চোখে ঘুম আসে না।

সরলা যে এত দামাল। সেও মাঝ মাঝে সুভদ্রাকে বলে—দিদি, যদি নবাবফৌজ সত্যিই আসে?

সুভদ্রা রাগ করে বলে—আসে, চলে যাবি ড্যাং ড্যাং করে। তারপর নবাবের দেওয়া সোনারূপার পোষাক পরে মেহগনি পালঙ্কে শুয়ে ঠ্যাং দোলাবি।

সরলা সত্যি ভয় পেয়েই এসব কথা বলে।

তারপর সুভদ্রার কথা শুনে সে খিল খিল করে হেসে ওঠে। হেসে সুভদ্রার পিঠে ছোট ছোট কিল মারে।

তুই একদম বাজে সুভদ্রা।

সুভদ্রারও ভয় হয়। ভয়ে সে এক এক সময়ে কেমন সিঁটিয়ে যায়।

তাদের গ্রামে কোনদিন নবাব ফৌজ ঢোকে নি, তবে পাশের গ্রামে ঢুকেছিল।

একদিন ভুল করে নিয়ে গেল এক বিয়েওলা মেয়েকে।

খবর হয়ত ঠিকই গিয়েছিল। মেয়েটির তখনও বিয়ে হয়নি।

কিন্তু রাতারাতি মেয়ের বাবা খবরটা পেয়ে গ্রামেরই এক ছেলের সংগে হাতে পায়ে ধরে বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর মেয়ে বাপের বাড়ীতে ছিল।

একদিন রাত্রিবেলা নবাব ফৌজ ধূলো উড়িয়ে গ্রামে ঢুকল।

গৃহস্থেরা যে যার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। সমস্ত গ্রাম নিঃসাড়ে পড়ে থাকল জনমানবহীন অবস্থায়।

সেদিন চাঁদনী রাত।

নবাব ফৌজ এসে থামল নির্দিষ্ট বাড়ীর সামনে।

তারপর মার মার কাট কাট।

মেয়ের বাবা মরবার আগেও চিৎকার করে বললেন—ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে। তোমরা তো বিয়েওলা মেয়েকে নাও না, তবে ওকে নিচ্ছ কেন?

ভদ্রলোকের দুটি ছেলেও প্রাণ দিল নবাব ফৌজের ধারাল অস্ত্রের সামনে।

তারপর মেয়েটাকে নিয়ে নবাব ফৌজ চলে গেল।

কিন্তু দুদিন পরে আবার লোকে দেখল, সেই মেয়েটাই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছে।

গ্রামের লোক তখন ছেঁকে ধরল তাকে।

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলল—নবাব তাকে বিয়েওলা দেখে তাড়িয়ে দিয়েছে। এক ফৌজী ঘোড়ায় তুলে এই গ্রামের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে গেছে '

গ্রামের লোক বলল—তা বাপু আর ফিরলে কেন ? মেয়েছেলে ঘরের বাইরে যখন হয়েছ তখন তোমার সব গেছে। এসব গল্প কথা কে আর বিশ্বাস করবে বলো।

তখন মেয়েটি যা-ও বা অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরেছিল, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, আছাড় খেয়ে সেই পথের ওপর পড়েই আছড়াতে লাগল।

তবু গ্রামের লোক আর তাকে জায়গা দিল না। বার করে দিল গ্রাম থেকে।

এই সব ভেবেই সুভদ্রার চোখে ঘুম আসে না।

রাঘব চৌধুরীর মনে আর এসব কথা নেই। তাঁর মনে এখন জমিদার হওয়ার স্বপ্ন।

সারাদিন ব্যবসার কাজে বাইরে বাইরে ঘোরেন।

তাঁত তাঁরও কটা ছিল কিন্তু সে তাঁতে সুতোর কাপড় হত সে কাপড় মোটা। হুগলী, চন্দননগরের বাজারে সে সব রপ্তানী হত।

তারপর রেশমী কাপড় বোনার জন্যে তাঁত পেলেন। সেই তাঁতে রেশম সুতো দিয়ে রেশমবস্ত্র তৈরী হয়। আর তার খদ্দের বড় বড় মহাজন।

রাঘববাবু সব সময়ে সেই তাঁত ঘরে থাকেন।

আর থাকেন নদীর ঘাটে।

মাল ওঠে নৌকায়। সে নৌকা চলে যায় বড় বড় শহরে।

এই সব করতেই সারাদিন চলে যায়।

যেদিন মুর্শিদাবাদে যাবার দিন সেদিন তিনি এসব করেন না। খুব ভোরে ওঠেন।

তাঁর নির্দিষ্ট ঘোড়াটি বারমহলে বাঁধা থাকে। সে প্রভুকে দেখে পা ঠোকে। ঘোড়াও বুঝে নিয়েছে তাকে এবার নবাব নগরে যেতে হবে।

উজীর সাহেবের কাছে যাবার দিন বুধ ও শনিবার।

রাতের শেষ তারাটি খসে পড়লে রাঘববাবু ঘোড়ায় চড়েন। তবু পৌছতে বেলা হয়ে যায়! উজীর সাহেবের কাছে তখন লোকের ভীড় জমে গেছে। অবশ্য তিনি কারও সঙ্গে একসাথে কথা বলেন না। আলাদা আলাদাভাবে। তার জন্যে লোক মোতায়েন থাকে। বাজারের কোন জায়গায় অপেক্ষা করলে সে ডেকে নিয়ে যায়।

হাজী সাহেবের সঙ্গে যাদের এই গোপন ব্যবসা আছে। কারও সঙ্গে কারও দেখা না হয়, পরিচয় না হয়, তার জন্যে এই ব্যবস্থা।

এসব সতর্কতা কেন রাঘববাবু জানেন না।

হাজীসাহেবই তো নবাবের সব। তিনি যা করবেন নবাব তাই মেনে নেবেন। হয়ত এসব ব্যাপারও তাঁর জানা আছে যাদের সরকারী কানুনের আওতায় আনা যায় না, তারা আলাদাভাবে সাহায্য পায়।

এই সাহায্যের বিনিময়ে যদি কখনও দরকার হয় সাহায্য করবে।

হাজী সাহেব প্রায়ই বলেন—মনে রাখবেন চৌধুরী সাহেব, আমার দরকার হলেই যেন সাহায্য পাই।

দরকারটা কি রাঘববাবু ভেবে পান না। শুধু বলেন—আপনার গোলাম আমি, দরকারটা ফরমাইস করবেন।

কিন্তু কি দরকার হাজীসাহেব বলেন না।

শুধু বলেন—ধীরে ধীরে। তারপর দাড়ির ফাঁকে অদ্ভুতভঙ্গি করে হাসেন।

নবাবের সর্বেসর্বা উজীরসাহেব যে স্বভাবের দিক দিয়ে এতটুকু ভাল লোক নয় রাঘববাবু জানেন।

অবশ্য কোন বাজে সংবাদ তাঁর বিরুদ্ধে শোনেন নি। শুধু চেহারা দেখেই অনুমান করেছিলেন।

কিন্তু একদিন জানতে পারেন, হাজী সাহেব সত্যিকারের একজন ধূর্ত প্রকৃতির লোক। ভেতরে ভেতরে তিনি কি এক ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন।

এতদিন জানতেন নবাব ফৌজ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে মেয়ে ধরে নিয়ে আসে নবাবের নির্দেশে। কিন্তু পরে শুনলেন নবাবের নির্দেশে এসব হয় না, হাজী সাহেবই নবাবের লোক নিযুক্ত করে ফুলের মতো সদ্যফোটা মেয়েগুলিকে গৃহস্থের স্নেহ-পাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন।

এসব লোকমুখে শোনা নয়, একদিন তিনি স্বচক্ষেই দেখলেন একটি ঘটনা। হাজী সাহেব সঙ্গে ছিলেন তখন।

হাজী সাহেব তাঁকে দেখেছেন কিনা জানেন না। তবে মনে হয় দেখেছেন। পাশ দিয়ে ঘোড়ায় করে চলে যাবার সময়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। খাপ থেকে তরো-য়াল তুলে মুণ্ড লক্ষ্য করে চালাতে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে চাঁদের আলো এসে রাঘববাবুর মুখের ওপর পড়ে। হাজীসাহেব হঠাৎ তরোয়াল খাপে পুরে ঘোড়ার পিঠে লাথি মেরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে যান।

সরাইখানায় দেখা হবার পরও কিছু বলেন না। রাঘববাবু আশা করেছিলেন হাজীসাহেব কিছু বলবেন।

সেই না বলতেই যেন শঙ্কাটা এসে মনের মধ্যে চেপে বসে।

অথচ উজীরসাহেবের রাতের অন্ধকার লোকে তাঁর সম্মানীয় পদের কি নমুনা সবই দেখা হয়ে গেছে।

এখন রাঘববাবু ভাবেন। সেদিন কেন তিনি এসব দেখলেন ?

ফিরছিলেন ব্যবসারই কাজে বহুদূর থেকে। ঘর্মাক্ত শরীর। ক্লান্তিতে চোখে মুখে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

হয়ত রাতে ফেরাও হত না। শুক্লপক্ষ তিথি জানতেন বলে ফিরছিলেন। তাছাড়া রাতে মাইলের পর মাইল অমেক চড়াই উতরাই বন জঙ্গলের কাঁটার বেষ্টনী। প্রিয় ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পার হওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল।

এমনি তিনি ঘোড়ায় করেই চলাফেরা করেন। আর তাঁর তেজীয়ান ঘোড়া

তাঁরই মতো ক্লান্তিহীন।

ভয় টয় তাঁর শরীরে খুব কমই আছে। ভুলে যান না তার পূর্বপুরুষ ড. কাত ছিলেন। সঙ্গে একটি ধারাল অস্ত্র থাকে কোমরে গোঁজা। আর থাকে আরও কিছু মারণাস্ত্র ঘোড়ার পেটের কাছে একটা কাপড়ের বন্ধনীতে পাকানো।

একবার মুখোমুখি এক নিশাচর দস্যুর হাতে পড়েছিলেন।

দস্যু ঠিক নয় কটা গরীব লোক চাষবাসের অবস্থা খারাপ দেখে গৃহস্থের সঞ্চয় ছিনিয়ে নেবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল।

সেদিনও রাঘববাবু ফিরছিলেন।

হঠাৎ তাদের মুখোমুখি পড়ে যান!

আর সঙ্গে সঙ্গে তারা অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু তারা জানত না যাকে আক্রমণ করেছে তিনি কমজোরী নয়।

তাদের দলে ছিল অনেকগুলি লোক।

রে রে করে এগিয়ে এল।

দূর থেকে লোকগুলিকে দেখতে পেয়েছিলেন রাঘববাবু। সঙ্গে সঙ্গে গতি মৃদু করে দিয়ে ঘোড়ার পেটের কাছ থেকে অস্ত্রগুলি তুলে নিলেন।

ওরা কাছে এগিয়ে এলেই তিনি গর্জন করে জিজ্ঞেস করলেন—কে তোরা?

আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর—তোর বাপ্।

রাঘব আর বিলম্ব করলেন না।

একটা বর্শা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন। লক্ষ্য অব্যর্থ। বাপ বলে একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল।

ওরাও বর্শা ছুঁড়লো। রাঘববাবু সরে দাঁড়ালেন। বর্শা ছুটে চলে যায় অন্যত্র।

রাঘববাবু এবার চিৎকার করে উঠলেন—আয় ব্যাটা, তোদের সব কটাকে আজ একাই যমালয়ে পাঠিয়ে দিই।

এই বলে তিনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে সেই দস্যু দলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

লাঠিতে রাঘবচৌধুরী ওস্তাদ মানুষ। গোবিন্দ ঢালীর কাছে বহু মেহনতে অনেক প্যাঁচ অভ্যাস করেছেন।

লাঠি ঘোরাতে শুরু করলে কোন অস্ত্রই লাঠির কাছে আসতে পারে না। সব অস্ত্র ঠিকরে পড়ে যায়।

তাই হল। দস্যুদলের সব অস্ত্র ঠিকরে ঠিক্‌রে পড়তে লাগল। তাই দেখে দস্যু-দল সেই বর্শাবিদ্ধ মুমূর্ষু লোকটিকে কাঁধে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

সেই সব কথাই চলতে চলতে ভাবেন।

রাতের দিকে চলাফেরা করলে এমনি বিপদ প্রায়ই আসে। তার জন্যে তিনি তৈরী থাকেন। তবে অন্ধকার পক্ষ হলে মুস্কিল হয়। কে কোত্থেকে অস্ত্র চালিয়ে দেবে বলা যায় না বলে একটু ভয় থাকে।

সেই জন্যে তিথিটা দেখে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন।

সেদিনও তিনি তিথি দেখে বেরিয়েছিলেন।

তাছাড়া ইদানীং আর একটা সাহস জেগেছে উজীরসাহেবের কিছু আশ্বাস তাঁর সঙ্গে আছে।

মাঝে মাঝে উজীরসাহেব বলেন—কই তকলিফ ?

না সাহেব।

কোন তকলিফ হলে বলবেন। নবাব ফৌজ আপনার খিদমতের জন্যে আছে।

চাঁদের আলো তখনও নৈসর্গের সবকিছু স্পষ্ট করে নি। মাঝে মাঝে আলো ফুটছিল, আবার চাঁদের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল।

রাঘবাবু একটা ঘনজঙ্গল পার হয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। কি একটা বড় দীঘি, তারপর একটা গ্রাম। রাতে সব গ্রামই সমান। নিঃশাড়ে পড়ে থাকে যেন মরা মানুষের মতো।

সেদিনও তেমনি আশা করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন দূরে একটি গ্রামের মধ্যে এক ঝলক আগুন।

মনে হয় যেন কোন গৃহস্থের বাড়ী আগুনে পুড়ছে।

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছিলেন, হঠাৎ চমকে উঠলেন ঝড়ের শব্দে। কিন্তু ও যে ঝড় নয় তাও বোঝেন।

অনেকগুলি ঘোড়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। আর তার সঙ্গে নারীকণ্ঠের ক্রন্দন। কে যেন জোরে জোরে কাঁদছে, আবার কেউ মুখ চেপে ধরছে, আতঙ্কে কান্নাটা চেপে গিয়ে উদ্ভট এক শব্দ হচ্ছে।

রাঘববাবু ভেবেছিলেন কোন ডাকাতের দল। শুধু আন্দাজ করছিলেন তারা দলে কজন আছে।

কিন্তু কাছাকাছি হতেই হঠাৎ চমকে উঠলেন।

নবাব ফৌজ !

আলোয় তাদের বিশেষ পোষাক প্রতিফলিত।

তখন ফৌজেরা ঘোড়া ছুটিয়ে কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। দূরে গ্রামের সেই গৃহস্থ বাড়ী আগুনে জ্বলছে।

রাঘববাবু সরে দাঁড়িয়ে এক গাছের পিছনে লুকোন।

ফৌজীদের একজনের ঘোড়ার পিঠে মেয়েটিকে মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে রেখেছে একজন ফৌজী।

মেয়েটির কাপড় লুটোচ্ছে নীচে। চুল ভেঙে পড়েছে পিঠে।

আর কিছু দেখতে পান না রাঘববাবু। ফৌজরা পাশ দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে চলে যায়।

হঠাৎ রাঘববাবু বেরিয়ে পড়েন। এই সময়ে আবার শব্দ, কে যেন ঘোড়ায় করে এগিয়ে আসে।

রাঘববাবু তাঁকে দেখে অসম্ভব রকম চমকে ওঠেন।

হাজী সাহেব!

মুখ দিয়ে তাঁর অস্ফুটকণ্ঠে বেরিয়ে যায়।

হাজীসাহেবও দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। খাপ থেকে ধারাল তরোয়াল জ্যোৎস্নার আলোয় বের করে ঝলকে দিয়ে চালাতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কি ভেবে তিনি আলখাল্লা উড়িয়ে চলে যান।

এই চাক্ষুস দেখা তো ছিলই। তারপরই আর একদিন। তবে সেটা অন্য ব্যাপার।

লোকটার সাহসও কম নয়। অবশ্য মরবার জন্যে সে মরীয়া হয়ে এসেছিল। ছুটছিল বাজারের পথ দিয়ে সোজা রাস্তাটা নবাব প্রাসাদের দিকে।

মুখে চিৎকার করছিল। দুনিয়া কি এখনও থমকে দাঁড়িয়ে আছে? জ্বলে পুড়ে খাক্ হযে যাচ্ছে না। এর নাম নবাবী! হায় হায় আমার সব গেল।

আর ঐ নবাবের আর এক দোসর জুটেছে হাজী আহম্মদ। নবাব কি বুঝতে পারছেন না বেশীদিন আর তিনি নবাবী গদিতে নেই।

লোকটি ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল আর পাগলের মতো ছুটছিল।

হঠাৎ ফৌজীরা তাকে ধরে ফেলল।

কিন্তু সেও প্রাণে বাঁচল না।

রাঘববাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখলেন।

কেউ কেউ চাপা ফিস ফিস করে বলল—শালা কুত্তাকা বাচ্চা নবাবের ছা।

রাঘববাবু চারিদিকে তাকিয়ে বক্তাকে খোঁজবার চেষ্টা করলেন কিন্তু বুঝতে পারলেন না কে বলল এ কথা?

শুধু বুঝতে পারেন—চাপা আক্রোশ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। শক্তি কম বলেই কেউ এগিয়ে আসে না।

আজকাল রাঘববাবু সেইজন্যে একটু অন্যমনস্ক।

আগে যে বড়লোক হবেন, জমিদার হবেন বলে লাফালাফি করেছিলেন, এখন আর করেন না।

একদিন শুধু হঠাৎ বাড়ী ফিরে গিয়ে বোন মহামায়াকে বললেন—মায়া, মেয়েদের একটু সাবধানে রেখো।

মহামায়া শুনে কেমন যেন আতঙ্কে বড বড় চোখ করে বলেন—কেন নবাব ফৌজ কি এ গ্রামের ওপরও হামলা শুরু করে দিয়েছে?

রাঘববাবু বোনের কথায় বিরক্ত হন। কি সব যা তা বলছ? নবাব ফৌজ কেন হামলা করবে? সাবধান হওয়া তো উচিত!

কিন্তু মহামায়া ধমক খেয়েও চুপ করেন না। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন—আমি তোমাকে অনেকদিন বলেছি দাদা, মেয়ে দুটোর একটা ব্যবস্থা কর।

রাঘববাবু সে কথায় জবাব দেন না।

তাঁরও যে ভাবনা হচ্ছে না তা নয়। মেয়ে দুটিকে পার করলেই বোধ হয় নিশ্চিন্ত হতেন।

নবাবের লোভ যেভাবে দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, তাতে কি হয় কিছু বলা যায় না। এ গ্রামের ওপর কখন কোন্‌দিন হামলা হয় তারও কিছু ঠিক নেই।

উজীর সাহেবের তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই কেবল গ্রামটার নাম করেন।

চরমারি, চরমারি। গ্রামটা ঠিক কোন্‌ জায়গায়?

তিনি যতবার গ্রামের নিশানা বলেন হাজী সাহেব একই কথা প্রায় দিন দেখা হলে জিজ্ঞেস করেন।

একদিন সাহস করে বলেছিলেন—হুজুরের যদি কোন দিন ফুরসৎ হয়?

হাজী সাহেবের ইঙ্গিত বোঝার ক্ষমতা অসাধারণ। হাঃ হাঃ করে হেসে বলেছিলেন—জানে কা কোশিষ? আচ্ছা একদিন না হয় চৌধুরী হাবেলীতে যাওয়া যাবে।

কিন্তু তার বেশী এগোন নি রাঘব চৌধুরী।

সত্যিই যদি একদিন যেতে চান তাহলে মুস্কিলের ব্যাপার। মেয়ে দুটিকে তখন কোথায় লুকোবেন?

আজকাল এইসব কথাই ভাবেন।

এগিয়েছেন অনেকদূর। কাজকারবার অনেকখানি এগিয়েছে, এখন বন্ধ করে দেবার কোন মানে হয় না। আর বন্ধ করে দিতে চাইলেও বোধ হয় হাজী সাহেব বন্ধ করতে দেবেন না।

এটা অনুমান ছিল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একদিন দেখা গেল তার অনুমানও ঠিক।

তিনি হাজী সাহেবের সামনে বসে কথাচ্ছলে কথাটা পাড়েন- ভাবছিলাম কি, ব্যবসা আর বাড়াবো না?

কিঁউ কিঁউ ক্যযা হুযা! কই তকলিফ! মেরে বোলিয়ে!

না মানে, শরীর আর দিচ্ছে না, তাছাড়া ব্যবসা বাড়াতে গেলেও টাকার দরকার।

রূপেয়া! আচ্ছা কিত্‌না রূপেয়া?

না, না টাকার আমার দরকার নেই। আপনার আশীর্বাদে আমি যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট।

তাড়াতাড়ি সে কথা সেখানেই চাপা দিয়ে দেন রাঘববাবু!

তাই ভাবেন—পিছু হটবার আর উপায় নেই। ধূর্ত উজীরের জালে আটক পড়ে গেছেন। এখন যদি উজীর সাহেব বলেন—আপনার সমস্ত সম্পত্তি কাল থেকে নবাব সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। তাতেও তিনি কিছু বলতে পারবেন না কেন? কিজন্যে!

এমনি একটা জায়গায় যেন তিনি এসে পড়েছেন বলে মনে করেন আর সেই কথা অহরহ ভাবেন। মাঝে মাঝে গোবিন্দ ঢালীকে বলেন—গোবিন্দ হুশিয়ার?

গোবিন্দ সচকিত হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—কোন ভয় নেই কর্তা, আমি জিন্দা থাকতে কেউ চৌধুরী বাড়ীর ভেতর ঢুকতে পারবে না।

কিছুকাল আরও চলে যায়।

মাঝে কিছুদিন উজীর সাহেব কোথায় যেন গিয়েছিলেন। রাঘব চৌধুরীকে যোগাযোগ রাখতে মানা করেছিলেন।

রাঘববাবুও অন্যান্য ব্যাপারে অনেক নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

তারপরে হঠাৎ একদিন একেবারে নবাবী ফৌজ এসে চৌধুরী বাড়ীতে হাজির হল।

একজন সংবাদবাহক।

রাঘববাবুকে সেলাম করে জানাল—উজীর সাহাব আপ্‌কো তুরন্ত জানে বোলা।

আজ!

নেহি, নেহি। দু'চার দিনের মধ্যে।

সংবাদবাহক ফৌজ চলে গেল।

রাঘববাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কি? কোনদিন নবাবী দূত এসে তাকে কোন এত্তেলা দেয় নি।

দু'চার দিনের জন্যেও অপেক্ষা করলেন না। পরদিনই ভোরবেলা যেমন যান তেমনি রওনা হলেন।



সরাইখানার সেই বিশেষ ঘরটিতে বসেছিলেন উজীর হাজী আহম্মদ। রোদ্দুর এসে পড়েছে ঘরের জানলা দিয়ে।

তিনি তাকিয়েছিলেন সেই জানালা বরাবর দূরে নবাবী প্রাসাদের দিকে। নবাবী প্রাসাদের গম্বুজের ওপর নবাবের গর্বের নিশান উড়ছে হাওয়ায়!

স্বচ্ছ নীলাভ মেঘ।

দু'চারটে চিল বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে গম্বুজের ওপর দিয়ে।

আরও দূরে শ্যামল বনানী।

দীর্ঘ গাছের সারির মাথার ওপর রোদ্দুরের আলো আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে।

হাজী আহম্মদ এই সবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন যেন নিশ্বাস চাপেন। ধৈর্যের বাঁধ যে আর থাকে না। আর কত খিদমত খাটবেন।

তাছাড়া অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

নবাবের দুটি ছেলেই মুখিয়ে আছে।

তবে মহম্মদ তকীকে ঘায়েল করতে আর বেশী দেরী নেই।

এদিকে বেগম হারেমের মধ্যে জিনৎ।

বেগম জিনৎ কোন উপপত্নীকেই সহ্য করতে পারেন না। আর মহম্মদ তকীর মাকে তো নয়ই।

দিনরাত হারেমের মধ্যে খিটিমিটি লেগেই আছে।

' নবাব এখন শাদী করা বেগমকেই পছন্দ করেন বেশী। অনেকদিন সঙ্গ না পাওয়ার ফলই বোধ হয় এই।

অথচ মহম্মদ তকীর মা দেখতে আরও সুন্দরী আরও লীলাময়ী। তাকে ছেড়ে জিনৎ বেগমকে নিয়ে থাকা যেন যায় না। তবু নবাব জিনতের কথা শোনেনই বেশী।

তকীর মা আজিমুন্নেসার সেইজন্যে রাগ।

নবাব একদিনও তার ঘরে আসেন না।

আসবার কথা বললেই বলেন—বিবি বড় কাজ, একদম সময় পাই না।

তারপর কোনদিন বলেন—আচ্ছা আজ ঠিক আসব।

আজিমুন্নেসা সারাদিন ধরে গোলাপ জলে শরীর ধুয়ে, নানা রকমের আতর মেখে, তারপর চুলে বিশেষ কায়দায় বিনুনী করে কত রকম করে বয়সটা কমায়।

তারপর নবাবের আসার অপেক্ষায় পর্দার বাইরে বাঁদীকে দাঁড করিয়ে রাখে। নিজে পালঙ্কে বসে দর্পনের দিকে তাকিয়ে সুরত দেখতে থাকে।

কিন্তু রাত গভীরে গিয়ে পৌঁছে গেলেও নবাব আসেন না।

এরকম একদিন হয় নি, বহুবার হয়েছে!

আজিমুন্নেসা চোখের জল রোধ করতে পারে না।

কোনদিন প্রচণ্ড রাগ হয়। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে জিনৎ বেগমের দরজায় সামনে দাঁড়ায়।

ঘরের ভেতর তখন শুনতে পায় দুটি নরনারীর প্রলাপ।

একজন নবাব, আর একজন জিনৎ বেগম।

আজিমুন্নেসার ইচ্ছে হয় ছুটে ঘরে ঢুকে দুজনের সমস্ত স্বপ্ন ছিঁড়ে দেয়।

আজিমুন্নেসা হাজীর শরণাপন্ন হন।

উজীরসাহেব আপনি নবাবের সব। নবাবসাহেব আপনার সব কথা শোনেন। কোন কোশিষ কি আপনি আমার জন্যে করতে পারেন না?

ক্যায়া কোশিশ ফরমাইয়ে বেগমসাহেবা!

হাজী যেন কিছুই জানেন না এমনি মুখের ভঙ্গি করেন।

আজিমুন্নেসার চোখ দুটির কোণায় জল চিক চিক করে। খানিকটা লজ্জাও এসে রক্তিম করে সুন্দর মুখটি।

তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে—দু একদিন নবাব তো আমার ঘরেও আসতে পারেন।

তারপর জ্বলে ওঠে তার চোখ দুটি। ঐ জিনৎ এসেই আমার সব গেল। আমি হয়ে গেলাম পরিত্যক্ত।

নারী আর কি বলতে পারে?

তাছাড়া হাজী সাহেব আর কিছু ঘাঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে চান না। পা বড় ধীরে ধীরে ফেলতে হয় বহু সাবধানে।

নবাব হারেমের মধ্যে অনেকের অনেক রকম অভিযোগ। আর তারা উজীর-সাহেবের কাছেই এসে পেশ করে।

হাজী প্রতিটি অভিযোগ সুন্দরভাবে সমাধা করেন।

কিন্তু আজিমুন্নেসার ব্যাপার!

না, সেটা সহজে করেন না। কারণ এর বিপরীতে তিনি জিনৎকেই অন্য মন্ত্রণা দিয়ে চলেছেন।

নবাবকে যত বেগমসাহেবা কাছে টানবেন, দেখবেন সমস্ত গলতির আসান হয়ে যাবে। হাজী সাহেব বলেন জিনৎকে এই কথা।

জিনৎ সেই উপদেশ মনে রেখেই স্বামীকে বার বার কাছে আহ্বান করেন।

আর নবাবের হয় মুস্কিল।

ওদিকে রঙমহলের মধ্যে নাচ, খোসবাই সরাবের পেয়ালা, আবার অন্যদিকে নিত্য নতুন তাজা তাজা খুবসুরত জোয়ানী মেয়ের দল।

নবাব বলেন—বেগম, আমি বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাহেনসা, আমার কি শাদী করা বেগমের কাছে দিনরাত বসে থাকা শোভা পায়, না থাকা উচিৎ। তাছাড়া দেখছ না, প্রাসাদের ওপাশে রঙমহল আমাকে কেমন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, মাঝে মাঝে আমাকে ছেড়ে দাও। আমার ইজ্জত, আমার সম্মান, আমার মর্যাদাকে বজায় রাখি।

জিনৎ অবুঝের মতো তবু নবাবকে আষ্টে পৃষ্টে ধরে রাখেন। বলেন—না, তুমি অন্য কোন আওরতের কাছে যাবে তা আমি সহ্য করব না। কেন আমার কাছে থেকে তুমি সুখ পাও না?

এই চলে দুজনের মধ্যে।

হাজী অন্তরালে দাঁড়িয়ে হাসেন।

আবার অন্যদিকে সরফরাজকেও তাতিয়ে তোলেন।

উড়িষ্যার এখন সুবাদার মহম্মদ তকী। মহম্মদ তকী উড়িষ্যাতেই থাকেন। শুধু মাইনে নিতে মুর্শিদাবাদে আসেন।

সরফও ঢাকার নবাব কিন্তু সরফ ঢাকায় যায় না। সে মুর্শিদাবাদেই অন্যত্র থাকে, মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে বাপ মার সঙ্গে।

কিন্তু সরফের রাগ তকীর ওপর।

তকী চায় পরবর্তী সিংহাসন।

হাজী সরফকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বোঝান—শাহজাদা তকী যদি কখনও সিংহাসন কায়েম করে তাকে তোমার মেনে নেওয়া উচিত। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া ভাল নয়। তাছাড়া তকী শক্তিতে তোমার চেয়ে অনেক জোরদার।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়।

সরফ চোখে আগুন জ্বেলে বলে—আপনি বলছেন কি উজীর সাহেব? তকী পাবে সিংহাসন? দাদু মুর্শিদকুলী কি বাবার উপপত্নীর ছেলে তকীকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন?

তারপর সে কোমরে ঝোলান খাপ থেকে তরোয়াল বের করে বলে- হরগিস

নেহী। আমার সিংহাসন আমার উদ্ধার করবার শক্তি আছে। তকীর এ আস্ফালন আমি একদিন চিরতরে বন্ধ করে দেব।

এই সব কথাই ভাবছিলেন হাজী সরাইখানার জানলার দিকে চেয়ে। সরাইখানার একতলা থেকে হল্লা আসছে বেশ জোরে।

মাঝে মাঝে তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন।

এই সময়ে তাঁর বেতনভোগী লোক এসে জানায়– হুজুর রাঘব চৌধুরী!

রাঘব চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে আগের মতো আনুগত্যের সেলাম জানান।

হাজীসাহেব তাকিয়ে দেখেন দাড়ির জঙ্গল থেকে তাঁর দুই কুতকুতে চোখে। তারপর ধীরে ধীরে টেনে টেনে বলেন—তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায় তো চৌধুরীসাব?

রাঘব চৌধুরী তখনও দাঁড়িয়ে।

হাজীসাহেব বলেন না তাঁকে বসতে। কোনদিনও বলেন না। সৌজন্য দেখানোর ভদ্রতা তাঁর নেই। তাছাড়া তিনি নবাবের উজীর। মানী লোক। হাজার হাজার সেলামই তাঁর প্রতিদিন মেলে।

এক একদিন রাঘব চৌধুরী নিজেই বসে পড়েন। কোন কোন দিন সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিলে বসেন না।

কিন্তু এদিন রাঘব চৌধুরীকে হাজীসাহেব হঠাৎ বসতে বলেন।

বইঠে বইঠে, খাড়া হোনেকা ক্যয়া হ্যায়! এতো আপনাদেরই সব।

রাঘববাবু তখন ভাবতে শুরু করেছেন আকাশ পাতাল।

এতো আদর যত্ন কিসের জন্যে! এরকম তো কখনও দেখা যায় না। সাহায্য অবশ্য হাজীসাহেব অনেক করেছেন কিন্তু সে সাহায্য কেমন যেন তাচ্ছিল্যের মতো ছুঁড়ে দেওয়া।

হাজীসাহেব কিন্তু রাঘববাবুকে আর ভাবতে দেন না। সেই টেনে টেনেই বলেন—চৌধুরীসাব, ব্যবসা আপনার কেমন চলছে?

মন্দ নয়

লেকিন মুনাফা?

রাঘববাবু নড়ে চড়ে বসে বলেন—আপনার অনুগ্রহে আমার সবই ভালর দিকে।

আমার অনুগ্রহ? হাজীসাহেব দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠেন। তারপর টেনে টেনে বলেন—চৌধুরীসাব, আমি কাউকে দোয়া করি না। শুধু আপনারা আমার বন্ধু হবেন। এই সুদূর বাংলাদেশে এসে একখানা রুটির জন্যে যাতে বেঘোরে প্রাণটা না যায় সেইজন্যে আপনাদের একটু ভরসা চাই। আর তারই জন্যে এই দোস্তী। তা আপনারা কি আমাকে দোস্ত বলে মনে করেন না?

রাঘববাবুকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে হয়—এ কি বলছেন উজীরসাহেব?

সঙ্গে সঙ্গে হাজীসাহেব সংশোধন করে দিয়ে বলেন—উজীরসাহেব না চৌধুরীসাব, আসাদুল্লা খাঁ বলবেন। দেয়ালেরও যে কান আছে এ কথা কি আপনি জানেন না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ খাঁ সাহেব, বন্ধু বলেই তো আপনাকে আমি মনে করি।

সঙ্গে সঙ্গে হাজীসাহেবের মুখের ওপর তির্যক হাসি ঝলসেওঠে।

তারপর বলেন—বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু। এই বলে তিনি আবার চুপ করেন।

ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করে।

এই সময়ে বন্ধ দরজায় ঠুক্‌ঠুক্ আওয়াজ হয়।

হাজী আহম্মদ বিরক্ত হয়ে গর্জন করে বলেন—কৌন হ্যায়!

বেতনভোগী লোক ঢুকে বলে—হুজুর, প্রতাপ রায়।

তাঁকে অপেক্ষা করতে বলো।

বেতনভোগী লোক চলে যায় দরওয়াজা বন্ধ করে।

হাজী আহম্মদ চোখ বুজিয়ে অনেকক্ষণ আবার কথা বলেন না। তারপর চোখ খুলে বলেন—তাহলে বলছেন আপনাদের আমি দোস্ত।

রাঘববাবু সম্মতিসূচক চাউনি প্রকাশ করেন।

তাহলে আমি যা বলব নিশ্চয় কোন গুণাহ মনে করবেন না। অবশ্য গুণাহর মতো কোন কথাই বলব না। শুধু আপনাদের সেবা করব। আপনারা বাংলাদেশের লোক। বা ালী আপনারা। আমরা পরদেশী, দয়া করে নবাব জায়গা দিয়েছিলেন তাই আমরা বেঁচে আছি। সেই বাঁচার জন্যেই নবাবের ভাল করার চেষ্টা করি। নবাব সুখে থাকলে আরামে থাকলে বান্দার সোয়াস্তি।

এই বলে হাজীসাহেব আবার চুপ করেন।

রাঘব চৌধুরী ভেতরে ভেতরে যেন বরফ হয়ে যান।

এত কথা কোনদিনও বলেন না হাজীসাহেব। এতো ভূমিকাও এ কিসের জন্যে?

তার জন্যেও বিলম্ব করতে হয় না?

হাজী সাহেব আবার চোখ দুটি ছোট করেন। চোখে এক ধরনের বিদ্রূপের ঝিলিক খেলা করে।

চৌধুরীসাব, আপ নও তো নবাবের ভাল চান?

হ্যাঁ তা চাই বৈকী খাঁ সাহেব।

তাহলে নবাবের সুখের জন্যে কিছু করুন।

রাঘববাবু মনে মনে কেঁপে ওঠে· কিন্তু মুখে কিছু বলেন না।

হাজী সাহেব আবার বলেন—আপনি কি আপনার দৌলত বাড়াতে চান না?

তা কে না চায় খাঁ সাহেব?

তাহলে আসুন আমরা নবাবের জন্যে কিছু করি। নবাবও কিছু সুখ পাবেন, আমরাও কিছু সুবিধা পাব।

কি করতে হবে বলুন? আমি রাজী।

আর তখনই হাজী আহম্মদ এমন করে কথাটি পেশ করেন যে রাঘববাবুকে চমকাতে হয়।

এক্ আচ্ছা খুবসুরত লড়কী। আমি জানি আপনি তা দিতে পারেন।

রাঘববাবু আর কথা বলতে পারেন না। অনুমান যে অনেকদিন ধরেই মনের মধ্যে চমকাচ্ছে তিনি জানেন।

যারা হাজী আহম্মদের কাছে সাহায্য নিচ্ছেন তারাও যে কেউ খুশি নয় তাও জানেন।

একে তো কারুর সঙ্গে মেশবার বা কথা বলবার উপায় নেই।

তবু পরস্পরের সঙ্গে কি একেবারে দেখা হয় না?

কালী হাজরার সঙ্গে রাঘববাবুর আগেই আলাপ ছিল।

সেদিন কালী হাজরার নৌকা যাচ্ছিল। কালী হাজরা নৌকায় বসে।

রাঘববাবুও নিজের নৌকায় বসেছিলেন।

এঁর আগে কালী হাজরার সঙ্গে রাঘববাবুর চকবাজারেই দেখা হয়েছে।

রাঘববাবু এগিয়ে গেছেন।

কিন্তু কালী হাজরা ভাল করে কথা বলেনি, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছে—আপনি তো ঐ সাহেবের সঙ্গে ব্যবসা করেন? তাহলে দয়া করে আর কোনদিন কথা বলবেন না।

সেই কথা ভেবেই রাঘববাবু নৌকা দেখেও মুখ ঘুরিয়ে নেন।

কিন্তু কালী হাজরা হঠাৎ নৌকা থামিয়ে দিয়ে চীৎকার করে বলে—ও চৌধুরী মশাই, কেমন আছেন?

আছি ভালই। আপনি?

আমি?

কালী হাজরা এমন করে হাসে যে সেই হাসিটি আজও মনে আছে।

অথচ এই মানুষটি কোনদিনও এমন ছিল না।

মাঝে মাঝে ব্যবসার সুবাদে পাট কিনতে আসত চরমারিতে।

যতক্ষণ থাকত সবাইকে হাসিয়ে পরিবেশ গুলজার করে রাখত।

হাজী সাহেব তখন একদৃষ্টে রাঘব চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আছেন। আর রাঘববাবু বদ্ধঘরের মধ্যে কাঁপছেন।

হাজী সাহেব আবার বলেন—শোচ্‌নেকা ক্যয়া হ্যায় চৌধুরীসাব। এক্ সিরেফ জোয়ানী লডকী। লডকী তো এই বাংলা মুলুকে কম নেই!

কিন্তু আমি কোথায় পাব সাহেব?

যেন রসিকতার খোরাক পান হাজী আহম্মদ চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে হাসেন, তারপর বলেন—ঝুট্ বাত কেন বলছেন চৌধুরীসাব। আমার চর ঠিক খবরই নিয়ে এসেছে। আপনার দুটি আচ্ছা লেডকী আছে। এক আপনকা ঔর বহিনকা।

রাঘব চৌধুরীর মাথা ঘুরতে থাকে।

তাঁর ইচ্ছে হয় সেই মুহূর্তে ঐ লোকটার বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দিতে, কিম্বা জিবটা টেনে বের করতে।

কিন্তু কিছুই করতে পারেন না বসে বসে শুধু ঘামেন।

আর হাজী আহম্মদ মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করে বলেন—বহুৎ পরেশান! তারপর

সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—আপনকা বেটি, কোন অসৎ কাজের জন্যে দিতে হলে মনে দুখ্‌ই লাগে। তা অসৎ কাজ ভাবছেন কেন? শাদী তো একদিন দিতেনই। নবাবের সঙ্গে দিচ্ছেন ভাবুন। হজরত বা'শাহ আপনার জামাই হবে এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? হাজী হাসেন, তারপর বলেন—অবশ্য নবাব বিনিময়ে শ্বশুরকে রাজা করে দেবে। আপনার তো বাসনা জমিদার হওয়া। তাও আপনি হয়ে যাবেন। শুধু সামান্য মনের হের ফের। আর আমি আপনাদের সেবা করার জন্যেই আছি।

রাঘববাবু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন খাঁ সাহেব।

আবার ভাববেন? আচ্ছা ভাবুন। তবে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ফয়শালা করবেন। কারণ আমি কোন কাজ ফেলে রাখা পছন্দ করি না।

রাঘববাবু যেন মদ খেয়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে যান।

তারপর কদিন চলে গেছে।

রাঘব চৌধুরী কোন ফয়শালা করতে পাবেন নি।

ফয়শালা কি কববেন? মেয়ে দুটিকে কি দিয়ে আসবেন।

কাকেও বলেন না নিজের মানসিক অবস্থা।

শুধু সবাই দেখতে পায় চৌধুরী মশাই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্দরমহলেই দিনরাত আছেন।

কেউ কেউ মুচকি হেসে বলে চৌধুরী মশাইয়েব নতুন করে বোধ হয় প্রেম জেগেছে।

নির্মলাও দেখেন স্বামীকে। বুঝতে পারেন না ব্যাপার কি? যে স্বামী দিনের বেলা কখনও অন্দরে আসতেন না।

নির্মলার মনে পড়ে প্রথম বিবাহিত জীবনের কাহিনী।

সবে বিয়ে হয়ে এ বাড়ীতে ঢুকেছেন।

বাড়ী ভর্তি লোক। সব সময়ে একটা সতর্ক প্রহরা। মেয়েরা অন্দরমহলের জীব; অন্দরেই তাদের গতিবিধি। বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের একেবারে নেই।

কিন্তু নির্মলার মন যেন কি ভেবে অস্থির হত।

তাছাড়া মাথায় একগলা ঘোমটা দিয়ে থাকতে হত।

কেউ বড় একটা তাঁর সঙ্গে কথা বলে না।

বৌয়ের উচ্চখাদে কথা বলারও কোন রেওয়াজ ছিল না।

তাই দমবন্ধ অবস্থা।

অনেক রাত্রে যখন স্বামী ঘরে আসতেন নির্মলা কেঁদে ফেলতেন।

তুমি একবারও দিনের বেলা আসতে পার না ?

নির্মলা জানতেন, এ বাড়ীর রীতিই দিনের বেলা পুরুষমানুষেরা অন্দরে আসবে না।

তবু না বলে পারতেন না। মনের কাছে কি কোন রীতি চলে ?

রাঘববাবুরও তখন তরুণ মন। নব বিবাহিতা বধূ। নতুন পরিচয়। তাঁরও ইচ্ছা করত দিনের বেলা বাড়ীর ভেতরে আসতে।

একবার দিনের বেলা আসতে গিয়ে যে গোলমালে পড়েছিলেন তারপর থেকে আর কোনদিনও আসেন নি।

অন্দরমহলের পিছনে একটা দরজা ছিল, সে দরজা দিয়ে মহিলা জাতীয় পরিচারিকারা আসা যাওয়া করত। গয়লানী আসত, মেথরানী আসত, মেয়েদের পায়ে আলতা পরানোর জন্যে নাপতানী আসত।

একদিন রাঘববাবু নির্মলাকে বললেন—আমি ঐ পথ দিয়েই আসব, তুমি শুধু একটু সতর্ক থেকো।

সেদিন দুপুরে। চৌধুরী বাড়ী নিস্তব্ধ। রাঘববাবুর মা দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। অন্যান্য মহিলারাও যে যার ঘরে।

নির্মলা স্বামীর পদশব্দ শোনার অপেক্ষায় অধীরা। মনেও খানিকটা ভয় মেশানো লজ্জা। অথচ ভাল লাগছে।

রাঘববাবু পা টিপে টিপে এলেন চোরের মতো। তারপর ঘরের মধ্যে নির্মলার সঙ্গে অনেকক্ষণ রইলেন।

দুজনেই ভুলেছিলেন নিষিদ্ধ কোন কাজ করছেন। দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে পড়ল।

দরজা বন্ধই তাঁরা করেছিলেন।

হঠাৎ সেই দরজায় করাঘাত হল। বৌমা, বৌমা ওঠো। দুপুরবেলা ছেলেমানুষের অতো ঘুমানো উচিত নয়।

ঘরের মধ্যে তখন দুজনেই আঁতকে উঠেছেন।

নির্মলা তাঁর শাশুড়ীর গলা চিনতে পারেন।

কিন্তু রাঘববাবু ভয়ে ঘরের মধ্যে ঘেমে ওঠেন। এখন উপায় ?

রাঘববাবুর মা নিরুপমা আবার দরজায় ধাক্কা দেন। কি হল বৌমা ?

নির্মলাকেও উত্তর দিতে হয়। যাই মা।

রাঘববাবু তাঁকে কিছুতে দরজা খুলতে দেন না। চাপাস্বরে গর্জন করে বলেন—খবরদার দরজা খুলো না।

কিন্তু নির্মলা শাশুড়ীর ডাককে উপেক্ষা করতে পারেন না। দরজা খুলে বেরিয়ে যান।

রাঘববাবু কি করবেন ভেবে না পেয়ে খোলা দরজা দিয়েই ছুট্ দেন।

তারপর ঘটনার মোড় ঘুরে যায়।

নিরুপমা দেখতে পান নি ছেলেকে, তবে একজন পুরুষমানুষকে বৌয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন।

আর সেই দেখাই হল কাল।

নিরুপমা ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠিন-দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে চাইলেন।

বাইরে থেকে কর্তাব্যক্তিরা ভেতরে এলেন।

নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করা হল—কে ও? না বললে ব্যভিচারিণীর শাস্তি চরম হবে।

নির্মলা কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে চোখের জল ফেললেন।

অনেক নির্যাতন, অনেক কটুকথা তাঁকে হজম করতে হল।

রাঘব চৌধুরীকেও ডাকা হল।

তবে তাঁকে সহজে পাওয়া গেল না।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাড়ীতে একটা কিছু হচ্ছে। কিন্তু সে ঘটনার মোড় এমন করে যে ঘুরে যাবে তা জানতেন না।

তখন নির্মলাকে তাঁর বাপের বাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

রাঘববাবু আসতে তাই রাঘববাবুর বাবা রাজবল্লভ চৌধুরী বললেন—মেয়েছেলের গায়ে হাত তোলা পৌরুষের ধর্ম নয় তাই ঐ কুলটার গায়ে হাত তুললাম না। তুমি এখুনি ঐ ব্যভিচারিণীকে চুলের মুঠি ধরে ওর বাপের বাড়ী দিয়ে এস।

রাঘববাবু শুনে তখন অবাক। কি ব্যাপার হয়েছে? নির্মলার দিকেও তাকালেন রাঘববাবু। নির্মলা মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল। মাথায় আর ঘোমটা নেই। একমাথা চুল সারা পিঠ ঢেকে আছে। সুন্দর গাল দুটি বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে চলেছে।

রাঘববাবু কি করে আসল কথাটা বলবেন ভেবে পেলেন না। অথচ না বললেও উপায় নেই।

তবু বাবার সামনে কিছু বলা যেন কেমন ভয়ের মতো। একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললেন—বাবা, আমিই এসেছিলাম দুপুরবেলা।

তুমি? মিথ্যে কথা! কলঙ্কিনী মেয়েকে বাঁচাতে চেও না। তোমার মা নিজের চোখে দেখেছেন।

নিরুপমা বললেন—সে কেমন করে হয়?

রাঘববাবুর তখন মনে পড়ে গেল দুপুরবেলা ছড়িটা ঘরেই রেখে গিয়েছিলেন। সেই ছড়িটাই ছুটে গিয়ে ঘর থেকে এনে দেখালেন—প্রমাণ এই ছড়িটা। এটা যে রোজ আমি সকালবেলা নিয়ে চলে যাই সকলে জানে।

তখন রাজবল্লভ চৌধুরী বললেন—কিন্তু তুমিই বা কেন দুপুরবেলা এসেছিলে? জানো না অন্দর মহলে দিনের বেলা ঢোকবার কারুর হুকুম নেই।

ঘটনার সমাপ্তি সেখানেই ঘটল।

নিরুপমা পুত্রবধূকে কাছে ডেকে নিয়ে তাকে আদর করতে লাগলেন। মুখ টিপে হেসে স্বামীকে বললেন—তুমি যাও, এ নিয়ে আর এদের কিছু বলো না।

নির্মলাকে বললেন—পোড়ারমুখী, কথাটা আমাকে বললেই তো পারতিস্।

আজ সেই সব কথাই নির্মলার মনে পড়ে।

তারপর থেকে রাঘববাবু আর কোনদিনও দিনের বেলা অন্দর মহলে আসেন নি। সেই রীতি আজও চলে আসছে। এমন কি দুটো ছেলেও অন্দরমহলে সহজে ঢোকে না।

কারণ ওরাও যে পুরুষ মানুষ।

নির্মলা তাই দেখেন। হঠাৎ স্বামী একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কেমন যেন পরিশ্রান্তের মতো মুখের চেহারা করে রাত্রে যে ঘরে শোন সেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

মহামায়া চাইলেন ভ্রাতৃবধূর দিকে।

কিন্তু মহামায়াই এগিয়ে গেলেন দাদার দিকে।

দাদা, তোমার কি শরীর খারাপ?

রাঘববাবু বিরক্ত হলেন বোনের কথায় কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

রাঘববাবু সেই যে অন্দর মহলে জায়গা নিলেন সহজে বেরোলেন না।

ব্যবসার বিষয় নিয়ে জানতে এল লোক, তিনি তাদের সঙ্গে কথা বললেন না।

রাঘববাবু দিনরাত ঘরের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকেন। আর ভাবনা। কেন তিনি মুর্শিদাবাদে গেলেন? কেন তিনি ভাগ্য ফেরাতে চাইলেন?

বাড়ীর ভেতর তাকিয়ে দেখেন, কত অল্পকালের মধ্যে সব কিছু করেছেন। এরকম বোধ হয় তাঁর সাত পুরুষও পারেন নি।

রাঘববাবুর এই দিনরাত বাড়ীর মধ্যে থাকার জন্যে একজনের খুব অসুবিধে হয়েছিল। সে সরলা!

সুভদ্রারও হয়েছিল, তবে অতো না।

সুভদ্রা সব সময়েই মৃদুস্বরে কথা বলে। কাছাকাছি না থাকলে শোনা যায় না। তবে তারও অসুবিধে হয়েছিল।

স্বাধীনভাবে সে চলাফেরা করত। সেই চলাফেরায় কেমন যেন এক আড়ষ্টভাব আসে।

সব সময়ে মনে পড়ে বাবা ঘরে আছেন।

পুরুষমানুষ দিনের বেলা অন্দরে না ঢোকার ব্যাপারটা যেন বাবা থাকাকালীন বুঝতে পারে।

মেয়েদের কাছে মেয়েদের কোন লজ্জা নেই।

মেয়েদের সামনে মেয়েরা সহজেই চলাফেরা করতে পারে।

এই সব ধারণা হয় সুভদ্রার।

কিন্তু সরলার অবস্থা অন্য।

সরলা হাসতে পারে না। জোরে কথা বলতে পারে না।

জোরে হাসি এলে মুখে হাত চাপা দেয়!

তাড়াতাড়ি সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে বলে—দিদি, মামাবাবু কি শুনতে পেয়েছেন?

সুভদ্রা কপট ভঙ্গি করে বলে—কানে তুলো দিয়ে না থাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন।

এই দিদি, মামাবাবু কেন দিনরাত বাড়ীর মধ্যে আছেন রে? কই শরীর তো খারাপ দেখি না। খাচ্ছেন দাচ্ছেন আর চোখ বুজিয়ে পড়ে আছেন।

সরলা যতই চেষ্টা করুক নিজেকে সভ্য ভব্য করে রাখবার, ততই সে পারে না। মাঝে মাঝে দম দেওয়া পুতুলের মতো হাসি ছিটকে বেরিয়ে পড়ে।

সেই হাসি শুনেই একদিন ডাকলেন রাঘববাবু সরলাকে।

সরলা গুটি গুটি এসে মামাবাবুর সামনে দাঁড়াল।

রাঘববাবু তাকিয়ে রইলেন বোনঝির দিকে।

রোগা চেহারা কিন্তু পুষ্ট। যৌবনের জৌলুস যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে শরীর থেকে।

মমতায় তাঁর চোখ দুটি বুজে এল। অস্ফুটস্বরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কখনও নয় বোনঝিও নয়, নিজের মেয়েও নয়। যদি দরকার হয়, তিনি লড়বেন নবাব ফৌজের সঙ্গে। চৌধুরী বাড়ীতে যদি একদিন আগুন জ্বলে তাও জ্বালাবেন। পুড়ে ছারখার হয়ে গেলে সবাই মরবেন। তবু সবাই যাবেন একসঙ্গে।

সরলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মামাবাবুর ভাবান্তর দেখে। কিন্তু মামাবাবু কিছু বলেন না বলে সে উসখুস করে।

রাঘববাবু সেইটা বুঝতে পেরে হঠাৎ সহজ হয়ে যান।

কখনও সহজে হাসেন না। মৃদু হেসে যথাসম্ভব কণ্ঠ সহজ করে বলেন—আজকাল তোকে হাসতে দেখি না কেন রে সরু? হাসবি, খেলবি।

সীতা প্রায়ই আসত বিকেলে।

রাঘববাবু ভেতর বাড়ীতে থাকার জন্যে আসা বন্ধ করেছিল।

মাঝে সীতাকে নিয়েও গ্রামের মধ্যে একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

এরকম যুবতী ডাগর মেয়ে গ্রামের মধ্যে খুব একটা ছিল না।

ছিল দু একটা গোপনে। তবে বাড়ীর বার হত না। যেমন সুধন্যবাবুর ভাইঝি কনক, পরিমল মুখুজ্যের নাতনি ঝর্ণা।

তাদের জন্যে পাত্র দেখা হচ্ছে, পেলেই দিয়ে দেওয়া হবে।

ঘটকও গ্রামে গ্রামে ঘুরছে।

আবার সেই ঘটকও অনেক সময়ে নবাব ফৌজকে সংবাদটি পরিবেশন করে মোহর কটি ট্যাঁকে পুরে চলে যায়।

সেইজন্যে ঘটক দিয়ে পাত্র বের করাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সীতা পর্দানশীনা নয়।

তাকে গ্রামে, পুকুর ঘাটে সর্বত্রই ঘুরতে হয়। যেতে হয় চালের জন্যে বিধু চাষীর কাছে। মাছ কিনতে হয় বাড়ীর সামনে জেলেনীকে ধরে।

গ্রামের ছেলে বুড়োরা সীতাকে দেখত। মাঝে মাঝে চোখের দৃষ্টি অন্যরকম করে কিছু মন্তব্য করত।

সীতার কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাপের দেওয়া পুজোয় পাওয়া লালপেড়ে কাপড় পরণে। সেই কাপড়ে দেহের সবকিছু ঢাকা পড়ে না।

স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য যেন ফুল, ফল, আকাশের রঙকেও ছাপিয়ে যায়।

গ্রামের কেউ কেউ লোলুপ চোখে তাকিয়ে দেখতে দেখতে জিবের জল টানে। কেউ কেউ মন্তব্য করে—এতো মেয়েকে নেয় নবাব ফৌজ, একে কি চোখে দেখতে পায় না! না পায় না পাক্, একদিন গিয়ে খবর দিয়ে আসব। নিয়ে গেলে রাত্রে চোখে ভাল ঘুম আসবে।

এই সময়েই সীতাকে একজন দেখে।

লোকটি কোন্ গ্রামের কেউ জানে না।

একদিন এ পথ দিয়ে ফিরছিল।

সীতাও তাকিয়েছিল তার দিকে। চোখে চোখে মিল হয়। মিলে মিলে যেন অন্তরে গিয়ে ধাক্কা দেয়।

তারপর সেই লোকটাই আসতে লাগল। একদিন সাহস করে সে রাখাল ভট্‌চার্যের সঙ্গে আলাপ করল।

সরল মানুষ রাখাল ভট্‌চার্য। লোকটিকে নিয়ে বাড়ী এলেন। লোকটি ঘন ঘন আসতে লাগল বাড়ীতে। রাখাল ভট্‌চার্য না থাকলেও সে সীতার সঙ্গে কথা বলে।

সীতারও মনে কেমন যেন সুর জমে।

লোকটি এলে সীতা ভীষণ লজ্জা পায়। মুখখানি তার গোলাপ পাপড়ির মত হয়ে যায়।

ব্যাপারটা চোখে পড়ে গ্রামের বৌ, ঝি, পুরুষমানুষদের।

বৌ, ঝিদের মন্তব্য—ঢলানি, ঢলিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু পুরুষমানুষেরা সুযোগ পায়।

আমাদের গ্রামের মেয়ে অন্যে এসে ভাগ বসাবে?

ঘোঁট শুরু হয়। তিলকে তাল করা হয়। আর তিলোত্তমা সীতা কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে পুজোরী বামুন রাখাল ভট্‌চার্যের ঘরের এককোণে জায়গা নেয়। চোখের জলে ভাসে।

গ্রামের পুরুষমানুষেরা বৃদ্ধ, যুবক, সবাই একবাক্যে বলেন—আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, ভট্‌চার্যি মশাই যখন বাড়ী ছিলেন না, লোকটা সীতাকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল।

রাখাল ভট্‌চার্যও কেমন যেন বিশ্বাস করলেন গ্রামবাসীর কথা।

মেয়েকে ঘেন্নায় বললেন—সীতু, তোর শেষকালে এই ধর্ম? তোর হাতের জল যে নারায়ণ পেত!

কাউকে বোঝাতে পারল না সীতা।

এ অন্যায়, এ মিথ্যে।

লোকটাও বলল—আপনারা আমাকে দোষ দিচ্ছেন দিন কিন্তু একটি নিষ্পাপ

মেয়ের এমন করে সর্বনাশ করবেন না।

কিন্তু লোকটির অবস্থাও শেষপর্যন্ত ভাল থাকল না। তাকে কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়ে গ্রামের বার করে দেওয়া হল।

কেউ যখন বিশ্বাস করল না তখন সীতা এল চৌধুরী বাড়িতে।

চৌধুরী বাড়ীর অন্দর মহলে বাইরের কোন কথাই যায় না।

নির্মলা, মহামায়া কিছুই জানেন না।

সীতা এল সেই চৌধুরী বাড়ীতে এই অন্যায় ও মিথ্যা দোষারোপ থেকে বাঁচবার জন্যে।

সমস্ত কাহিনী সে নির্মলা ও মহামায়াকে বলল।

আমার মনে হয়ত কোন দুর্বলতা ছিল, তাই বলে গ্রামবাসী আমাকে যে কলঙ্ক দিল সে মেয়ে হয়ে আমার দ্বারা কি সম্ভব ?

কিন্তু রাঘব চৌধুরী তখন খুব ব্যস্ত।

একবার মহামায়া সুযোগ করে দাদাকে বলতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু রাঘব চৌধুরী তার উত্তরে বলেছেন—আমার এখন ওসব শোনবার সময় নেই। রাখাল ভট্টচার্য মেয়েটার বিয়ে দেয় না কেন ? মেয়ে বড় হলে ঐরকম ঘটনার ঘটে।

কিন্তু সে সব কথা রাঘববাবু ভুলে গিয়েছিলেন।

একদিন অন্দরমহলে থাকতে থাকতে জিজ্ঞেস করলেন—সীত এ বাড়ীতে আর আসে না।

সীতা সেই কলঙ্ক নেবার পর নিজেকেই কেমন গুটিয়ে নিয়েছিল।

বাবা তার হাতে জল স্পর্শ করেন না। নিজে স্বপাকেই আহার করেন।

সীতা নিজের জন্যে প্রায় দিন রান্না করে না। যে বাবা তাকে এতো ভালবাসতেন, সেই বাবাই যেন তাকে কি চোখে দেখেন।

এক এক সময়ে রাগ করে বলেন—এর চেয়ে মরে গেলেই তো পারতিস্।

মহামায়া বললেন—দাদাকে সীতার সব কাহিনী।

মেয়েটি যে নিরপরাধ তাও বললেন।

রাঘব চৌধুরী সীতাকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন।

সীতা এলে সীতাকে দেখে চমকালেন।

সীতাকে আগেও দেখেছেন রাঘববাবু কিন্তু এ যেন অন্য সীতা। ফুল বাসি হয়ে গেলে যেমন দেখতে হয় তেমনি নিষ্প্রাণ।

সীতা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে রাঘববাবুর সামনে।

রাঘববাবু যেন কি ভাবেন !

হঠাৎ বলেন—বাবা বাড়ী আছেন ?

সীতা মাথা নত করে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

বাবাকে বলো আমি ডাকছি।

সীতা চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর রাখাল ভট্টচার্য হন্তদন্ত হয়ে চৌধুরী বাড়ীতে এসে হাজির হন।

রাঘববাবু তাঁকে দেখেই ধমকে ওঠেন।

এ সব কি শুনছি ভট্‌চার্য মশাই? আপনার কি বুড়োবয়েসে ভীমরতি হয়েছে?

ভট্‌চার্য মশাই প্রথমে বুঝতে পারলেন না রাঘববাবুর কথার অর্থ।

বললেন - আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না চৌধুরী মশাই?

রাঘববাবু তখন বললেন - আমি সীতার কথা বলছি। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারেন না সেটা আপনার অক্ষমতা। সেই মেয়েকে মিথ্যে এক কলঙ্ক দিয়ে তাকে অপরাধী করেছেন।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তখন চোখমুখ দিয়ে ঘৃণা বের করেন, অনেক সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান। তারপর বলেন যা রটে তার কিছুটা তো বটেই! আপনি চৌধুরী মশাই যতই আমাকে দোষ দিন, আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নারায়ণ নিয়ে ঘর করি, একটা কথা শোনার পর কি সেটা ভুলে যেতে পারি?

তবু সে আপনার মেয়ে! মেয়ে সত্যিকারের অপরাধী কিনা দেখবেন না। গ্রামবাসী চক্রান্ত করেও তো তার নামে দোষ দিতে পারে।

সবই স্বীকার করি চৌধুরী মশাই। তবু মন কিছুতে মানতে চায় না।

মেয়ের প্রতি আপনার স্নেহও কি একটু নেই?

রাখাল ভট্টচার্যের চোখ এবার ছলছল করে ওঠে।

মাথা হেঁট করে বলেন—ছিল, আজ নেই।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে রাঘববাবু রাখাল ভট্টচার্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রাখাল ভট্টচার্য এক সময়ে চলে যান।

রাঘববাবু অনেক কথাই ভাবতে থাকেন।

এই রাখাল ভট্টচার্যই একদিন বলেছিলেন।

ভট্টচার্য মশাই, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

রাখাল ভট্‌চার্য ম্লান হেসে বলেছিলেন—কারণ বহু, তবে প্রধান দুটি। একটি অর্থ সংকট। দ্বিতীয় অপত্য স্নেহ। মা আমার চলে গেলে এই বুড়োর কি গতি হবে?

আর আজ সেই রাখাল ভট্‌চার্য বললেন—স্নেহ ছিল আজ নেই।

তারপর কদিন চলে গেল।

চৌধুরী বাড়ীর অন্দরমহলের সেই একই দিন রাত্রি।

মাঝে মাঝে গোবিন্দ ঢালীর সঙ্গে রাঘববাবু চাপা স্বরে কি সব কথা বলেন।

দেখা যায় চৌধুরী বাড়ীর চারিদিকে আরও নতুন পাহারা।

একদিন গোবিন্দ ঢালীই এসে রাঘববাবুকে চুপি চুপি বলল—কর্তা, নবাবের চর গ্রামের মধ্যে ঘুরছে।

রাঘববাবুও চুপি চুপি বললেন—কজন?

মনে হচ্ছে দুজন।

কোথায় যায় কি করে লক্ষ্য কর।

গোবিন্দ ঢালী আবার একদিন এল, বলল—কর্তা, দুজন নয়, পাচ ছ জন। কেউ কেউ এ বাড়ীর আশেপাশে ঘুরছে, কেউ বামুন ভট্‌চার্যের বাড়ীর কাছে ঘুরছে।

সব কটাকে খতম করে দিতে পারো?

গোবিন্দ ঢালী তৈরী হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু রাঘববাবু কি ভেবে বলেন—না থাক্‌।

হাজী আহম্মদ যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই বুঝতে পারেন রাঘববাবু। কিন্তু কি এখন করা উচিত তিনি ভেবে পান না।

অথচ সময় সংক্ষেপ। ধূর্ত সেই উজীরের প্রার্থনা অনুযায়ী কাজ না করলে যে কোন সময়ে নবাব ফৌজ এসে সব কিছু লুটে নিয়ে যেতে পারে।

বাড়ীর ভেতরে তাকিয়ে দেখেন দুটি মেয়ের দিকে।

দুটি যেন ফুটন্ত ফুল চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। বর্ণ বৈচিত্র্যে অন্দরমহলের নিষ্প্রাণ অংশ যেন উজ্জ্বল।

মামাবাবুর নির্দেশে সরলা আবার প্রগলভা হয়ে উঠেছে।

তার হাসিতে সারা বাড়ী মুখর। কথায় সারা বাড়ী গম গম করে। সে জানে না তার মামাবাবু কেন দিনরাত বাড়ীর মধ্যে থেকে ভেবে চলেছেন। সে যদি জানত?

না জানার কোন অবকাশই কারুর ছিল না।

এমন কি গোবিন্দ ঢালীকেও বলেননি রাঘব চৌধুরী।

রাঘববাবু তাই দেখেন নিজের ঘরে শুয়ে দুটি মেয়ের চলাফেরা।

মাঝে মাঝে সরলার দু একটি কথা ভেসে আসে।

একদিন সরলা সুভদ্রাকে কি বলেছে। সুভদ্রা সরলার চুলের মুঠি চেপে ধরেছে।

সরলা তবু হাসছে, তবু দুষ্টুমি করছে।

বুক থেকে তার আঁচল খসে পড়েছে। হাসতে হাসতে পুষ্ট বুক তার ওঠানামা করছে।

এই দিদি ছাড় ছাড় আমার লাগে না বুঝি।

সুভদ্রা তবু ছাড়ে না সরলার চুল।

বল্‌ আর কখনও বলবি না।

বলছি বলছি বেশ আর কখনও বলব না।

ওদের খেয়াল ছিল না, ওরা রাঘববাবুর ঘরের দরজার সামনেই কখন চলে এসেছিল।

হঠাৎ দুজনেরই চৈতন্য হয়।

আর সঙ্গে সঙ্গে সরলা এক হাত জিব বের করে আঁচলটা বুকে তুলে দিয়ে দে ছুট্‌।

সুভদ্রাও সরে যায়।

রাঘববাবু এই সব দেখে দেখে হাসেন।

হাসিটাও আর আগের মতো স্পষ্ট হয়ে বেরোয় না।

নিঃশ্বাস পড়ে শুধু রাঘববাবুর।

শরীরে এতো শক্তি তবু কিছু করতে পারেন না।

তারপরই একদিন আসে হাজীসাহেবের কাছ থেকে লোক। জলদি ফরমাইস। এখুনি যেতে হবে নবাব প্রাসাদে।

সংবাদ বাহক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বলে যায়।

আর রাঘববাবু ভয়ে কেঁপে ওঠেন।

কিন্তু উপায় নেই, অনেকদিন সময় নিয়েছেন, অনেক ভেবেছেন কিন্তু সব ভাবনা এক জায়গায় এসেই মিলেছে।

মুর্শিদাবাদে যাবার আগে ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে তবু একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রাঘব চৌধুরী।

যাবেন না, বিদ্রোহী হবেন। কিন্তু নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে গেলে আরও শক্তির দরকার।

তারপর ঘোড়ার ওপর উঠে বসেন।

নবাব প্রাসাদ থেকে যখন ফিরে আসেন রাঘববাবু তখন তাঁর শরীরে কোন শক্তি নেই।

চলতে চলতে বার বার তাঁর চোখ দুটি ঝাপ্সা হয়ে যায়।

এ তিনি কি করলেন?

কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি ছিল?

বাঁচবার জন্যে মানুষ যেমন খড়কুটো চেপে ধরে তিনি তো তেমনি ভাবে কিছু চেপে ধরেছেন।

সরাইখানায় হাজী আহম্মদ তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

এবার নবাব প্রাসাদেই তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন।

আর তিনি প্রথম গেলেন সেই বিরাট প্রাসাদের মধ্যে।

উঁচু উঁচু থাম, গম্বুজ, মর্মরখচিত দেয়াল, সোপানশ্রেণী। রক্ষী, সিপাইয়ের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে সঙ্গীন তুলে।

তাঁকে দেখেই রক্ষী সঙ্গীন তুলে এগিয়ে এল।

হুঁসিয়ার, ক্যায়া মাঙতেহেঁ।

কিন্তু রাঘব চৌধুরীকে কোন কথা বলতে হল না, বোধ হয় উজীরসাহেব উপরের অলিন্দ থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন কিম্বা তাঁরই জন্যে অপেক্ষায় ছিলেন।

এক বান্দা এসে কুর্নিশ করে জানাল—আপ্ চলিয়ে। খোদাবন্দ হুজুর উজীরসাহেব আপকো মদতকে লিয়ে বইঠে হ্যায়!

রাঘববাবু বিস্মিত হলেন বান্দার কথা শুনে।

কিন্তু ভাবনা স্থায়ী হল না। তাছাড়া তখন ভাবারও কিছু ছিল না। সব ভাবনাই এক ভাবনার আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

তবু প্রাসাদের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে রাঘববাবু বিস্মিত হলেন।

এই প্রাসাদে তাঁর আগমন প্রথম।

এতকাল দূর থেকে প্রাসাদকে দেখেছেন। প্রাসাদের সিংহদরজার কাছেও অনেকবার দাঁড়িয়েছেন।

আমীর ওমরাহদের রাজসিক পোষাক পরে কাউকে ঘোড়ায়, কাউকে তাঞ্জামে করে যেতে দেখেছেন।

কিন্তু কখনও এর মধ্যে ভুলেও ঢোকেন নি।

সেই প্রাসাদের মধ্যে তাঁর আজ আমন্ত্রণ!

অন্যদিন ও অন্য অবস্থায় হলে তাঁর আনন্দ হত কিন্তু এদিন আনন্দ হল না।

বান্দা নিয়ে চলল তাকে অনেক চড়াই উৎরাই নানা ঘুর পথ দিয়ে।

রাঘববাবু দেখতে দেখতে চললেন নবাবী ঐশ্বর্যের নানা জৌলুষ।

বাইরে থেকে দেখা যায় না নবাবের এতো ঐশ্বর্য।

প্রথম তো বাতাসেই কেমন যেন সুগন্ধ।

তারপর দেখা গেল ফুল বাগিচা। নানা রঙের ফুলের সমারোহ।

কৃত্রিম ঝরণা। ঝরণার জল চলেছে নগ্ন নারী মর্মর মূর্তির গা বেয়ে।

এসবেও তিনি অবাক হলেন না। অবাক হলেন যখন বান্দা এক জায়গায় এসে বলল আপনার সমস্ত অস্ত্র এখানে জমা দিন। আপনাকে এবার চোখে পট্টি বেঁধে নবাবের খাসমহলে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেই মতই করা হল।

রাঘব চৌধুরী চোখে পট্টি বাঁধা অবস্থায় বান্দার সঙ্গে চললেন।

এক জায়গায় থামতে কে যেন বললেন—পট্টি খুলে দাও আসগর।

কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল—ইনি কে?

নবাবের সঙ্গে কোনদিন তাঁর মোলাকাৎ হয় নি, নবাবকে কেমন দেখতে তাও তিনি জানেন না।

রাঘববাবুর চোখের পট্টি খোলা হলে তিনি দেখলেন—চোখ ধাঁধানো এক ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

দেয়ালগুলি কি দিয়ে মোড়া জানেন না তবে চোখ রাখা যায় না এতো জৌলুষ যে চোখ ঠিকরে আসে।

দূরে একটি রত্নখচিত আসনে যিনি বসেছিলেন তিনিই যে নবাব বুঝতে পারলেন।

নবাবের পরনে নবাবের মতই জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক। বুকের ওপর দুলছে মুক্তার হার। কানেও হীরার কুণ্ডল।

আর নবাবের একটু দূরে একটি সামান্য আসনে বসে আছেন। হাজী সাহেব।

হাজী সাহেবের পোষাক সেই সাধারণ। কালো আলখাল্লায় নিজেকে ঢেকে সেই কুটিল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন।

রাঘববাবুর চোখের পট্টি খোলা হলে হাজীসাহেব হঠাৎ মহা সমাদরে বললেন—আইয়ে, আইয়ে চৌধুরীসাব। নবাব হুজুর আপনার জন্যে বসে আছেন।

নবাবসাহেবকে বললেন—চৌধুরীসাব! রাঘব চৌধুরী। চরমারির বহুৎ বড়

ব্যবসাদার।

রাঘববাবু যথারীতি কুর্নিশ করলেন।

নবাব সুজাউদ্দিন রাঘববাবুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

হাজী সাহেব বললেন চৌধুরীসাব, আপনার কথা আমি নবাব হুজুরকে সব বলেছি। উনি রাজী আছেন আপনার প্রস্তাবে।

রাঘববাবু বুঝতে পারলেন না প্রস্তাবটা কি ?

কিন্তু হাজী সাহেব সে সব ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বললেন—আপনি নবাবের উপকার করবেন, নবাব হুজুর কি আপনার উপকার না করে পারেন ? একটা তালুক বেহাত হলেই সেটা আপনার জিম্মায় আসবে। ত'ছাড়া হুজুর আপনাকে দরবারেই একটা পদ দেবেন।

রাঘববাবু তখন হতবুদ্ধি। কি বলবেন ভেবে পান না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকেন।

হাজী সাহেব তারপর বলেন—তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল। ফৌজ চলে যাবে চরমারিতে। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। শুধু একটা কোশিষ করবেন, যাকে দেবেন তাকে একটু আলাদা করে রাখবেন।

তারপর হেসে বললেন - যদি দুজনকেই দিতে চান তাহলে কোন কথাই নেই। লেকিন আল্লার কসম। দুনিযার কেউ জানবে না। সিরেফ আমরা তিনজন।

দুনিযায় দৌলত বাড়াতে গেলে এমনি একটু উলটো পালটা করতে হয়। কি বলেন নবাব সাহেব !

নবাব সাহেব মাথা দুলিয়ে মুক্তার হারটা হাতে পাকাতে পাকাতে বললেন—আচ্ছা বাত। দুনিয়ায় তো এই হিসাব্।

রাঘববাবু ঘামতে ঘামতে হঠাৎ মরীয়া হয়ে বলেন— উজীর সাহেব, আমার অন্য কথা ছিল।

থমকে যান উজীর হাজী।

বাত ? কোন সি বাত ?

উজীর সাহেবের চোখ দুটি কেমন ছোট হয়ে কুঁচকে যায়।

রাঘববাবু নবাবের সামনে বলবেন কিনা ভাবেন।

এই নবাব যিনি তার সামনে বসে আছেন তিনি বহু নারী ভোগ করেও এখনও বুভুক্ষু। এখনও তিনি প্রতিদিন চান নতুন নতুন যুবতী মেয়ে। আর ঐ যিনি সাদা আলখাল্লা ধারণ করে বসে আছেন তিনি দিয়ে চলেছেন প্রতিদিন একটি একটি করে।

আর ভাবতে পারেন না রাঘব চৌধুরী।

সেই মুহূর্তে সুভদ্রা ও সরলার কথা তার মনে আসে।

সরলা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সরলার সরল মুখ ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে বাতাস লেগে যেন দোলে।

তার হাসিটি যেন মনের মধ্যে এখনও ঝঙ্কৃত হয়।

সুভদ্রার শান্ত কমনীয় সুন্দর মুখখানি। ঠিক তার মতই দীর্ঘ স্বাস্থ্য। চোখের দুই তারায় কি যেন মাদকতা।

উজীর সাহেব, আমার একটা দোসরা বাত ছিল।

উজীর সাহেব মাথা দুলিয়ে বলেন—বোলিয়ে বোলিয়ে।

একটু অন্য জায়গায় বললে হত না।

হাঃ হাঃ করে উজীরসাহেব হাসেন। দুসরা জায়গা। কিস লিয়ে? তারপর হেসে বলেন—নবাব হুজুরকে লিয়ে? কই ডর নেই চৌধুরীসাব। আপনি আপনার যা বলবার বলতে পারেন।

তবু খানিকটা অপেক্ষা করলেন রাঘব চৌধুরী, তারপর বললেন—আমি যদি অন্য কোন দোসরা লড়কাকে দিই তাহলে হবে না?

হাজী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

নবাব সাহেবও অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর হাজী সাহেব চোখ কুঁচকে বললেন—লড়কী জোয়ানী, খুব সুরৎ?

রাঘব চৌধুরী মাথা হেলিয়ে বললেন—হ্যাঁ, সবই তার আছে।

কোথায় থাকে?

রাঘববাবু বললেন—আমাদেরই গ্রামে।

হঠাৎ হাজী বললেন—এক পুজরী বামুনের মেয়ে—না? মেয়েটাকে বাপ কলঙ্কের বদনাম দিয়ে আলাদা করে রেখেছে।

রাঘববাবু বিস্মিত হয়ে হাজী আহম্মদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অবাক হলেন কোথায় চরমারি আর কোথায় মুর্শিদাবাদ, ঠিক খবর এসে গেছে।

হাজী আহম্মদ রাঘবাবুর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

চৌধুরীসাব, আপনি অবাক হচ্ছেন। নবাব সরকারকে সবকিছুই ইয়াদ রাখতে হয়। তারপর বললেন—ঠিক আছে, তাই মঞ্জুর কিন্তু মেয়েটিকে সঙ্গে করে আপনাকে এখানে পৌঁছে দিতে হবে।

রাঘববাবু চুপ করে রইলেন।

এ কি করে সম্ভব? গাঁয়ে তার সম্মান আছে, তাছাড়া সীতা জানতে পারবে তা তিনি চান না।

সীতাকে তিনিও স্নেহ করেন। তিনি চান না আপন মেয়ের মতো তাকে বলি দিতে কিন্তু উপায় কি? তাই বললেন—উজীরসাহেব, আমাকে এ অনুরোধ করবেন না। আমি যাকে দেবো সে ও আমার কন্যাতুল্য।

আর সঙ্গে সঙ্গে উজীরসাহেব হেসে বললেন—কন্যা তো নয়, তাহলে কন্যাকেই দিন। কন্যাকে দিলে আর আপনাকে এই তকলিফ নিতে হবে না।

রাঘববাবু চুপ করে অপরাধের মত বসে রইলেন।

এই সময়ে নবাব বললেন—উজীরসাব, চৌধুরীসাবকে জাদা তকলিফ দেবেন না। উনি যা চান তাই করুন।

হাজী নবাবের কথা শুনে বললেন— ঠিক আছে চৌধুরীসাব, তাই হবে। শুধু আপনি একটু হুঁশয়ার থাকবেন, চিড়িয়া না উড়ে যায়। উড়ে গেলে কিন্তু নবাব ফৌজ আপনার প্রাসাদে ঢুকবে।

এ সব কথাই ভাবতে ভাবতে ফেরেন রাঘব চৌধুরী।

চিড়িয়া উড়ে গেলে ফৌজ চৌধুরী প্রাসাদে ঢুকবে।

এ যেন জবরদস্তি হুকুম। এ যেন জুলুম।

তবু সীতার জন্যে মনটা হাহাকার করে রাঘব চৌধুরীর।

কিন্তু চরমাখিতে ফিরে তাঁকে তাঁর কর্তব্য করতে হয়। একবার ঘোড়া থেকে নেমে সীতার খোঁজ নিতে হয়।

সীতা রাঘব চৌধুরীকে দেখে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে রাঘব চৌধুরী কষ্ট পান।

তাছাড়া সীতার মুখখানি কেমন ম্লান।

চুল বাঁধে না। ময়লা কাপড় পরে থাকে। হয়ত খুব একটা কিছু খায় না।

রাঘববাবু মনে মনে ভীষণ আহত হন। বেদনা বোধ করেন। চোখে জলও আসে।

সামলে নিয়ে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলেন—সীতা, তুমি বোধ হয় কিছু খাও না?

সীতার চোখ দুটি ছল ছল করে, কথা বের হয় না।

রাঘববাবু আবার বলেন—কিছু না খেলে তো শরীর টিকবে না, কিছু খাবে।

রাঘববাবু চলে আসেন নিজের বাড়ীতে।

সারাদিন ধরে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করেন কি এক ভয়ের মূর্ছনা নিয়ে।

তারপর সেই ভয়টাই স্পষ্ট হয়ে আসে অনেক রাত্রে।

রাঘব চৌধুরী তখন ঘুমোন নি। গম্ভীর, থমথমে মুখ। ভাল করে রাত্রে খেলেনও না। শুধু ঘুমোবার আগে মহামায়াকে বললেন—মায়া, মেয়েরা যে ঘরে শোয় আজ রাতটা তালা দিয়ে রেখো।

মহামায়া হঠাৎ এই কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। বড় বড় চোখ করে বললেন—কেন? কোন অমঙ্গলের সংবাদ পেয়েছ?

আমি যা বলছি তাই করবে।

রাঘববাবু সাংঘাতিক ভাবে রেগে উঠলেন।

মহামায়া বিস্মিত হলেন দাদার এই ধরনের কথা শুনে। কিন্তু কিছু বললেন না।

মুখখানা অন্ধকার করেই চলে গেলেন।

গোবিন্দ ঢালীকেও বলবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কি ভেবে বললেন না।

ব্যাপারটা গোপনই রাখতে চান।

যদি কেউ জেনে ফেলে তিনিই সীতাকে নিয়ে যাবার জন্যে নবাব ফৌজকে বলে এসেছেন? তাই একান্ত গোপনে থেকে অসহ্য এক কষ্ট নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকলেন।

ফৌজ যে আজ রাতে আসবে এ জানা কথা।

আরও ভাবলেন। নিজের মনের সান্ত্বনার জন্যেই ভাবলেন। তিনি সীতাকে না দিলেও সীতাকে একদিন নবাব ফৌজ নিয়ে যেত। চর তো গ্রামে ঘুরছিলই।

তাহলে দোষটা তিনিই আর কি করলেন?

তবু চোখে জল থইথই।

হাতের কাছাকাছি সব অস্ত্রগুলিই রেখেছেন।

যদি নবাব ফৌজ চৌধুরী প্রাসাদ আক্রমণ করে, বলা তো যায় না, তাহলে মোকাবিলা করতেই হবে।

অন্ধকার রাত। আলো জাগেনি সে রাত্রে।

শুধু অন্ধকারে গাছের পাতায় কি যেন ছটফটানি।

হঠাৎ সেই অন্ধকারে একাধিক ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ মাটির বুকে বাজনা বাজার মতো বেজে উঠল।

রাঘব চৌধুরী একটা ধারাল অস্ত্র হাতের মুঠিতে চেপে ধরলেন।

ছোট্ট গ্রামটি যেন রাতের বুকে সহসা জেগে উঠল।

চৌধুরী বাড়ী লেঠেলরা পাহারা দিচ্ছে। গোবিন্দ ঢালীর গলা শোনা গেল।

এই কে রে? হুঁশিয়ার।

রাঘববাবু ঘরের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করলেন।

লোকটাকে বলে দিলে ভাল হত।

এদিকে নবাব ফৌজ তখন গ্রাম ঘিরে ফেলেছে।

গ্রামের লোকেরাও বুঝতে পেরেছে কারা এসেছে। তাই অনেকে জেগে উঠেও তারা বেরোয় না।

নিশানা ঠিকই ছিল। চর ঠিক খবর নিয়ে গিয়েছিল।

চরই পথ দেখিয়ে ঠিক জায়গায় এসে থামে।

তার ঠিক পাশেই চৌধুরী প্রাসাদ। অন্ধকার হলেও স্পষ্ট দেখা যায়।

কোন এক ফৌজ দলের প্রধানকে বলল—এ বাড়ীতেও ছুটি আছে। ঝাঁপিয়ে পড়ব?

রাঘব চৌধুরী জানেন না ফৌজের সঙ্গে কে এসেছে, জানলে চমকে উঠতেন।

কালো আলখাল্লায় ঢাকা হাজী আহম্মদের দাড়ির জঙ্গলের মুখটা কেমন যেন হিসহিস করে ওঠে।

না এখন থাক্।

রাখাল ভট্টাচার্যের বাড়ী তখন ফৌজেরা ঘিরে ফেলেছে।

রাখাল ভট্টাচার্য নারায়ণকে বুকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। দরজা খোলাই ছিল। হঠাৎ একটা বর্শার খোঁচা খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন।

কিন্তু আর কিছু বোঝার আগেই কে যেন তার বুক থেকে নারায়ণের পুঁটুলীটা ছিনিয়ে নিল।

হেসে উঠল কে অন্ধকারে—শালা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

তারপর মুখের সামনে কে বলল চাপাস্বরে—তোর বেটি কোথায় আছে বল্?

আর তখনই বুঝতে পারলেন রাখাল ভট্টচার্যের বাড়ীতে নবাবের ফৌজ ঢুকেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রাখাল ভট্টচার্য হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে বললেন—না, না ওকে নিও না। ও বড় দুঃখী। আমি ওকে শুধু শুধু দুর্ণাম দিয়েছি।

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হল না, কে যেন তাঁকে এক লাথি মেরে সরিয়ে দিল।

তারপর সীতাকে খোঁজার পালা।

সীতাকে আগে হলে খুঁজতে হত না। সে তার বাবার ঘরেই এক পাশে শুয়ে থাকত। কিন্তু ঐ কাণ্ড ঘটার পর সীতা জায়গা নিয়েছিল আগে যেখানে গরু থাকত, তারপর গরু মরে যেতে ঘরটা এমনিই পড়েছিল সেই ঘরে।

তাই ফৌজদের খুঁজতে বেগ পেতে হল।

হাজী আহম্মদ অন্ধকারে দু একবার গজে উঠলেন।

চিড়িয়া যদি ভেগে থাকে?

সীতা প্রথমে বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা। অগাধে ঘমিয়েছিল। অনেক লোকের কথাবার্তা শুনে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

এলোমেলো কাপড় চোপড় ঠিক করে নিয়ে বেরোতেই নবাব ফৌজ তাকে খপ করে ধরে ফেলল।

ওদিকে তখন বাইরে একটা খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছিল।

চৌধুরী বাড়ীর কিছু পরেই রাখাল ভটচার্যের ভাঙাচোরা খড়ের ছাউনির কুড়ে ঘর।

গোবিন্দ ঢালী দেখতে পেয়েছিল নবাব ফৌজকে। শুধু গোবিন্দ ঢালী নয়, অন্যান্য লেঠেলরাও।

পাহারা দিচ্ছিল তারা চৌধুরী প্রাসাদ। প্রতিদিনের এমনি নিয়ম। পালা করে রাত জেগে থাকতে হয়।

হাতের লাঠি যেন সমস্ত অস্ত্রকে হার মানায়। তারা দেখতে পায় নবাব ফৌজকে।

প্রথমে ভেবেছিল নবাব ফৌজ বোধ হয় চৌধুরী বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে।

একজন লেঠেল লাঠি হাতে অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকারেও তার কালো তাগবাই শরীরটা জলছিল।

একটি নবাব ফৌজ খাপ থেকে তরোয়াল খুলে পাশ দিয়ে চলে যেতে যেতে সেই লেঠেলকে ভেংচায়।

গোবিন্দ ঢালী ততক্ষণে চৌধুরী প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে গেছে।

কর্তা, হুজুর!

গোবিন্দ ঢালী চাপাস্বরে অথচ জোরেই ডাকে রাঘব চৌধুরীকে।

রাঘব চৌধুরী সবই শুনেছেন, তবু সাড়া দেন না।

গোবিন্দ ঢালী আরও কযেকবার ডাকে।

কর্তা, গ্রামে নবাব ফৌজ। মনে হচ্ছে বামুন ভট্টচার্যের বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছে।

গোবিন্দ ঢালী কোন সাড়া না পেয়ে সে নিজেই নিজের কর্তব্য ঠিক করে নেয়।

ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নবাব ফৌজের ওপর।

রাঘববাবু ঘরের মধ্যে থেকে সবই বুঝতে পারেন কিন্তু তাঁর করবার কি আছে? সমস্ত অস্ত্রগুলি তাঁর সামনে জড়ো করা।

অথচ একটাতেও হাত দেবার উপায় নেই।

এই সময়ে ঘরে আসেন নির্মলা ও মহামায়া।

মহামায়া চোখ কপালে তুলে বলেন- দাদা, মনে হচ্ছে নবাবের ফৌজ গ্রামে ঢুকেছে?

রাঘববাবু বোনকে কিছু বলতে যান।

কিন্তু মহামায়া তখন কান্না জুড়ে দিয়েছেন। ওমা, আমাদের কি হবে?

রাঘববাবু যত বলবার চেষ্টা করেন ফৌজ আমাদের বাড়ীতে ঢুকবে না। চেঁচামেচি কর না। ঘরে গিয়ে ঘুমোও কিন্তু কিছুই বলতে পারেন না। কিছুই যে বলা যায় না তা জানেন বলেই চুপ করে থাকেন।

তালা বন্ধ ঘর থেকে সরলা, সুভদ্রার আর্ত চিৎকার ভেসে আসে।

মা, পিসিমা, দরজা খুলে দাও। একি আমাদের ঘরে তালা বন্ধ কেন? ও বাইরে কিসের শব্দ?

এই সময়ে শব্দকে ছাপিয়ে নারী আর্তনাদ রাতের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে।

তোমরা কে কোথায় আছো আমাকে বাচাও? আমাকে নবাবের লোকেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। চৌধুরীকাকা, সুভদ্রা

হঠাৎ সেই আর্তনাদও স্তব্ধ হয়ে যায়।

তারপর নবাব ফৌজের চলে যাওয়ার শব্দ।

তখন গোবিন্দ ঢালী জখম হয়েছে। আরও অনেক লেঠেল জখম হয়েছে। তারা আহত হয়ে চৌধুরী প্রাসাদে চলে এসেছে।

নবাব ফৌজ চলে যেতে যেতে তবু দাড়ায় চৌধুরী প্রাসাদের সামনে।

হাজী আহম্মদ ঘোড়ার ওপর বসে বসে কি যেন ভাবেন।

তারপর চাপাস্বরে বলেন—কাফের, তুমি বড় ধূর্ত। আচ্ছা, কি করে বেটিদের জিম্মা করে রাখো দেখবো।

ফৌজদের বলেন—ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে দরকার নেই তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটাও।

ফৌজ চলে যাবার পর সমস্ত গ্রামটাই জেগে ওঠে।

রাঘব চৌধুরীও একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

গোবিন্দ ঢালী ও লেঠেলদের কিছু বললেন না।

গোবিন্দ ঢালীই বলে—কর্তা, ওদের ভাল করে বাধা দিলে বোধ হয় সীতা মাকে ধরে নিয়ে যেতে পারত না।

কিন্তু রাঘববাবু কোন কথার উত্তর দেন না।

মহামায়া শুধু এক সময়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে—দাদা, এর চেয়ে

আমাদের কুসুমপুরে রেখে এসো।

অনেক দুঃখেও রাঘববাবুর মুখে হাসি আসে। বলেন—কুসুমপুরে বুঝি নবাব ফৌজ যায় না ?

মহামায়া সে কথার উত্তর দিতে পারেন না।

রাঘববাবু তাকে নিশ্চিন্ত করে বলেন—কোথাও যেতে হবে না, আমি ওদের জন্যে পাত্র খুজে আনব।

তারপর নিজের মনেই বলেন – আনতেই হবে। এবং তা খুব শীঘ্র।

তার পরদিন থেকে পাত্র খোঁজার দিকে মন দেন রাঘববাবু।

মাধবপুরে থাকে একজন লোক।

লোকটাকে আগে বলেছিলেন। তারপর যোগাযোগ না থাকার জন্যে খবর নেওযা হয নি।

রাঘববাবু পরদিন সকালে সেই মাধবপুরের দিকেই এগিযে চললেন।

চরমারি থেকে মাধবপুর খুব বেশি দূরের পথ নয়।

সেখানে থাকে রাধাকান্ত দাস।

রাধাকান্তকে সকলে জানে ব্যবসাদার। ব্যবসার সুবাদেই রাঘববাবুর সঙ্গে আলাপ। রাঘববাবু কখনও মাধবপুরে যাননি।

রাধাকান্ত যে গোপনে ঘটকের কাজ করে তিনি জানতেন না। তবে শুনেছিলেন রাধাকান্তর বিযে সাতটি।

একদিন কথায় কথায সেই কথা উঠেছিল।

তার উত্তরে রাধাকান্ত হেসে উঠেছিল।

রাধাকান্তকে দেখতে অদ্ভুত। পাকানো দড়ির মতো চেহারা। মাংসের আধিক্য শরীরে আছে বলে মনে হয না। লম্বা ঢেঙা চেহারা। মুখখানি ছুঁচোলো। একটা চোখ একটু ট্যারা। কথা যখন বলে ট্যারা চোখটা দপ দপ করে জ্বলে।

সেই রাধাকান্ত বলল—চৌধুরীমশাই, চার হাত এক করে দেওয়ার কিছু ব্যবসা করি। বলতে গেলে এটাই আপনাদের আশীর্বাদে জাত ব্যবসা। তা বুঝলেন না চৌধুরীমশাই, সব বড বড় ঘর নিয়েই আমার কারবার। আর তেনারা বিশ্বাস করে আমাকে কন্যা দেখান। তা কি জানেন, মাঝে মাঝে দেখতে দেখতে কেমন অঘটন ঘটে যায়। সব ঠিক ঠাক্ হঠাৎ বর বে করতে এল না। তখন কি করা, এই রাধাকান্তকে এগিযে যেতে হয়।

তা আপনাদের আশীর্বাদে। রাধাকান্ত হাসে হলুদ হলুদ পোকা খাওয়া দাঁত মেলে। হাসিটাও অদ্ভুত। দেখলে মেয়ে কেন, কোন কিছুই দিতে ইচ্ছে করে না।

সেই রাধাকান্ত বলল—বুঝলেন না চৌধুরীমশাই, জাত ব্যবসা কি না। বর যখন বিয়ে করতে এল না, তখন আমাকেই বসতে হল। তবে একটাও ধনী কন্যা মেলেনি। হয়ত আগে তালপুকুরে-ঘটি ডুবত, আজকাল ডোবে না। তেমনি শ্বশুরই জুটল। অবশ্য দু'একটা বোযের বাপের কিছু আছে কিন্তু রাধাকান্তকে হাত উপুড় করে না।

এই রাধাকান্তকেই একদিন বললেন রাঘববাবু দুটি পাত্রের জন্যে। তবে ভয়ও ছিল, শেষকালে রাধাকান্ত না অঘটন ঘটিয়ে অষ্টম নবম করে ফেলে। সেইজন্যে রাধাকান্তকে মেয়ে দেখান নি, শুধু মুখে বলেছিলেন, মেয়েরা আমার পরমাসুন্দরী। আর কাজ করব আমারই মত বনেদী লোক অথবা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বড়লোকের সঙ্গে।

তবে সে সব কথা অনেক আগেকার।

তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। রাধাকান্তও বড় একটা ব্যবসার জন্যে আসে না। আসে কিনা তিনি জানেন না। জানার মত ফুরসৎ ছিল না।

সেই রাধাকান্তকেই শেষ পর্যন্ত দরকার হল।

চেনা জানা অনেকেই আছে। তাঁর সমগোত্রিয় বহু লোকের সঙ্গে তাঁর জানা কিন্তু আজ কাউকেই বলতে ভয় করে।

কে কি সন্ধানে ওৎ পেতে আছে বলা যায় না তো। মেয়েরা তার বালিকা নয়। বালিকা হলে না হয় সাহস ছিল।

সেই সব কথা ভেবেই তিনি মাধবপুরের দিকে চললেন।

এক মনেই নানা পথঘাট পার হয়ে চলেছেন।।

সূর্যের আলো ছড়িয়েছে ধান ক্ষেতের ওপর। সোনার বরণ ধান শীষের গায়ে লেগে বাতাস দুলছে। গাছের ডালে বসে পাখীরা ডাকছে। পুকুরে বৌ-ঝিরা স্নান করছে।

রাঘববাবুর ঘোড়া এগিয়ে চলল উর্ধ্বশ্বাসে। কেউ কেউ তাকিয়ে তাকিয়ে ঘোড়সওয়ারকে দেখল কিন্তু কিছু বলল না।

হঠাৎ রাঘববাবু একটা মোড় ফিরতেই একজন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে রাঘববাবু অনুমান করছিলেন। কে যেন তার পিছুতে আসছে। মোড়ের মাথায় এসে তাই তিনি লুকিয়ে পড়লেন।

আর অপর ঘোড়সওয়ার বুঝতে পারে না। মুখোমুখি দুজনের দেখা হয়ে যায়। কিন্তু অপর ঘোড়সওয়ার সামনে দাঁড়ায় না। ঘোড়ার পেটে গোঁত্তা মেরে অন্য পথে চলে যায়।

রাঘববাবু আবার চলতে শুরু করেন মাধবপুরের দিকে। তিনি সবই বুঝতে পারেন কিন্তু মরীয়া।

হাজী আহম্মদকে কিছুতে দেবেন না মেয়ে দুটিকে। দরকার হলে তাদের নিজে হাতে বধ করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবেন।

আবার রাঘববাবুর ঘোড়া এগিয়ে চলল। তারপর মাধবপুরে গিয়ে রাধাকান্তর বাড়ী খুঁজতে বেশী বেগ পেতে হল না।

রাধাকান্তর বিষয় সম্পত্তি দেখে তিনি অবাক হলেন।

পুরোনো আমলের বিরাট বড় বাড়ী একটা। ধানের মরাই আছে। সামনে বড় একটা পুকুর। পুকুরের অন্যদিকে কটি চালাঘর। সেখানে কিসের যেন ভীড়।

লোকমুখে শোনা গেল, ওখানে তাড়ির ব্যবসা আছে রাধাকান্তর।

কিন্তু রাধাকান্তর দেখা পেলেন না রাঘববাবু। শুনলেন। সম্ভবত ওর প্রথমা স্ত্রী এসে বলল—তিনি তো বাড়ী নেই!

বউটির মুখটি রাগ রাগ। রাগ করেই বলল—আপনার কি দরকার বলে যান, এলে বলবো।

কিন্তু সবাইকে তো সে কথা বলা যাবে না। কোথায় গেছে সে?

বউটি বলল বিয়ে করতে।

বলেই আর দাঁড়াল না।

রাঘববাবু ফিরলেন। আবার পথ ধরলেন চরমারির। ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। কিন্তু কি করবেন ভেবে পেলেন না।

সীতার সেই আর্ত চিৎকার কিছুতে ভুলতে পারেন না।

অসহায়া সীতা। মিথ্যা কলঙ্ক নিয়ে অসহ্য দিনগুলি কাটাচ্ছিল। বাপও তাকে বিশ্বাস করেনি।

রাঘববাবু রাখাল ভট্টচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

রাখাল ভট্টচার্যের চেহারা দেখে অবাক হলেন।

একদিনে লোকটির চেহারা সাংঘাতিক পালটে গেছে। কিন্তু ভেবে পেলেন না কেন এই পরিবর্তন? তিনি তো মেয়েকে কলঙ্কিনী আখ্যা দিয়ে আলাদা করেছিলেন।

রাখাল ভট্টচার্যকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না। তিনি এসেই চৌধুরী মশাইয়ের সামনে আছড়ে পড়লেন।

চৌধুরীমশাই, আপনারা থাকতে আমার মেয়েকে নিয়ে গেল। আমার আর বাঁচতে সাধ নেই।

রাঘববাবু অবাক হলেন। রাখাল ভট্টচার্য একদিন মেয়ের মৃত্যু কামনা করেছিলেন। তাই অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন ভট্টচার্যমশাই, সীতার তো আপনি মৃত্যুই চেয়েছিলেন?

রাখাল ভট্টচার্য এবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না, না আমি ভুল করেছি। আমি ভুলে আমার নারায়ণকে বড় করে মাকে ছোট করেছি। আমার মা চলে গেল আজ আমার সব মিথ্যে, সব ভুল।

রাখাল ভট্টচার্য কাঁদতে কাঁদতেই চলে গেলেন।

রাঘববাবু তাঁকে ডাকলেন কিন্তু রাখাল ভট্টচার্য শুনলেন না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন রাঘববাবু।

আবার তিনি গেলেন মাধবপুর কিন্তু রাধাকান্তর সঙ্গে দেখা হল না। তারপর নিজেই যাওয়া ছেড়ে দিলেন।

আর ভাবতে পারেন না রাঘব চৌধুরী। ভাবার কিছুই ছিল—না! শুধু আরও এক আশঙ্কায় সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকলেন। তারপর কয়েকদিন চলে যাবার পর ভাবলেন—হয়তো তাঁরই ভুল।

নবাবসাহেব সীতাকে পেয়ে খুশি হয়েছেন। হাজীসাহেবও আর তাঁর কাছে অন্য দাবী পেশ করবেন না।

কিন্তু সেটা যে কত বড় ভুল ধারণা তখন রাঘববাবু জানতে পারেন না।

হাজী আহম্মদ ভোলেন নি রাঘববাবুর দুই কন্যাকে। রাঘববাবু আরও জানেন না, একদিন গোপনে এক ছদ্মবেশী নাপতিনী রাঘববাবুর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে সরলা ও সুভদ্রাকে দেখে গেছে।

সে গিয়ে বর্ণনা দিয়েছে হাজীসাহেবের কাছে অদ্ভুত। দুটি মেয়েই যৌবনবতী ও সুন্দরী। এ রত্ন নবাব সাহেব পেলে আর কারও দিকে ফিরে তাকাবেন না।

তবে সে সব কথা অনেক আগের।



সে রাত্রে সীতা অনেক কেঁদেছিল।

মুখে কাপড়ের খণ্ড পোরা ছিল বলে চেঁচাতে পারে নি। তারপর সে সব মুক্ত হলে সে চিৎকার করে কাঁদতে গিয়েছিল।

কিন্তু কাঁদতে পারে না, সামনে এসে উজীরসাহেব দাঁড়ান। বলেন—শোনো, বেয়াদপ হবার আগে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তোমায় আমি নিয়ে আসতে চাই নি, হয়ত নিয়ে আসতামও না এই বলে বলেন—রাঘব চৌধুরীর সমস্ত ঘটনা। যা রাঘব চৌধুরী বার বার লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

আর শুনতে শুনতে হঠাৎ সীতার চোখের সমস্ত কান্না মিলিয়ে যায়।

সে আর একটিও কথা বলে না।

হাজীসাহেব সামনে থেকে সরে যান।

বাঁদী আসে গোসলখানায় নিয়ে যাবার জন্যে।

সীতা বাঁদীর সাথে গোসলখানায় গিয়ে চন্দনের জলে স্নান করে। নবাবের দেওয়া জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরে।

তারপর নবাবের শয়নঘরে নিজেকে বলি দিতে যায়।

সে রাত্রে নবাবকে দিয়ে সে অনেকগুলি অঙ্গীকার করিয়ে নেয়।

কোন মারাত্মক অঙ্গীকার নয়।

রাঘব চৌধুরীর বোনঝি ও কন্যাকে যেমন করে হোক্ এখানে আনতে হবে।

নবাব হেসে সায় দিয়েছিলেন।

এ তো চমকদারী প্রার্থনা। মঞ্জুর হয়ে যাবে। আমি কালই উজীরসাহেবকে এ সম্বন্ধে বলবো।

পরদিন সীতা নিজেই উজীরসাহেবকে ডাকতে পাঠায়।

• উজীরসাহেব, আমার প্রার্থনা কি মঞ্জুর হবে না?

হাজী আহম্মদ তাঁর দাড়ির জঙ্গলে হাসিটা আর লুকিয়ে রাখতে পারেন না। হাসিটা প্রকাশ করেই ফেলেন।

অন্ত মেয়ে হলে হয়ত এ সব প্রার্থনা টার্থনা বিলকুল কানে নিতেন না। নেনও না। যে সব মেয়েরা শুধু নবাবের সুখের জন্যে আসে, সুখ চরিতার্থ হয়ে গেলে তারা বরবাদী জীবন নিয়ে এ হারেমেরই অন্য পাশে ভবিষ্যতের চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হয়।

কিন্তু হাজী সীতাকে সেভাবে গ্রহণ করেন না। বরং বিরাট এক কুর্নিশ করে আনুগত্য দেখিয়ে বলেন—ফরমাইয়ে বেগম সাহেবা? আমি আপনার গোলাম।

আমি চাই রাঘব চৌধুরীর সর্বনাশ।

কি করতে হবে বলুন?

সরলা ও সুভদ্রাকে এখানে আনতে হবে।

হাজী দাড়িতে হাত দিয়ে চিন্তার ভান করে বলেন—কিন্তু সে বড় মুস্কিল আছে বেগমসাহেবা।

কেন?

রাঘব চৌধুরীর অনেক লেঠেল আছে, তারা বাড়ী পাহারা দেয়।

সীতা রেগে উঠে বলে—উজীরসাহেব, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে কিনা বলুন। আমি ওসব কিছুই জানতে চাই না। যে আমার বিনিময়ে তার মেয়েদের বাঁচায়, আমি তার ধ্বংসই চাই।

হাজী আহম্মদ হঠাৎ কুর্নিশ করে বলেন—জো হুকুম। কিন্তু—

হাজী আহম্মদ থমকে দাঁড়ান, তারপর টেনে টেনে বলেন—লেকিন একটা চিরকুট লিখে দিলে তো বহুৎ আচ্ছা হয়। আমি কিছু ফৌজ সঙ্গে দিয়ে সেই চিরকুট চৌধুরী হাবেলীতে পাঠিয়ে দিতে পারি।

সীতার তখন মনে দারুণ ক্ষোভ। সে আর ভাবতে পারছিল না রাঘব চৌধুরীর কথা। সে রাত্রে রাঘব চৌধুরী ইচ্ছে করলে তাকে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু পিছনে যে এত বড় চক্রান্ত ছিল কে জানতো? কে জানতো সেদিন সকালে চৌধুরীমশাই তার কাছে কেন এসেছিলেন? সেই সব কথা মনে আসে আর নিজের জীবনের প্রতি ঘৃণা হয় সীতার।

বিনা দোষে গ্রামের লোকেরা তাকে কলঙ্ক দিয়েছিল। যে বাপ তাকে ভালবাসত সেই বাপ পর্যন্ত তাকে বিশ্বাস করল না।

নারীত্ব রাখার জন্যে তার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। সেই নারীত্ব আজ সানন্দে নবাব সুজাউদ্দিনকে দান করেছে।

এতটুকু মনে গ্লানি নেই। এখন শুধু আক্রোশ।

রাঘব চৌধুরী যে কাজ করতে পারলেন, সে পারবে না কেন?

হাজী আহম্মদের হাতে চিরকুট লিখে দিল, লিখে দিল—লিখল একটু কৌতুকের মিশ্র রঙে। "চৌধুরীমশাই, সরলা ও সুভদ্রাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ওরা

নবাবের হারেমে থাকবে। এখানে অনেক ভাল ভাল খানা। পরবার জন্মে নানা-ধরনের জরির কাজ করা সব পোষাক শয়নের জন্যে মেহাগনি পালঙ্ক। বাঁদীরা সর্বদা বিবিদের ফরমাইস খাটে। ওদের নিয়ে তো আপনার অনেক দুশ্চিন্তা। তার চেয়ে নবাব আপনার জামাই হলে মন্দ হবে না। নবাবের আদরে ও সোহাগে আপনার মেয়েরা নতুন জীবন পাবে। আপনারও সুবিধা হবে। আমি খুব সুখ পেয়েছি। আপনার দেওয়া দানে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। আমার আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। যে নারীসম্ভ্রমকে বাঁচানোর জন্যে—।" হঠাৎ থামে সীতা।

কৌতুকের সঙ্গে ব্যাঙ্গের ঝাঁজ মেশানো। তাই আরও কথা লিখতে যাচ্ছিল কিন্তু কি ভেবে অসম্পূর্ণ চিঠিই উজীরসাহেবের হাতে দিয়ে দিল।

উজীরসাহেব চিরকুটটা দোলাতে দোলাতে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ বিলম্ব।

হঠাৎ সীতার মনে যেন কি হল? ছটফট করে উঠল মনটা। সরলার মুখটা ভেসে উঠল। ছেলেমানুষ নয় সরলা, তবু সরল নিষ্পাপ মুখ। আর তার হাসিটা যেন মনের মধ্যে অনুরণিত হল। সুভদ্রার কথাও মনে এল।

সুভদ্রা একদিন অদ্ভুত একটা মেয়েদের গোপন কথা বলেছিল আচ্ছা সীতাদি, মেয়েরা এই যে একজন অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে, তারা কি করে নিজেদের মানিয়ে নেয়?

অদ্ভুত কথা! সীতা না হেসে পারেনি। তোর বুঝি আজকাল এই সব ভাবনাই মনে আসে।

সুভদ্রা লজ্জিত হয়নি।

বলো না সীতাদি!

সীতা হেসে বলেছিল—এর জবাব তো আমি দিতে পারব না। কারণ আমার এখনও সে অভিজ্ঞতা হয়নি। বরং তোর মাকে একথা জিজ্ঞেস করতে পারিস্?

সেই সুভদ্রা ও সরলাকে নিয়ে আসবার জন্যে সে উজীরসাহেবের হাতে চিঠি দিল?

না, না, এ কেন করল সে?

হঠাৎ সীতা দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে তাকাল।

সীতার বাঁদী বলল—কি হয়েছে বিবিসাহেবা! কই তকলিফ?

বাঁদীর নাম চাঁপা।

সীতা বলল—চাঁপা একটা কাজ করতে পারিস্? কোন সেনার সঙ্গে তোর আলাপ আছে?

কেন বিবিসাহেবা?

চাঁপার সঙ্গে একজনের গোপন প্রেম ছিল। সেটা এতই গোপন যে চাঁপা কারুর কাছে বলতে চায় না।

চাঁপা, এক্ষুনি এক জায়গায় খবর না পাঠালে দুটি মেয়ের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার হয়েছে, তার জন্যে ক্ষতি নেই, কিন্তু তাদের হোক আমি চাই না।

চাঁপা সবই জানত। বলল—তা কি করবেন ভেবেছেন বিবিসাহেবা?

শুধু সেখানে যদি কেউ খবর দিয়ে আসে, নবাব ফৌজ আমার চিঠি নিয়ে যাবার আগেই যেন তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

চাঁপা রাঘব চৌধুরীর ঠিকানা নিয়ে তার সেই প্রেমিক সেনার কাছে চলল।

ফৌজ পৌছবার আগেই সেই সেনা আখতার পৌছে গেল। রাঘব চৌধুরীকে বলল, আপনি আপনার মেয়েদের নিয়ে পালান, নবাব সেনা ছুটে আসছে।

রাঘববাবু অবাক হলেন, নবাব সেনাই নবাবী ফৌজ আসবার গোপন কথা জানাচ্ছে দেখে। তাই জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কে? তুমি কেন আমাকে খবর দিতে এলে?

নবাবী সেনা সে কথার উত্তর দিল না।

নবাবী ফৌজ আর কতদূর আছে?

তার উত্তরে আখতার জানাল, সম্ভবত আজ রাত্রে তারা আসবে, আপনি কয়েক ঘণ্টা সময় পাবেন।

কিন্তু তুমি কে? কেন আমার এই উপকার করছ? কে তোমায় পাঠাল?

সীতা বলে দিয়েছিল—কোন অবস্থায় যেন তার নাম প্রকাশ না করা হয়।

আখতারও তার নাম প্রকাশ করল না।

শুধু ঘোড়ার ওপর উঠে বলল—আপনি পালান মশাই। এখন আর অযথা কৌতূহল প্রকাশ করবেন না। নিশ্চয় আপনার কোন দোস্ত গোপনে আছে।

আখতার চলে গেল।



রাঘববাবু তারপর দু ঘণ্টার মধ্যে নৌকো সাজিয়ে ফেললেন।

তীর্থ করতে যাবেন।

দীর্ঘ দিনের তীর্থ। তখনকার দিনে দু তিন মাস নৌকায় চেপে অনেক পরিবার তীর্থ করতে যেত, রাঘববাবুও বাড়ীর ভেতর এসে বললেন—তোমরা তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নাও, আমরা তীর্থ করতে যাব।

নির্মলা কোনদিনও খুব একটা কথা বলেন না। আগে যাও বা বলতেন, ইদানীং ননদ আসার পর কথা একেবারে বন্ধ করেছিলেন।

সেই নির্মলাও অবাক হয়ে বললেন—তীর্থ?

তীর্থ নিয়ে খুব একটা কথা যে হত না তা নয়। মহামায়া বলতেন, তিনিও বলতেন। মহামায়া বলতেন, মেয়ে দুটো পার হলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হই। তখন দাদাকে বলে একেবারে সকলে মিলে কালীঘাটে ও তারকেশ্বরে ঘুরে আসব।

নির্মলা বলতেন—আমারও অনেকদিনের ইচ্ছে। কাশীর বিশ্বনাথ যদি দর্শন করতে পাই?

ভাজে ননদে মিলে এই নিয়ে অনেকদিন ধরে স্বপ্নের জালবোনা চলত।

মাঝে মাঝে আবার মহামায়া বলতেন—দাদাকে সংসার থেকে বার করাই মুস্কিল। দিনরাত যা করে বেড়ায়। চৌধুরীদের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।

তারপর চৌধুরীদের সেই পূর্ব গৌরব ফিরে এল। চৌধুরী বাড়ী এখন আর সেই অতীতের ম্লান ছায়া নিয়ে অধোবদনে মুখ ঢাকে না।

চারিদিক ঐশ্বর্যের জৌলুসে জমজমাট।

কিন্তু অন্দরমহলে অশান্তি দুটি মেয়েকে নিয়ে। ও দুটি পার না করা পর্যন্ত কোন্ শান্তি নেই।

সেই সময়ে এই তীর্থ যাত্রার প্রস্তাব।

কিন্তু রাঘববাবু কাউকেই কিছু ভাবতে দিলেন না। তাড়াতাড়ি যা পারলেন নৌকায় তুললেন। প্রায় তিন মাসের রসদ সঙ্গে নিলেন। নিলেন আর যা মূল্যবান ও মনের মত। যেন ঘরবাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছেন, এমনিভাবে তড়িঘড়ি করে সব শেষ করলেন।

গোবিন্দ ঢালীও নিল সঙ্গে কজন লেঠেল।

গোবিন্দ ঢালীকে রাঘববাবু বলে দিলেন—গোবিন্দ, একটু হুশিয়ার থেকো। সঙ্গে দুটি মেয়ে আছে। এমন লেঠেল সঙ্গে নেবে যারা দশজনের মহড়া নিতে পারে।

গোবিন্দ ঢালীও একটু অবাক হয়েছিল।

কর্তার হঠাৎ এই তীর্থযাত্রা সে বুঝতে পারে না।

বুঝতে যে সে কিছু পারে নি তা নয়, তবে চাকর, চাকরের মতই থাকা উচিত। এই ভেবে সে কর্তার নির্দেশই পালন করল।

সবচেয়ে খুশি হয়েছিল সরলা ও সুভদ্রা। শুনেই তারা লাফিয়ে উঠেছিল। নৌকায় করে তীর্থ করতে যাব? আঃ কি আনন্দ?

আর এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে হবে না। জলে জলে জীবন একাকার হয়ে যাবে। নৌকার মধ্যেই হবে দিন রাত্রি। কত দেশ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আবার কত দেশ পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব।

এ সব অনেক কথাই সরলার।

সরলার সরল সহজ আনন্দ প্রকাশে সুভদ্রাও না হেসে পারে না। তারও কৌতুক লাগছিল।

সত্যিই এই তীর্থ তাদের বদ্ধজীবন থেকে মুক্তি। ক'মাসের জন্যে শুধু, তবু এই পাওয়াই বা মন্দ কি?

এও কি কোনদিন পাবে তারা ভেবেছিল?

সুমন্ত, দুষ্মন্তও বাড়ীর ভেতর এসে বোনেদের সঙ্গে যোগ দিল। তাদের চোখে মুখে উত্তেজনা।

সুমন্ত গোবিন্দ ঢালীর কাছে লাঠি খেলা শিখছিল। সে একটা লাঠি সঙ্গে নিল।

দুষমন্ত অন্য কিছু না পেরে মরচে ধরা একটা ছোরা কোত্থেকে বের করে কোমরে গুঁজল।

তাই দেখে সরলা, সুভদ্রা হেসে কুটিকুটি।

সরলা বলল দুষ্মন্তকে—ঐ মরচে ধরা ছোরা দিয়ে তুই লড়তে পারবি?

দুষ্মন্ত রাগ রাগ মুখ করে বীরত্ব দেখিয়ে বলল—দেখবে যখন দুষমণ আসবে?

শত্রুকে দুষ্মন্ত দুষমণ বলেই উচ্চারণ করল।

দুষমণ কথাটা সে শুনেছিল গোবিন্দ ঢালীর কাছে। গোবিন্দ ঢালী যখন দাদাকে লাঠি খেলা শেখায় তখন দুষমণ কথাটা ব্যবহার করে।

সবারই মনে আনন্দ। নির্মলা, মহামায়ার মনে অবশ্য কিছুটা বিস্ময়। তাড়াতাড়ি সব গোজগাজ করে নিতে গিয়ে অযথা অনেক জিনিস ভাঙল, চুরলো। তাই তাঁরা বেজার। তবু তাঁরা খুশি এই ভেবে, অন্তত ক'দিন তো এক ঘেয়ে জীবন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

কিন্তু রাঘব চৌধুরীর মনে কোন শান্তি ছিল না। সে মুখ গম্ভীর, ভারী, থমথমে। তিনি যে কি—ভাবছিলেন কেউ জানে না।

গ্রামের দু একজন সামনে এসে বলল—হঠাৎ যে তীর্থ ভ্রমণ?

কিন্তু রাঘববাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর না নিয়ে সরে পড়ল!

রাঘববাবু শুধু ভয়ে গ্রামের গাছপাতার আড়াল দিয়ে অনেক দূর তাকাতে লাগলেন। আর কান পেতে শোনার চেষ্টা করলেন একাধিক ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যায় কিনা!

একবার ভাবলেন হয়ত ভুল।

যে সেনা এসে তাকে খবর দিয়েছে সে সেনা হয়ত অন্যমতলবে এসেছিল। নবাবী সেনা নবাবের ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করবে কেন?

কিন্তু কিছুই ভেবে পেলেন না, তাই গোবিন্দ ঢালীকে তাড়া দিলেন।

তিনখানি বজরা সাজান হল। একখানিতে রাঘব চৌধুরীর পরিবার। একখানিতে সাংসারিক জিনিস পত্তর। আর একখানিতে লেঠেলরা।

রাঘব চৌধুরী লেঠেলদের বেশ দেখে দেখে বজরায় তুললেন। তারপর নানাধরণের অস্ত্র তোলা হল। ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, ছোরা, মজবুত অনেক লাঠি।

মহামায়া বললেন—দাদা অনেক জিনিস পড়ে থাকল, আরও কিছু সঙ্গে নিলে হত না?

রাঘববাবু সে কথার জবাব দিলেন না।

মহামায়া আবার বললেন—বৌদি বলছিল, তীর্থ করতে যখন যাওয়া হচ্ছে তখন কাশী পর্যন্ত গেলেই ভাল হয়।

রাঘববাবু সে কথারও কোন জবাব দিলেন না।

তীর্থ করতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, তীর্থ করতে যাবার সময়ই এটা।

পড়ে থাকল বিরাট সৌভাগ্যের সব কিছু। একদিন এত মেহনতের সব কিছু

করা। আর এখানে ফিরতে পারবেন কিনা তারও কোন ঠিক নেই। ফেরার মতই ব্যবস্থা করে গেলেন। যদি মেয়ে দুটোর কোথাও কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে পারেন, চিরস্থায়ী যদি নাও পারেন, কলকাতায় যদুপতি হালদার আছেন তাঁর কাছে রেখে আসবেন। তাঁকে অনুরোধ করবেন, যেন মেয়ে দুটির বিয়ে দিয়ে দেন। টাকা যা লাগে দিয়ে আসবেন।

যদুপতি হালদারকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। সে মেয়ে দুটির অন্তত ভদ্রোচিত ব্যবস্থা করতে পারবে। এমনি একটা ধারণা নিয়েই রাঘববাবু নৌকায় উঠলেন।

নবাব ফৌজ অতদূর আর এগোয় না। এগোলেও যদুপতি হালদারের কাছে তাঁর মেয়ে আছে বুঝতে পারবে না।

তার পরেও অবশ্য অনেক কথা আছে।

কিন্তু সে সব কথা ভাবার মত তাঁর মনের অবস্থা ছিল না।

পড়ন্ত বিকেলের দিকে নৌকা ছাড়ল।

সূর্য তখন ডুবু ডুবু প্রায়। নদীর জলের ওপর আলো অন্ধকারের খেলা চলেছে।

নৌকায় বসে মহামায়া বললেন - দাদা, তীর্থযাত্রা করতে গেলে পুরুত ডেকে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে নিতে হয়, সে সব কিছু করে নেওয়া হল না।

বড় বড় তিনখানি বজরা নৌকা।

প্রথম বজরাটি রাঘব চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের।

সেখানে গোবিন্দ ঢালী বজরার মাথার ছইয়ে বসে লাঠি বাগিয়ে পাহারা দিতে লাগল।

তার কালো মজবুত তেল চকচকে শরীরের ওপর শেষ রোদ্দুরের ঝিলিক পড়ে আরও ভীষণাকৃতি দেখাতে লাগল।

রাঘববাবুও ছইয়ের বাইরে থাকলেন না। একবার ভাবলেন—থাকবেন। আবার কি ভেবে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

দুঃসাহস দেখানো ভাল কিন্তু দুঃসাহসের জের রাখা মুস্কিল। যদি সৈনিকের কথা সত্যি হয় তাহলে নিশ্চয় নবাব ফৌজ আজ চৌধুরী বাড়ী ঘেরাও করবে। রাঘব বাবুর মনে আছে সেদিন রাত্রের ইতিহাস।

সীতাকে ধরে নিয়ে যাবার সময়ে ফৌজেরা কি কাণ্ড করেছিল তিনি ঘরে বসে বসেই তা অনুমান করেছেন।

ওরা চলে গেলে দেখেও এসেছেন ঘটনাস্থল।

রাখাল ভট্টচার্যের সেই ভাঙা খড়োচালের কুঁড়েটা, যে রাখাল ভট্টচার্য পয়সা অভাবে কখনও মেরামত করতে পারে নি, সেটা ফৌজেরা কি ভাবে তচনচ করে গেছে।

তারও সাজানো বাড়ীটা হয়ত তাই করবে। সীতাকে পেয়েও তারা কোন যত্নের আশ্রয় নেয় নি, আর সরলা.সুভদ্রাকে না পেয়ে তারা কি কিছু আস্ত রাখবে ?

এ সব কথাই ছইয়ের মধ্যে বসে ভাবতে লাগলেন।

তারপর নবাব ফৌজ তাঁর পালানোর সংবাদ পেয়ে এই জলপথে আসবে।

হঠাৎ শিউরে উঠলেন রাঘববাবু।

আর শিউরে উঠে চিৎকার করে বললেন—গোবিন্দ, তোমার সাকরেদরা তৈরী আছে তো!

গোবিন্দ ছইয়ের ওপর থেকে সাড়া দিল—হ্যাঁ কর্তা।

গোবিন্দকে সরিয়ে নেবেন কিনা ভাবলেন রাঘববাবু।

গোবিন্দ চেনা লোক। হয়ত নবাব ফৌজ গোবিন্দকে চিনে তাঁর নিশানা করতে পারে কিন্তু গোবিন্দকে তিনি সরিয়ে নিলেন না।

গোবিন্দই একমাত্র বল ভরসা।

গোবিন্দ বাজপাখীর মতো চোখ তাকিয়ে আছে দূরে বহুদূরে। কোন সন্দেহ হলেই সে খবর জানাবে।

নবাব ফৌজ কি এতখানি করবে? রাঘববাবু নিজেকে প্রশ্ন করলেন। তাঁর পিছুতে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলবে!

ধরে ফেললে তিনি সহজে আত্মসমর্পণ করবেন না। যতক্ষণ পারবেন যুঝবেন। তারপর না পারলে মরবার আগে মেয়ে দুটিকে নিজের হাতে বধ করবেন।

হঠাৎ শিউরে উঠলেন রাঘব চৌধুরী।

ছইয়ের মধ্যে পাশাপাশি চারখানি ঘর। রাঘববাবু যে ঘরে বসেছিলেন সে ঘরে কেউ ছিল না।

পাশের ঘরেই ছেলেমেয়ে চারটি।

তাদের কথা এ পাশের ঘরে একটা কাঠের দেয়ালের ব্যবধানে ভেসে আসছে।

ওরা খুব জোরে জোরে কথা বলছিল।

রাঘববাবু কান পাতলেন।

সরলার গলাই সোচ্চার। সে খুব জোরে হাসছিল।

ছেলে দুটির কথাও শোনা যাচ্ছে।

সুমন্ত বলছিল—তোমরা কিছু ভেব না, ঢালীকাকা ছইয়ের ওপর আছে, আমি আছি এখানে, তারপর একটু চাপা কথা—আর বাবা তো আছেই. বাবার ঘরে গাদা গাদা সব অস্ত্র!

রাঘববাবু দেখলেন—তাঁর পায়ের সামনে পড়ে আছে চকচকে সব অস্ত্র। আলো অন্ধকারে ঝিলিক দিচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে।

একটি ধারাল কৃপাণ ধরনের অস্ত্র হাতে নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

তারপর সেটা রেখে দিয়ে আবার পাশের ঘরে কান দিলেন।

দুষ্মন্ত তখন বলছিল - তোমরা আছো, আমি নেই? আমারও কাছে অস্ত্র আছে।

এই বলে সে তার মরচে ধরা ছোরাটা কোমরের খাঁজ থেকে বের করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে সকলে হেসে ওঠে।

তাই দেখে দুষ্মন্ত ভীষণ রেগে যায়।

দুষ্মন্ত দাদার দিকে তাকিয়ে বলে—হুঁ দাদা লাঠি চালাতে পারবে না কচু! দাদা

তো একটা ভীতু। ডাকাত এসে পড়লেই দাদা ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলবে।

এসব ডাকাত নিয়েই আলোচনা। তীর্থ করতে যারা মাসের পর মাস জলে জলে ঘুরে বেড়ায়। তাদের ভয় শুধু ডাকাতদের। ডাকাতরা এই তীর্থযাত্রীদের কায়দায় পেলে ধন, প্রাণ কেড়ে নেয়। আর কত ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত দেহ এই নদীর জলে ভাসে।

তাই সবাই প্রাণে বাঁচবার জন্যে একদল লেঠেল সঙ্গে নেয়।

কিন্তু ওরা জানে না, ডাকাতদের ভয়ের চেয়ে যে আর এক ভয় রাঘব চৌধুরীকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তিনি তাদের সঙ্গেই মোকাবিলা করবার জন্যে এই সব সঙ্গে নিয়েছেন।

ওদিকে আর এক ঘরের মধ্যে মহামায়া ও নির্মলা। দুজনেই জানলা দিয়ে জলের দিকে তাকিয়েছিলেন।

এক সময়ে মহামায়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন - এই তীর্থযাত্রা যদি একটু শান্তির হত। মেয়ে দুটোকে পার না করে দাদা যে কেন হঠাৎ তীর্থযাত্রার মতলব করল?

তারপর একটু স্বরটা নামিয়ে নিয়ে বললেন বৌদি, ব্যাপারটা একটু কেমন মনে হচ্ছে—না?

নির্মলা শুধু মৃদু হাসলেন।

তুমি হেস না বৌদি। আমার সন্দেহ হচ্ছে। সীতাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, নবাব ফৌজ চৌধুরী বাড়ীতেও ঢুকবে। দাদা বোধ হয় জানতে পেরে পালিয়ে এল।

সে যদি এসে থাকেন তো ভালই হয়েছে। নির্মলা মুখ নামিয়ে বললেন।

মহামায়া অন্যমনস্কর মতো বললেন—হ্যাঁ, ভাল তো বটেই। কিন্তু—।

মহামায়া আর কিছু বললেন না। তাঁর মনে আবার ভয়টা জড়িয়ে ধরল। ভয়ে ভয়ে তিনি নদীর জলের দিকে তাকালেন।

বজরা চলেছে পালের হাওয়ায়। বেশ জোরেই চলেছে। পাশাপাশি অন্যান্য অনেক নৌকোও চলেছে। ঘোলা জলে ঢেউ উঠছে প্রচণ্ড। দূরে দূরে আকাশের সীমানা। ঘন গাছের সার দেখা যাচ্ছে। সূর্য ডুবছে সেই সারি গাছের মধ্যে। রক্তাভ সূর্যের আলো। যেন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে।

পাখীরা বাসায় ফিরছে। থমথমে নীল আকাশের কোলে তারা দল বেঁধে ঘুরছে।

সরলা তাকিয়েছিল জানালা দিয়ে। তন্ময় হয়ে গোধূলির আলো দেখছিল। দেখছিল জল, আকাশ। দেখে তার নিঃশ্বাস পড়ছিল।

ছোটবেলা কতদিন এমনি সে আকাশ দেখেছে। গোধূলির রঙ ফেনা দেখেছে—ছুটোছুটি করেছে গাছের তলা দিয়ে। আর আজ তারা বড় হয়ে গেছে। বড় হবার পর এ আকাশ যেন তার কাছে দুর্লভ ছিল।

চৌধুরী বাড়ীর অন্দরমহল দিয়ে যে আকাশ দেখা যেত, সে আকাশ বড়ই সঙ্কীর্ণ। তার বিশালতা না দেখলে আকাশ দেখার আনন্দ কোথায়?

ওঁকে কেউ বোঝে না। সবাই কেবল শাসন করে।

এই সরু, বড় হয়ে গেছিস্ ?

বিশেষ করে মা বলেন।

মার মনে তার জন্যে কত ত্রাস।

বড় হলে এই যে সাবধানতা, কেন সে বড় হল ?

অথচ তার মন তো বড় হয়নি। সে তো কোন বড় বড় কথা বলে না।

সরলা বজরার জানলা দিয়ে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল।

সুভদ্রাও সরলার পাশে বসেছিল। বসে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়েছিল।

সুভদ্রাও হয়ত একই কথা ভাবছিল কিন্তু তার ভাবনাটা বোঝা যায় না। হঠাৎ সে ফিরল সরলার দিকে।

সরলার প্রকৃতি চঞ্চল। বেশীক্ষণ তন্ময় হয়ে থাকতে পারে না। তাকে তন্ময় হয়ে থাকতে দেখেই সুভদ্রা তার কোমরে চিমটি কাটল।

কিরে, একেবারে যে কবি হয়ে গেলি !

সরলা সঙ্গে সঙ্গে ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে তার হারিয়ে যাওয়া স্বভাব ফিরে এল। খিল খিল করে হেসে উঠল নদীর স্রোতের মতো। পাশে এক কাঠের দেয়ালের ব্যবধানে মামাবাবু আছেন তাও তার মনে থাকল না।

সরলা হেসে বলল—কবিরা বুঝি এমনি ভাবুক হয়ে থাকে ? তারপর ঠোঁট উল্টে বলল—আমি মোটেই কবি হতে চাই না।

সুভদ্রা রাগ করল, রাগের ভঙ্গি মুখে ছড়িয়ে বলল—তা অতো হাসির কি হল ? এমন হাসিস্ যেন পাগল মনে হয়।

পাগল ?

সরলার আবার হাসি পেল কিন্তু সে হাসল না। শুধু ঠোঁট উল্টে বলল—পাগল হলেই বুঝি ভাল হত।

ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছিল।

সুমন্ত, দুষ্মন্ত কাগজ খুঁজে নৌকা বানিয়ে জলে নামাচ্ছিল। চোখে মুখে তাদের উত্তেজনা।

কোন্‌টা অনেকদূর চলে যাচ্ছিল। কোন্‌টা নিচে পড়তেই উলটে যাচ্ছিল। তারপর নৌকাডুবী হল।

দুষ্মন্ত নৌকা বানাতে পারে না। সে কাগজ যোগাড় করছিল, আর সুমন্ত বানাচ্ছিল।

সুমন্ত বানিয়ে সুমন্তই জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

দুষ্মন্ত দাদার কাছে একটা চাইছিল কিন্তু সে দিচ্ছিল না। দুষ্মন্তর ভীষণ ইচ্ছে সে নিজে একটা নৌকো ভাসাবে।

তারপর একসময়ে কাগজ ফুরিয়ে গেল। সুমন্ত দুষ্মন্তকে কাগজ আনতে বললো। কিন্তু সে আনলো না। বলল আমাকে দেবে না আমি কেবল কাগজ আনবো !

সুমন্ত হঠাৎ ছোট ভাইকে এক চড় কষিয়ে দিল।

দুষন্ত কাঁদতে গিয়ে বাবার কথা মনে পড়তে আর কাঁদল না। কিন্তু কোমরের প্যান্টের খাঁজে ঢোকান মরচে ধরা ছোরাটা বের করল।

সুমন্তর কাছাকাছি কিছু ছিল না। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

ছোটদি, বড়দি, দুষু আমাকে মেরে ফেলল।

সরলা, সুভদ্রা এদিকে আপন চিন্তায় বিভোর ছিল, সুমন্তের চিৎকার শুনে তারা দুজনেই তাকাল।

তখন দুষন্ত মরচে ধরা ছোরাটা ধরে ভায়ের দিকে চোখ পাকিয়েছে।

সরলা দুষন্তর অবস্থা দেখে হেসে বাঁচে না।

বীরপুরুষ, দেখ্‌, দেখ্‌, ভদ্রা, একটা মরচে ধরা ছোরা নিয়ে দুষু কি রকম তড়-পাচ্ছে।

সুভদ্রা সরলার কথায় কান দিল না।

সেও চোখ পাকিয়ে শাসনের ভঙ্গি করে বলল এই দুষু, বাবাকে বলে দেবো?

দুষন্ত ছোরা চালালে অনেকক্ষণই চালাতে পারত। হঠাৎ ছোরাটা প্যান্টের মধ্যে গুঁজে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল—এই তো তোর সাহস? এই সাহস নিয়ে আবার ডাকাতের সঙ্গে লাঠি খেলবি?

সরলা তখন হাসির দমকে কিছুতে হাসিকে চেপে রাখতে পারছে না। পেটে ব্যথা ধরে গেল। মুখ চোখ লাল হয়ে গিয়ে তার জল বেরিয়ে পড়ল।

পেট চেপে ধরে বলল—বাবাঃ, দুষুটা যা হয়েছে। ও বড় হলে ঠিক মামাবাবুর নাম রাখবে।



অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। যে আকাশ কিছুক্ষণ আগে নীল ছবি নিয়ে জেগেছিল তার বুকে শুধু কালোর পর্দা। দু একটা তারাকে ফুটতে দেখা গেল।

অন্ধকারে বজরা থামে নি। সামনের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। মাঝিদের কালো চেহারাগুলি অন্ধকারেই চলা ফেরা করছে।

গোবিন্দ ঢালী সেই অন্ধকারেই চেয়ে থেকে বাজপাখীর মত চোখ দুটি বার করে দিয়েছে। তার আগুনের ভাঁটার মত চোখ দুটি জলছে।

রাঘববাবু বেরিয়ে এলেন ছইয়ের মধ্যে থেকে।

থমথমে মুখ। গম্ভীর! চিন্তাক্লিষ্ট।

মুর্শিদাবাদ আসতে এখনও অনেক দেরী। মুর্শিদাবাদের পথটা পার হতে পারিলেই খানিকটা নিশ্চিন্ত কিন্তু যতক্ষণ না পার হন ততক্ষণ দুশ্চি[illegible]।

দুশ্চিন্তা ঠিক নয় আতঙ্ক।

নবাব ফৌজ চরমারিতে গিয়ে তাঁর দেখা না পেলেই আবার মোড় ফিরবে। সঙ্গে হাজীসাহেব নিশ্চয় থাকবেন। নিশ্চয় তিনি জলপথেই ছুটে আসবেন। কিম্বা মুর্শিদাবাদের কাছে এসে ধরবেন।

এইসব চিন্তা করতে করতে তিনি গোবিন্দ ঢালীর কাছে এগিয়ে এলেন। চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—মুর্শিদাবাদ পার হতে আমাদের কত দেরী?

গোবিন্দ ঢালী ভেতরের কথা কিছুই জানত না। কর্তার কথা শুনে চমকে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—মনে হয় রাত প্রভাত হয়ে যাবে।

শুনেই রাঘববাবু তাড়াতাড়ি আতঙ্কে বললেন—না, না গোবিন্দ, যে করেই হোক রাত্তি বারোটার আগেই আমাদের মুর্শিদাবাদ পার হতে হবে।

গোবিন্দ ঢালী চুপ করে রইল। চিরকাল প্রভুর ভালই সে চেয়ে এসেছে। প্রভুও তাকে কোন কথা কোন সময়ে গোপন করেন নি।

কিন্তু আজ তিনি যেন কি গোপন করছেন। তাই সে বলল—কর্তা, হাওযার বেগ নেই। জোরে চালানোও মুস্কিল। এত তাড়াতাড়ি কিছুতে মুর্শিদাবাদ পার হওযা যাবে না।

যাবে, যাবে। রাঘববাবু কেমন যেন অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তুমি মাঝিদের সেই কথাই বলো। জলু মিঞা আছে না ওধারে? ওকেই বলো।

গোবিন্দ চিৎকার করে বলল জলু মিঞা!

ওপাশ থেকে কে যেন সাড়া দিল—গোবিন্দভাই ডাকতিছ?

হ্যা, বজরা একটু জোরে চালাতে পারবে? নবাবঘাটটা তাড়াতাড়ি পার হতে হবে।

জলুমিঞা ওধার থেকে বলল—কেমন করে হবে গোবিন্দভাই? হাওয়ার যে কোন জোর দেখ্‌তিছি না। ধিকি ধিকি চললে কি নবাবঘাট এ রাতে পার হবে?

দু'একটা আরও পাল তুলে দাও না জলুমিঞা। নবাবঘাট পার হতেই হবে।

জলুমিঞা আর কোন কথার উত্তর দিল না। দেখা গেল আরও দুএকটা পাল তোলার নড়াচড়া শুরু হল।

রাঘব চৌধুরী তাকিয়ে রইলেন অন্ধকার নদীর দিকে?

অন্ধকারে জলের চেহারা যেন ঠিক সাপের গায়ের মতো।

জলের ঢেউ উঠছে। তার গায়ে আলোর ঝিলিক পড়ছে। ঠিক পুরো আলো এখনও জাগে নি। হয়ত এখুনি চাঁদ মেঘের ভেতর থেকে বাইরে আসবে। তার আগেই অন্ধকার মুছে যেতে শুরু করেছে। বজরাতেও দু'একটা আলো জ্বালা হয়েছে।

নির্মলা ও মহামাযা আহারের ব্যবস্থা করছিলেন। একটা উনুনের ওপর রান্না চড়িয়েছেন।

মাঝখানের বজরাটা একেবারে অন্ধকার। ঐ বজরায় আছে সাংসারিক জিনিসপত্তর। তিনমাসের রসদ। রসদ সঙ্গে নিয়েছেন রাঘব চৌধুরী মন্দ নয়। যা সামনে পেয়েছেন বজরায় তুলেছেন। কিছু ব্যবসার জিনিসও সঙ্গে নিয়েছেন। রেশম বস্ত্র

নিয়েছেন কিছু। যদি কোনরকমে এ যাত্রা উদ্ধার পান তাহলে কলকাতায় গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা ফাঁদবেন। ইংরেজরা মালের দাম দেয় ভাল।

জোনাথনসাহেব তাঁকে খালকাটায় যেতে বলেছে। ওখানে ডাচ্‌রাও যথেষ্ট প্রতিপত্তি করেছে। ডাচ, দিনেমার, পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ। তাদের সঙ্গে ব্যবসা করলে মোটা লাভ।

এখানে বসেও লাভ কম হত না। তবে হাজীসাহেবের অনুগ্রহে কিছু করতে ইচ্ছে করে না। যা নিয়েছেন তারই মাশুল দিতে এখন তাঁকে পালাতে হচ্ছে। এই যদি আগে জানতেন কখনও নিতেন না। মনে হয় যারাই সাহায্য নিয়েছেন, তারাই জাঁতিকলে পড়ে গেছে।

এই সব কথাই ভাবতে ভাবতে তিনি ছইয়ের মধ্যে ঢুকলেন।

বজরা এগিয়ে চলল আরও জোরে।

দুলতে লাগল বজরা। জল কেটে চলার শব্দও ভেসে আসতে লাগল। ওদিকে রান্নার শব্দ।

কে যেন গান গাইছিল ভাটিয়ালীর সুরে। সুন্দর গলা। সম্ভবত কোন মাঝি গান গাইছে।

রাঘববাবু তন্ময় হয়ে সেই গান শুনতে লাগলেন।

উদাসস্বরে মাঝি গাইছে, সে মন্‌পবনের নাও ভাসিয়ে কোন্ অচিন দেশে চলে যেতে চায়। তার এই দুনিয়া ভাল লাগ না। এখানে বড় ঈর্ষা, বড় যন্ত্রণা, মনের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। যেখানে মনের হদিশ পাওয়া যায় সেখানে সে চলে যাবে। সেখানে সুখ না পাক্ শান্তি তো মিলবে।

বজরার মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করছে। কেউ কোন কথা বলছে না। সবারই কানে মাঝির গান।

মাঝির নৌকা চলে গেল অনেকদূরে। গানের সুর কাছ থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। তবু রেশ ছড়িয়ে থাকল। সেই রেশেই সবাই আচ্ছন্ন।

ওপাশে রান্না করতে করতে নির্মলা মৃদুস্বরে মহামায়াকে বললেন মাঝিটার গানটা বড় অদ্ভুত। সমস্ত মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়।

মহামায়া জবাব দিলেন না। তিনি যেন কি ভাবছিলেন।

সরলা বলল সুভদ্রাকে।

লোক্‌টা কি মন নিয়ে গান গাইল রে? সুরটা আনমনে ধরে গুন গুন করে গাইতে লাগল।

দু এক কলি গেয়ে হঠাৎ হেসে বলল—না, ও মন না হলে গাওয়া যায় না।

সুভদ্রার মন তখন ভরে ছিল কি কথা ভেবে যেন। বোধ হয় ঐ মাঝির উদাস গানের সুর তাকে উদাসী করে তুলেছিল। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

সুমন্ত, দুষ্মন্ত দিদিদের কোলের কাছে বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছে।

রাত তখন বেশ গভীর হয়ে এসেছে।

অনেকেই ঘুমিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরাও জেগে নেই। রাঘববাবু একবার ভেবেছিলেন আসল কথাটা সবাইকে বলে দিয়ে জাগিয়ে রাখবেন। যদি নবাবফৌজ জলপথে এসে তাদের আক্রমণ করে তাহলে সবাইকে তো সামলাতে হবে। কিন্তু কি ভেবে ব্যাপারটা বলেন না। হয়ত এ তাঁর মামুলী আশঙ্কা। যতটা তিনি মনে করেছেন ততটা কিছুই নয়। শুধু শুধু সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ভয়ের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া।

শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা হলও তাই। বজরা বেশ জোরেই চলছিল। অনেক রাত্রে যখন বজরা নবাবঘাট পার হয়ে গেল তখন নবাব প্রাসাদের উঁচু গম্বুজটা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

ঘাটের পাশে দুটো বড মসজিদ, হালে নবাব সাহেব তৈরী করিয়েছেন।

নবাব সাহেব নবাবী পেয়ে শ্বশুরের অনেক কিছু পালটে ছিলেন। যে চল্লিশটি স্তম্ভের ওপর চেহেল সতুন প্রাসাদ, সেটারও নির্মাণ কৌশল পালটেছেন। তাছাড়া প্রাসাদের অনেক ঘরের কাঠামো রদবদল করে নিজের শিল্পী মনের নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন।

ঘাটের সেই দুটো বড় মসজিদ থেকে আলো এসে ভাগীরথীর জলে খেলা করছিল। ঘাটে ছিল কতকগুলি নবাবী পানসী। নবাবী পানসীর ধরণটা বড় অদ্ভুত। সামনের দিকটা সরু, পিছন দিকটা চওড়া। আর পানসির গায়ে নবাবী পাঞ্জার নকসা।

তাছাডা ঘাটে ছিল আরও দুটি বজরা। যে বজরার ছাদে বসে নবাব জলবিহার করতে যান। দূর থেকে ছাদের ওপর দেখা গেল, তখনও রক্ত ভেলভেটের ফরাস পাতা আর সেই ফরাসের ওপর কিছু ছেঁড়া ফুল, দোমড়ানো তাকিয়া, আর বাজনাগুলি গডাগডি যাচ্ছে। শুধু মানুষ থাকলেই বোধ হয় আবার জলসা শুরু হয়ে যেত।

এ সব দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট শুধু জোৎস্নার আলো এসে রাতের ঘোর অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়েছিল বলে।

নবাবঘাট আসার কিছুক্ষণ আগেই রাঘব চৌধুরী অবশ দেহ নিয়ে ভয়াবহ কিছু একটা প্রতীক্ষা করছিলেন।

লাটিটা বাগিয়ে ধরে কোমরে একটা ছোরা গুজে নিয়েছিলেন।

গোবিন্দ ঢালীকে ফিস ফিস করে বলছিলেন—গোবিন্দ, লেঠেলরা সব তৈরী আছে তো!

গোবিন্দ ঝাকড়া চুল দুলিয়ে মাথা নেড়েছিল।

তারপর রাঘব চৌধুরী আবার বলেছিলেন—গোবিন্দ, এই জায়গায়ই তো আজকাল বহু গৃহস্থের নৌকা ডুবে যায়।

গোবিন্দ ঢালী কোন কথার জবাব দেয় নি।

রাঘববাবু আবার বলেছিলেন—গোবিন্দ, যদি কোন পানসি বা অন্য কিছু আসতে দেখো তাহলে লেঠেলদের তৈরী থাকতে হুকুম দেবে।

তারপর নবাবঘাট এল। পারও হলে গেল বজরা।

রাঘববাবু একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আরামে শয্যায় শুয়ে পড়লেন। তারপর ঘুমিয়ে গেলেন।

ঘুমিয়ে গেলেন রাঘব চৌধুরী। তিনি জানলেন না এই ঘুম তার চির জীবনের জন্য মিলত যদি না সে রাত্রে হাজী আহম্মদ একটা অপবাদ থেকে বাঁচবার জন্যে সারা-রাত্রি ব্যয় করতেন। রাত্রিটা অন্য ব্যস্ততায় কেটে না গেলে তিনি ঠিক রাঘব চৌধুরীর ধ্বংস সাধন করতেন।

তবে সে কথা পরের।

হাজী আহম্মদ সীতার লেখা চিরকুট নিয়ে রওনা হবেন বলে তৈরী হয়েছিলেন। এক সময়ে রওনাও হলেন তিনি।

মনের মধ্যে জয়ের উল্লাস।

নতুন বেগম সাহেবা আপনার মেয়েদের আহ্বান জানিয়েছেন নবাব হারেমে নিয়ে যাবার জন্যে। আমি গোলাম, বেগমের ফরমাইস পালন করতে এসেছি।

এমনি একটা কৌশল মনে নিযে সীতার চিরকুটটার ওপর উজীর সাহেব পাঞ্জার ছাপ মেরেছিলেন।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। চৌধুরীসাহেব জানবে তার দুর্বুদ্ধির চরমতম উপহার। সীতা জেনে নিয়েছে তাঁর অন্যায়;

তারপর যাত্রা করেছিলেন

রাঘব চৌধুরী যদি বেগম সাহেবার সম্মান রেখে মেয়েদের সানন্দে না দেয় তাহলে তখন জোর করবেন। চৌধুরী হাবেলী আগুনে জ্বলবে। আর রাঘব চৌধুরীর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে তিনি প্রাসাদে ফিরবেন।

বেয়াদপগুলোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই মঙ্গলের। না হলে পরে মুস্কিলে পড়বার সম্ভাবনা।

এমনি সরিয়ে অনেকগুলি দিয়েছিলেন। রাঘব চৌধুরী তার মধ্যে একজন।

রাঘব চৌধুরী যদি তাঁর কথা শুনতেন তাহলে তিনিও তাঁকে বাড়তি আরও সুযোগ দিতেন।

সামান্য একটি নিজের বেটি। ও বেটি রোজ একটা করে পয়দা করা যায়। দিলে এই ধ্বংসের মুখে পড়তেন না।

এমনি হীরালাল সাহা। সেও বেয়াদপি করতে চেষ্টা করছিল। তবে তার মেয়ে নয়, বহিন।

আজ তার মুণ্ডটা, তার বহিনের চোখের সামনে টাঙান আছে।

মেয়েটা নবাবের সঙ্গেও বেয়াদপি করেছিল, আর তার শাস্তি ভায়ের ধড়হীন মুণ্ড দেখে পাগল হয়ে গেছে।

সামনে ফৌজ, পিছনে ফৌজ, হাজীসাহেব এগিয়ে চললেন চরমারির দিকে।

চরমারিতে ঠিক পৌছলেন প্রথম প্রহরে।

রাঘব চৌধুরী যদি ঘুমিযে থাকেন তাহলে জাগিযে তুলবেন। বড নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন চৌধুরীমশাই। পরের মেযেকে উৎসর্গ করে নিজে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

অন্ধকারে হাজীসাহেবের ঠোঁটের ওপর বিদ্রূপের হাসি ঝলকে ওঠে।

নবাবী আমার চাই। এর জন্যে যদি আরও নামতে হয় তিনি নামবেন।

দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এমনি ভাবেই তো একদিন মুঘলরা শয়তানি করে হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য কায়েম করেছিল। তিনি তো অতটা করতে চান না। শুধু বাংলার নবাবী। বড় গরীব তারা। এক মুঠি অন্নের জন্য এই দূর দেশে এসেছেন।

এখানে কেউ আপন নয়। সবাই সবার স্বার্থটাই দেখে। তিনি কেন নিজের স্বার্থ টা দেখবেন না? স্বার্থটা না দেখলে কতদিন আর এই গোলাম হয়ে থাকবেন।

হাজী আহম্মদ যখন সামনে পিছনে ফৌজ নিযে চরমারিতে এগিযে চলেছেন, তখন নবাবের অন্তঃপুরে সীতা তার পরিচারিকা চাঁপার সঙ্গে কথা বলছে।

চাঁপা একসময়ে বাইরে থেকে ঘুরে এসে বলল - বিবিজী, আপনি যে কাজের ভার দিযেছিলেন সৈনিক তা পালন করেছে! এই মাত্র আখতার ফিরে এসে আমাকে জানালো—চৌধুরীসাহেব তাঁর পরিবার নিযে পালাচ্ছেন।

এই কথা বলে চাঁপা মাথা নত করল। তার গণ্ড রাঙা হযে উঠল একটা কথা ভেবে।

আখতারটা বড দুষ্টু। কিছুতে রেহাই দিল না। বলল—তোমার কথা রেখেছি চাঁপা বিবি, বড পরিশ্রম হযেছে। এত জোর ঘোডা ছুটিয়ে এসেছি যে চোখে কানে দেখতে পাচ্ছি না।

তখন কি জানা গেছল যে এর পিছনে অন্য অর্থ আছে?

চাঁপা মাথা নত করে বলেছিলো - আহা, তাহলে বড় পরিশ্রম হযেছে। তারপর সলজ্জ হযে বলেছিল - সুদশুদ্ধ কোন এক সময়ে শোধ করে দেব।

কিন্তু আখতার এমন, পরে কিছু বাকী রাখতে চায় নি। এগিয়ে এসে হঠাৎ বুকে চেপে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইযে ছিল।

আখতারের সেই বলিষ্ঠ ঠোঁটের তাপ এখনও চাঁপার কোমল ঠোঁটে।

চাঁপা মুচকি মুচকি হাসছে দেখে সীতা অন্য কথা ভাবে কিন্তু সে তখন সরলা, সুভদ্রার কথা ভাবছিল, নাহলে জিজ্ঞেস করত—চাঁপা হঠাৎ তুই হাসছিস্ কেন রে?

সীতা ভাবছিল। ভাবছিল উজীরসাহেব যখন গিয়ে দেখবেন চৌধুরীমশাই তাঁর পরিবার নিয়ে পালিয়েছেন তখন তিনি কি করবেন?

শিকারী যেমন শিকার হাতছাড়া হলে পালিয়ে আসে তেমনি কি পালিয়ে

আসবেন।

সীতা ভাবে তার ঘরে বসে। তার পরনে মুসলমানী পোষাক। সামনে বাঁদী মোতায়েন। এর দুদিন আগে সে পরিত্যক্ত গোয়ালঘরে একঘরের মত জীবন যাপন করছিল। অথচ এই দুদিন পরে জীবনের কি অদ্ভুত পরিহাস!

কিন্তু নিজের জন্যে আর সে ভাবে না। ভাবনার কিছু নেই। অন্য দুটি মেয়ের জন্যে সে ভাবতে লাগল।

এখানে এসে সে দেখেছে, উজীরসাহেব এখানেই সব। তিনি যা করবেন, নবাব তাতেই সায় দেবেন। ন্যায় অন্যায় বিচার করবেন না।

উজীরসাহেব রাঘব চৌধুরীকে না পেলে ঠিক তাঁর পিছনে ধাওয়া করবেন।

চাঁপা সামনে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ সে চাঁপার দিকে তাকিয়ে বলল– চাঁপা আখতার তোর কথা খুব শোনে?

চাঁপা লজ্জিত হয়।

বল্ না, তাহলে তাকে আর একটা কাজের ভার দি।

চাঁপা মৃদু কণ্ঠে বলে—বলুন না বিবিসাহেবা, সে আমার সব কথাই রাখে।

তাকে আর একবার সেই গ্রামে যেতে হবে। তুই নিশ্চয় বুঝতে পারছিস্ আমি দুটি মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে এমনি করছি।

চাঁপা কোন উত্তর দেয় না। হুকুমের অপেক্ষায় থাকে।

আখতারকে আর একবার পাঠায় সেই চরধারিতে।

তারপর সীতা আর একটু ভাবে। ভেবে বলে, উজীরসাহেবকে কিছু একটা মিথ্যে কথা বলে ফিরিয়ে আনতে হবে কিন্তু সে মিথ্যে কথাটা কি?

চাঁপা দাঁড়িয়ে থাকে তার মনিবানীর সামনে।

সীতা পালঙ্কে বসে পা ছড়িয়ে দিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মতলব মাথায় আসতে বলে—হাজীসাহেবকে কোন অপবাদের কথা শুনিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর নবাব সেই অপবাদ দিয়েছে।

হঠাৎ সীতা পালঙ্ক থেকে নেমে চাঁপাকে দাঁড়াতে বলে সে বেরিয়ে যায়। চলে যায় রঙমহলে।

রঙমহলে তখন নাচ, গান চলেছে। নবাব বসে বসে সরাবের পেয়ালা হাতে তা উপভোগ করছেন।

সীতা প্রথম দর্শনে নবাবের খানিকটা প্রিয় পাত্রী হয়েছিল। একদিন উপভোগের পর নবাব তাকে ত্যাগ করতে পারেন নি।

তাই নবাবের কিছুটা তাঁর প্রতি আকর্ষণ ছিল। সীতা সেটা জানে।

সেই ভেবেই গর্বিতা রমণী এগিয়ে গেল রঙমহলের মধ্যেই এবং পাশে বসে একটা মিথ্যেকে সাজিয়ে নবাবের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিল।

উজীরসাহেবের নামে অপবাদ! নবাব তখন ঠিক হুঁশের মধ্যে ছিলেন না, থাকলে তিনি চমকে উঠতেন।

আখতার আবার যাত্রা করল সেই চরমারির দিকে।

কিন্তু চরমারিতে যখন সে পৌছল, দেখল চৌধুরী হাবেলী আগুনে জ্বলছে।

সে এক বীভৎস কাণ্ড। গ্রামের লোকের পরিত্রাণ নেই। নবাব ফৌজ যাকে পারছে তাকে কাটছে, তার বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে তচনচ করছে।

উজীরসাহেব তারই মধ্যে কালো আলখাল্লায় দেহ আবৃত করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

জেনে নিয়েছেন রাঘব চৌধুরী কোন্ দিকে গেছে।

নদীর দিকে গিয়ে ঘাটে যতগুলি রাঘব চৌধুরীর বজরা ছিল সব আগুনে জ্বালিয়েছেন। নদীর দিকেই রাঘব চৌধুরী ব্যবসার জিনিস পত্রের গুদাম ছিল তাতেও আগুন দিয়েছেন।

কেউ বাধা দেয়নি। যাদের রাঘববাবু দেখবার জন্যে বলে গিয়েছিলেন তারা এতটা ভাবে নি, তারা এই দেখেই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে লম্বা-চম্পট। তবে অনেকেই লম্বা-চম্পট দিতে পারল না। ফৌজের কৃপাণের তলায় চিরশান্তি লাভ করল।

হাজীসাহেবের তবু রাগ কমল না। তাঁর মনে সন্দেহ জমল, নিশ্চয় কেউ রাঘব চৌধুরীকে খবর দিয়ে গেছে।

কিন্তু কে সে? কার এত স্পর্দ্ধা!

হঠাৎ চমকে উঠলেন সীতার কথা ভেবে। কাফের মেয়েরা বড় ধূর্ত। চিরকুট লিখে দিয়ে বোধ হয় নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। তারপর কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে রাঘব চৌধুরীকে সাবধান করে দিয়েছে।

কিন্তু কে এল রাঘব চৌধুরীর কাছে? তবু চিন্তা ভাবনা ছেড়ে আগে রাঘব চৌধুরীর বজরা আটক করবেন বলে মনস্থ করলেন।

এখুনি যেতে হবে মুর্শিদাবাদে এবং সেই মুর্শিদাবাদে ফেরবার জন্যে তৈরী হলেন। উন্মত্ত ফৌজকে একত্রিত করলেন, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

আখতার বীভৎস কাণ্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল, সে ভুলে গেছিল নবাব সাহেবের নির্দেশ তার কাছে আছে।

সে জানত চাঁপার হাত দিয়ে নবাবসাহেব তাকে নির্দেশই দিয়েছেন। পাঞ্জার ছাপ ছিল সেই নির্দেশে কিন্তু নির্দেশে কি ছিল জানত না।

উজীরসাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে সে তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এগিয়ে এল।

আখতার চাঁদনী আলোয় কুর্নিশ করে বলল—নবাবসাহেবের এক এত্তেলা!

আখতারের মুখের দিকে তাকিয়ে হাজীসাহেব মশালের আলোয় নবাবসাহেবের ছাপ মারা নির্দেশটা পড়লেন। তাঁর মুখের ওপর ভয়ের ছাপ পড়ল।

'আপনার বহু গলতি আমি সহ্য করেছি আর নয়। আপনি যেখানেই থাকুন আমার সঙ্গে দেখা করবেন। উচিত জবাব না পেলে আপনাকে উজীরের পদ থেকে বহিষ্কৃত করতে বাধ্য হব।'

হাজীসাহেবের মনে পড়ল, নবাবী পাবার সময়ে সুজাউদ্দিন কি প্রতিজ্ঞা

করেছিলেন।

কিন্তু তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। ভয় যে পেয়েছেন তাও প্রকাশ করলেন না। এগিয়ে চললেন ফৌজের আগে আগে মুর্শিদাবাদের দিকে। যখন প্রাসাদে গিয়ে পৌছলেন তখন নবাব সীতার ঘরে।



সীতা জানে উজীরসাহেব এখুনি আসবেন। এসে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন। তাই নবাব যাতে দেখা না করেন সেই জন্যে সে তার নারী ঐশ্বর্যের সবকিছু ছলাকলা দিয়ে নবাবকে বশীভূত করছিল।

তবু এক সময়ে উজীরসাহেব এলেন, নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

সীতা জানত না নবাব আর উজীরসাহেবের সম্বন্ধ। নবাব যে উজীরকে ছাড়া এক পাও চলতে পারেন না তা তার জানা ছিল না।

সীতা বলল—নবাবসাহেব, মেরা বহুৎ মেহেরবানী। আপনি এখন উজীরসাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন না।

তারপর মাথা হেঁট করে বলল—এখন এই পেয়ারের সময়ে কি চলে গেলে ভাল লাগে?

নবাব হাসতে হাসতে বললেন—বহুৎ সুক্রিয়া। আমি এখুনি চলে আসছি। উজীরসাহেবে কি বলছেন শুনেই চলে আসব।

সীতা পারল না নবাবকে আটকে রাখতে। তবে ঘটনার মোড় যে আর একদিকে ফিরে যাবে তাও সে স্বপ্নে ভাবেনি। ভাবলে আর নিশ্চিন্ত হয়ে পালঙ্কে বসে পা দোলাত না।

উজীরসাহেবের সামনে তখর নবাবসাহেব।

উজীরসাহেব পাঞ্জার চাপ মারা নবাবের নির্দেশটাই নবাবের হাতে দিলেন।

উজীরসাহেবের মুখ গম্ভীর।

নবাব নেশায় মাতোয়ারা ছিলেন। তবু নির্দেশটা পড়ে চমকে উঠলেন।

উজীরসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—এ তো আমারই নির্দেশ দেখছি কিন্তু আমি তো এমন ধরনের কথা বলতে পারি না।

উজীরসাহেবের তখন অগ্নিমূর্তি।

তাহলে কার এত বড় সাহস এই নির্দেশ জাল করে পাঠায়?

নবাবের চোখের ওপর থেকে তখন নেশার আমেজ ফিকে হয়ে গেছে। একটু ভেবে

বললেন -মনে হচ্ছে এক আওরত রঙমহলে গিয়ে আমাকে দিয়ে কি যেন লিখিয়ে নিয়েছিল।

তারপর হঠাৎ বললেন—উজীরসাহেব, মেহেরবানী করে আপনি একটু দাঁড়ান।

কথা হচ্ছিল সীতার ঘরের, সামনেই।

নবাবসাহেব সীতার ঘরে ঢুকে বললেন—আওরত, তুমি আমাকে ভুলিয়ে একটা খত লিখিয়ে নিয়েছিলে।

সীতা ঘটনার গুরুত্বটা বুঝতে পারে নি। তাই সত্যি কথাই বললো।

কিন্তু নবাব রেগে গেলেন।

বললেন তুমি উজীরসাহেবের বিরুদ্ধে এসব লিখেছিলে কেন?

সীতা জবাব দিতে পারে না, মাথা নত করে।

তখন উজীরসাহেব ঘরে ঢুকে এসেছেন।

তিনি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললেন আওরত কেন করেছে আমি জানি। আওরত বাঁচাতে চেয়েছে রাঘব চৌধুরীর দুটি মেয়েকে। তাই প্রথমে পাঠিয়েছিল কাউকে তাঁর কাছে। রাঘব চৌধুরী সেই সংবাদের ওপর ভর করে পালিয়ে গেছে। দ্বিতীয়, রাঘব চৌধুরীর বজরা পাছে ধরে ফেলি এইজন্যে নবাবের নির্দেশ পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

নবাব শুনে বললেন—এ বহুৎ বড হুঁশিয়ার আওরত। একে জিন্দা রাখা উচিত নয়। শেষে নবাবী মসনদ নিয়ে চক্রান্তে যোগ দিতে পারে।

এই কিছুক্ষণ আগে নবাব সীতার কোলে মাথা দিয়ে কত জাদা জাদা সুখের কথা বলছিলেন।

সীতার চোখে জল এল কঠিন প্রাণ নবাবের নির্দেশ শুনে।

হাজীও নবাবকে সমর্থন করলেন। বললেন—শুধু এ আওরতই নয় নবাবসাহেব, এর মধ্যে মনে হয় আরও দুজন আছে।

চাঁপা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মনিবানীর আদেশের জন্যে অপেক্ষায় ছিল।

হঠাৎ হাজীসাহেব তাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে বললেন—এই বাঁদীও একজন বিশ্বাসঘাতক। আর একজন সেনা বিশ্বাসঘাতক যে আমার কাছে নির্দেশ নিয়ে গিয়েছিল, তাকে আগেই আটক করেছি।

আপনি যা হয় ব্যবস্থা করুন উজীরসাহেব, আমার আর এসব ভাল লাগছে না। এই বলে নবাবসাহেব অন্যত্র চলে গেলেন।

আর হাজী সীতার সামনে দাঁড়িয়ে যেন সাপের ফণার মত দুলতে লাগলেন।

সীতা বুঝতে পারল তার অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন কিন্তু আশ্চর্য, তার চোখে এতটুকু জল ছিল না। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে বলল—শয়তান, পারলাম না আর একটু বুদ্ধি খরচ করতে। তাহলে আর সামনে দাঁড়িয়ে এমনি মাথা দোলাতে হত না।

হঠাৎ হাজী আহম্মদ গর্জে উঠে বললেন—রক্ষী, এই বেউকুব, বেসরম আওরতকে এখুনি জল্লাদের কাছে নিয়ে যাও।

রক্ষী এসে সীতাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। চাঁপাও চলল তার সঙ্গে

সেই রাতেই শেষ হয়ে গেল সীতা ও চাঁপার জীবন।

প্রভাতে তাদের মৃতদেহ ভাগীরথীর জলেই ফেলে দেওয়া হল।



আর সেই ভাগীরথী দিয়েই চলেছিলেন রাঘব চৌধুরী।

রাত শেষ হয়ে প্রভাতের আলো ফুটেছে। গত রাত্রি ছিল বড় দুর্ভাবনার রাত্রি।

না, রাত্রি কেটেছে নির্বিঘ্নে। রাঘববাবু ভাবনা শূন্য হয়েছেন।

তিনি এবার তীর্থযাত্রার কথাই ভাবছেন।

মেয়েদের বললেন—তোরা মাঝে মাঝে বাইরে এসে দাঁড়া।

চারিদিকে শুধু জল। জলে অসংখ্য ঢেউ। পিছনে, সামনে বহু বজরা, পানসি, নৌকা। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে।

প্রভাতের মিষ্টি আমেজ কেটে গিয়ে সূর্যের আলো ফুটল।

সরলা, সুভদ্রা বাইরে এসে দাঁড়াল।

কত নাম না জানা পাখী উড়ে চলছে। বজরার মাথা থেকে পাল নামানো হয়ে গেছে।

পিছনের বজরা থেকেও জোরে জোরে কথা ভেসে আসছে।

লেঠেলরা কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতার কাটছে। হৈ হৈ চিৎকার উঠেছে। গোবিন্দ ঢালীও ওপাশের বজরায় চলে গেছে।

রাঘববাবুও দাঁড়িয়েছিলেন সরলা, সুভদ্রার পাশে।

ওরা অবাক হয়ে দেখছিল আকাশ, জল, প্রকৃতি।

সরলার চোখ দুটিতে বিস্ময়ের ঘোর।

রাঘববাবু তার দিকে তাকিয়েই বললেন—কেমন লাগছে সরু?

সরলা মামাবাবুর দিকে তাকায়। তার মুখে কথা যোগায় না।

তার চোখ দুটি দেখেই রাঘববাবু বোঝেন সে চোখে বিস্ময়ের ঘোর।

গতরাত্রে এই রাঘব চৌধুরী তৈরী ছিলেন, যদি শোনেন ফৌজের পানসি এগিয়ে আসছে তাহলে ধরা দেবার আগে মেয়ে দুটিকে খুন করবেন।

ছোরাও বাগিয়ে বসেছিলেন সারা রাত। ঘুমন্ত মেয়ে দুটির ফুলের মত মুখের দিকে চেয়ে তার কান্না পেয়েছিল। সে সব অবস্থা চলে যেতে এদিন তিনি আরও স্নেহসিক্ত হয়ে উঠলেন।

ভেতরে নির্মলা, মহামায়ার কাছে গেলেন।

তাদের সঙ্গে কোন্ কোন্ তীর্থ পর্যটন করবেন তার বিষয়ের একটা ঘনিষ্ঠ আলোচনা

করলেন। আলোচনা করার সময়ে তার প্রফুল্ল ভাবটাই বিশেষ করে প্রকাশ হল।

নির্মলা স্বামীর এই সহজ সুন্দর আলাপে তাঁরও আলাপের উৎসাহ জাগল। তিনি ননদের সামনে কিছু কিছু আলোচনায় যোগ দিলেন।

নির্মলার ইচ্ছে কাশী পর্যন্ত গেলে কেমন হয়? যখন তীর্থ করতে বেরনো হয়েছে তখন সব তীর্থ শেষ করাই ভাল।

রাঘববাবু নির্মলার প্রস্তাবটা শুনে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—এবারে আর সেটা হবে না। ফিরে গিয়ে মেয়ে দুটোকে পার করি। ব্যবসার আর একটু উন্নতি হোক তারপর গেলেই চলবে।

ফিরে যাবেন রাঘববাবু। ফেরার ইচ্ছে নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। অথচ যদি জানতে পারতেন তার কত মেহনতের সংসার, পূর্বপুরুষের রক্ত জল করা চৌধুরী প্রাসাদ। না জানার কোন উপায়ও তার ছিল না। এতটা তিনি ভাবেন নি। যে তার অবর্তমানে তাঁকে না পেয়ে হাজীসাহেব তার সর্বস্ব ধ্বংস করবে।

তিনি যখন নৌকায় বসে ফেরার কথা ভাবছেন।

তখন চরমাঝির সেই চৌধুরী প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের সামনে গ্রামের পলায়িত লোক। যারা পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছে তারা জড়ো হয়েছে চৌধুরী প্রাসাদের সামনে।

আলোচনা হচ্ছে—ঐ জন্যে চৌধুরীমশাই তাড়াতাড়ি পালালেন। চালাকি করবেন না কেন? ডাকাতের বংশ তো।

সীতার কাহিনীও তখন অনেকের শোনা হয়ে গেছে।

সীতাকে যে চৌধুরীমশাই নিজের মেয়েদের বাঁচানোর জন্যে দিয়েছেন তাও কারুর অজানা নেই।

কে এক কালো আলখাল্লা পরা ফকির লোক চিৎকার করে এসব বলেছে।

লোকটি আরো বলেছে—তোমরা জানো, তোমাদের গ্রামের এই এতবড় লোকটা আসলে একটা ধূর্ত শয়তান। আর কখনও ফিরলে তাকে জায়গা দিও না।

আর কখনও ফিরলে? ফেরার জায়গাও আর কিছু ছিল?

চৌধুরী প্রাসাদের সবকিছু আগুনে পড়ে ভস্মীভূত। শুধু দাঁড়িয়ে আছে পোড়া কালো কালো থামগুলি। তখনও ধোঁয়া উঠছে ভেতর থেকে। কেউ কেউ ভেতরে ঢুকে পড়ল। যদি কিছু পোড়ার ভেতর থেকে উদ্ধার করা যায়। সোনা দানা তো পোড়ে না আগুনে।

সেই আশায় ঢুকে পড়ল অনেকে।

যে চৌধুরী প্রাসাদে ঢোকা একটা স্বপ্নের মত ছিল, কেউ কখনও দেখতে পায়নি ভেতরটা। ভেতরটা দেখে হাঁ হয়ে গেল।

পেলও অনেকে অনেক কিছু। যা পোড়ে না, কিম্বা আধপোড়া। বহু ভাল কাপড় চোপড়, দু একখানা সোনার গহনাও কেউ কেউ পেয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ে রাঘব চৌধুরী এসে বজরার বাইরে দাঁড়ালেন।

বজরা চলেছে পালের হাওয়ায়।

রোদ্দুর ঝিলমিল করছে চারিদিকে।

সরলা, সুভদ্রা ভেতরে ঢুকে গেছে।

গোবিন্দ ঢালী আবার এসে বসেছে বজরার মাথায়। তার তেল্ চকচকে শরীরটা রোদের আলোয় আরও তেলাক্ত দেখাচ্ছে।

দু'পাশে কত গ্রাম, কত বনবাঁদাড়। কোন কোন ঘাট কত সরব।

আবার কোন ঘাট একেবারে নীরব। সেখানে কোন প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। দূর থেকে শোনা যায় মন্দিরে সকালের পুজো হচ্ছে, তার শাঁখ ঘণ্টা নিনাদ। আবার কোথাও দেখা যায় নদীর ধারে মরা পুড়ছে। শ্মশানের চুল্লি থেকে ধোঁয়া উঠে আকাশ বাতাস কালো হয়ে যাচ্ছে।

মড়া আসছে খাটে করে। মুখে হরিধ্বনি। সঙ্গে প্রিয়জনরা কাঁদতে কাঁদতে আসছে।

ফাগুন মাস। বসন্তের বাতাস বইতে শুরু করেছে। গাছে গাছে নতুন সাড়া জাগতে শুরু হয়েছে।

বজরা থেকে সেই সব দেখা যায়। কত রংবেরঙের পাখী উড়ে চলে। সুমন্ত, দুষ্মন্ত চিৎকার করে। ওটা কি পাখী?

নিশ্চয় ময়না, না শালিখ।

রাঘবাবু হাসেন ছেলেদের কথায়। আগের গাম্ভীর্য আর নেই। বরং অনেক সহজ হয়েছেন। মনের মেঘ অনেক কেটে গেছে।

বললেন—ওটা ময়না শালিখ নয়, বুলবুলি।

এইসব আলোচনার মধ্য দিয়েই সারাদিন কাটল।

কথা ছিল কৃষ্ণপক্ষে বজরা চলবে না, শুক্লপক্ষে বজরা চলবে।

সাধারণত এই নিয়ম। তবে রাঘববাবু ঠিক করেছিলেন জলে জলে না ঘুরে কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন বসে থাকবেন।

কলকাতা থেকে দেশের হালচাল দেখে তারপর আবার চরমারিতে ফিরবেন।

অবশ্য তার মধ্যে যদি মেয়ে দুটির কোথাও ব্যবস্থা হয়ে যায় পাকা করে ফেলবেন। আর না হলেও যদুপতি হালদারের কাছে রেখে আসবেন।

মহামায়া, নির্মলাকেও এক সময়ে সেই কথা বললেন।

মহামায়া শুনে খুব খুশি। মহামায়া বললেন—তুমি বাঁচালে দাদা। নবাবের ভয়ে আমার ঘুম আসে না।

রাঘববাবু আর কোন কথা বৌ বা বোনের কাছে ভাঙলেন না।

সরলা ও সুভদ্রা সেখানে বসেছিল। তারা লজ্জায় মাথা নত করল।

সরলার আজকাল একটু একটু লজ্জা করে।

আগে যে সে নিলর্জভাবে দুম্‌দাম্ কথা বলত, সেটা আর বলে না।

বরং সুভদ্রাই বলে। সুভদ্রাই আজ বজরার পাটাতনে দাঁড়িয়ে সরলাকে মৃদুস্বরে

কেঁপেছিল।

একটা অচেনা ঘাটে একটি যুবক, দেখতে সত্যিই সুন্দর, স্নান করছিল। সুভদ্রা অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিল।

সরলাও ছিল; তবে তার দৃষ্টি অন্যত্র। সে ছেলেমানুষের মত রৌদ্রের রঙ ফেরা দেখছিল। নদীতে মাছ ধরছিল জেলেরা; সেই দিকে তাকিয়েছিল। একখানি বিশেষ ধরণের জাহাজের প্যাটানের বজরা যাচ্ছিল, সেই বজরা থেকে সাহেব ধরণের কতকগুলি লোক লুব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল, সেইদিকে চেয়েছিল সরলা।

হঠাৎ সুভদ্রার ডাকে সরলা তার দিকে ফিরল। সুভদ্রা তখন সেই যুবকটিকে দেখে মনে মনে রাঙা হয়েছে। রাঙা ভাবটা মনের মধ্যে আরও রাঙিয়ে সরলার দিকে ফিরে বলল—সরু, ওকে তোর পছন্দ হয়?

সরলা সেই যুবকটিকে দেখল। তখন যুবকটি নদীতে ডুব দিয়ে ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছে। জলসিক্ত বসন। উদোম উর্ধ্বাঙ্গ। গৌরবর্ণ দেহ, প্রকাণ্ড বক্ষ। বক্ষে রোমরাশি পৌরুষের চিহ্ন বহন করছে।

যুবক কি যেন চিৎকার করে বলছিল। সম্ভবত গঙ্গাস্তোত্র। গলায় উপবীত। ব্রাহ্মণ সন্তান।

সরলা একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে তারপর অদ্ভুত ভঙ্গি করে মুখ টিপে হাসল। বলল—দিদি, মামাবাবুকে বলবো? এটা কোন্ গ্রাম? ঐ যুবকের পরিচয় কি?

সুভদ্রা দেখল ফাঁদে সেই পড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাঁচবার জন্যে বলল—আহা, আমি যেন আমার জন্যে বলছি। তোর যদি পছন্দ হয় দেখ্। তাহলে বাবাকে আমি বলি।

দুই বোনের মধ্যে লেগে গেল হাসাহাসি, ইয়ার্কি।

তবু সরলা আগের মতো অত অবুঝ হল না। মাঝে মাঝে সেও চোরা চাউনিতে তাকাতে লাগল।

যুবকটি উদাত্তস্বরে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করতে করতে গাছের ফাঁকে মিলিয়ে গেল। ও জানল না তাকে নিয়ে একটি অচিন দেশের বজরার দুটি মেয়ে কত মিষ্টি স্বপ্নের জাল বুনলো।

তারপর রাত্রি এসে আবার সবকিছু অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিল। একসময়ে চাঁদের আলো ফুটল।

আবার বজরা চলতে লাগল।

গোবিন্দ ঢালী সারা রাত্রিই বজরার মাথার ওপর বসে পাহারা দেয়। রাঘববাবুর আর কোন ভয় নেই।

তবে ডাকাতের ভয় মাঝে মাঝে করে। নদী পথে ডাকাতেরা মাঝে মাঝে গৃহস্থের সবকিছু লুঠ করে সর্বনাশ করে! আর এটা করে এইরকম রাত্রিবেলা।

গোবিন্দ ঢালী সেইজন্যে পাহারা দেয়। রাঘববাবু এসব নিয়েও ভাবেন না। ডাকাত যদি পড়ে তবে লেঠেল আছে সঙ্গে অনেক। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ছইয়ের

মধ্যে নিদ্রা যান।

নবদ্বীপ আসতে আর একরাত্রি। কিন্তু সেই নবদ্বীপ আসার আগের দিন।

সেদিনও নিশুতি রাত্রে বজরা চলেছিল জ্যোৎস্নার আলোয় স্নান করে। গোবিন্দ ঢালী ছইয়ের মাথায় বসে পাহারা দিচ্ছিল। তার চোখে ঘুম নেই।

সে কোন সময়েই ঘুমোয় না। কখন ঘুমায় তাও কেউ জানে না। আর রাত্রিবেলা তার চোখ দুটি জ্বলে যেন ক্ষুধিত নেকড়ের মতো।

সে সেই আগুনের মত চোখ নিয়েই দৃষ্টি পাকিয়ে লাঠি হাতে বসেছিল।

রাঘববাবু কিছুক্ষণ ছিলেন গোবিন্দর পাশে দাঁড়িয়ে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেছেন। নিজের ঘরে গিয়ে দেখেন নির্মলাও তাঁর ঘরে এসেছে।

নির্মলা যেন আজও সেই নতুন বৌয়ের মত লজ্জাবতী।

রাঘববাবু তাঁকে দেখে শুধু হাসেন!

তারপর নির্মলাকে পাশে নিয়ে তিনি অনেক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন।

ওপাশের ঘরে সরলা, সুভদ্রা। মহামায়ার পাশেই নির্মলা শোয়। কিন্তু নির্মলা আজ না শুতে তিনি সুমন্ত, দুষ্মন্তকে নিয়ে শুয়ে পড়েন।

অনেক রাত্রে। শেষ বজরার মধ্যেও নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে কিন্তু ওখানে কজন লেঠেল জেগে আছে গোবিন্দ ঢালী জানে। গোবিন্দ ঢালী তাকিয়ে ছিল সামনে পিছনে বহুদূরে।

মাঝে মাঝে মেঘের মধ্যে চাঁদ হারিয়ে যাচ্ছিল। তাই কিছু আলোছায়ার সৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝিরা তারই মধ্যে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ গোবিন্দ ঢালী চিৎকার করে উঠল।

কে রে তোরা বটেক? আর যদি একটু এগোবি তাহলে জান নিয়ে ফিরবি না।

তার চিৎকারটা নিস্তব্ধ রাত্রে যেন বজ্রের মতো প্রতিধ্বনি হয়ে উঠল কিন্তু গোবিন্দ ঢালী চিৎকার করে থামল না, নেমে লাফিয়ে পড়ে লাঠি ঘোরাতে লাগল।

ততক্ষণে ঝাঁক ঝাঁক সরু ধরণের ছিপের মত নৌকা সারি বেঁধে এগিয়ে এসেছে। ওপাশের বজরার লেঠেলরাও সজাগ হয়েছে।

এদিকে রাঘববাবু গোবিন্দর চিৎকারে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যেতে সজাগ হয়ে উঠলেন। নির্মলা পাশে রাঘববাবুকে জড়িয়ে ধরে অকাতরে ঘুমচ্ছিলেন, রাঘববাবু তাঁকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলেন।

তিনি ভাবলেন নবাব ফৌজ বজরা আক্রমণ করেছে। তাড়াতাড়ি হাতড়ে তিনি কতকগুলি অস্ত্র বের করলেন।

পাশের ঘরে মেয়ে দুটি ঘুমচ্ছে। মেয়ে দুটিকে আগেই শেষ করবেন কিনা ভাবলেন। তারপর কি ভেবে বেগে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

তখন গোবিন্দ ঢালী একাই লড়ছে কতকগুলি লোকের সঙ্গে। ওপাশের বজরা থেকেও লাঠি ঘোরানোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

রাঘববাবু অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলেন না শত্রু কারা। তাঁর জানার বাসনা নবাব ফৌজ বজরা আক্রমণ করছে কিনা।

কটা কাতান ধরণের ধারাল অস্ত্র অন্ধকারে এসে ছিটকে পড়ল।

মেঘের মধ্যে চাঁদ লুকিয়ে গেছে। তাই অন্ধকারটাই প্রকট।

রাঘববাবু কি ভেবে তাঁর লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলেন। লাঠি চালাতে তিনিও ওস্তাদ।

গোবিন্দ ঢালী তখন কজনকে ঘায়েল করেছে। তারও কিছু কিছু জায়গায় আঘাত লেগে রক্ত ঝরছে।

সে মনিবকে দেখে চিৎকার করে উঠল—কর্তা, আপনি আর আসবেন না। এ ব্যাটারা ডাকাতী করতে আমাদের বজরায় এসেছে, আজ সব কটাকে আমি একাই যমালয়ে পাঠিয়ে দেব।

রাঘববাবু বড় করে একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছইয়ের মধ্যেই ঢুকে গেলেন। নবাব ফৌজ নয়, ডাকাত।

ভেতরে ছেলেমেয়েরা চিৎকার তুলেছিল।

রাঘববাবুর বড় ছেলে সুমন্ত তো ভয়ে কাঁপছে। তুমন্তর অবস্থাও তেমনি।

নির্মলা গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে ফেলেছেন।

মহামায়া সরলা, সুভদ্রা'ক বললেন ডাকাতের হাতে পড়বার আগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বি।

সরলা, সুভদ্রার মধ্যে কোন কথা নেই।

ডাকাত গ্রামে অনেকবার এসেছে। তাছাড়া চৌধুরীদের সঙ্গে হামেসাই দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে থাকে কিন্তু এ জলে, তাছাড়া অচেনা জায়গা, নিশুতি রাত্রি। সবমিলিয়ে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি ধারণ করেছিল।

রাঘববাবু নিশ্চিন্ত। তিনি জানেন, গোবিন্দ ঢালী একাই ডাকাতদের ঘায়েল করতে পারবে। তবু সময় লাগল অনেক।

অনেক চিৎকার, মারামারি, রক্তারক্তি হবার পর নৌকো নিয়ে ডাকাতরা পালাল।

গোবিন্দ ঢালীর সর্বশরীর চুঁইয়ে তখন রক্তের ধারা বইছে। বিশাল দেহ যেন সাপের মত উত্তেজনায় ফুঁসছে থেকে থেকে।

বজরার পাটাতনের ওপর কটা রক্তাক্ত মৃতদেহ গড়াচ্ছিল। সেগুলি শত্রুপক্ষের দেখেই চেনা যায়।

গোবিন্দ কেমন যেন রাগ করে সেগুলি লাথি মেরে জলের উপর ফেলে দিল তারপর থুথু ছিটোল ঘেন্নায়।

রাঘববাবু বাইরে এসে দাঁড়ালেন। গোবিন্দকে বললেন—সাবাস্।

গোবিন্দ কর্তাকে দেখে যেন আরও বেশী কেমন হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—কর্তা, আমার বোধ হয় তাকত ফুরিয়ে গেছে। ঐ কটাকে ঘায়েল করতে এতো সময় লাগল?

রাঘববাবু আশ্বাস দিলেন—তাকত কেন ফুরিয়ে যাবে গোবিন্দ? ওরাও তো দলে অনেক ছিল। তাছাড়া তারা সব অনেক ধারাল অস্ত্র নিয়ে এসেছিল।

এইবলে রাঘব চৌধুরী বজরার মেঝে থেকে তুলে নিলেন একখানি কাতান ধরনের অস্ত্র।

গোবিন্দ সে কথার উত্তর না দিয়ে ওপাশের বজরার দিকে মুখ করে চিৎকার করে উঠল—হ্যাবে হরিশ, সব বোনাইয়ের পুত, কটা ঘায়েল হইছে।

ওপাশ থেকে ক্ষীণস্বরে উত্তর এল—সাতজন।

সাতজন কি কর্তাব নিমক খায় নি?

আবার গোবিন্দ ঢালী চিৎকার করে উঠল—মরেছে না বেঁচে আছে?

বেঁচে আছে।

ব্যাটাদের ঠ্যাং ধবে সব জেলে ফেলে দে। বেঁচে আর কালামুখ দেখাতে হবে না। কব্জিতে জোর নেই, লেঠেল হতে এসেছে।

বাঘববাবু দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে শুধু গোবিন্দর রাগের কথা শুনতে লাগলেন। খুশি হলেন। তারপর বললেন—গোবিন্দ, শরীর দিযে বড রক্ত পড়ছে। একটু দাওয়াই লাগিযে নাও।

গোবিন্দ দেখল কাঁধের ক্ষতটা খুব বড হযে গেছে। একটা বর্শা বেটপ্‌কা বিঁধে গিযেছিল সেই থেকে বিপত্তি। রক্ত গড়িযে চওড়া বুক ভাসিয়েছে। সে ক্ষতটা চেপে বন্ধ করতে গেল কিন্তু বন্ধ হল না।

রাঘববাবুর দিকে তাকিযে বলল—কর্তা, ও বজরা থেকে একবার ঘুরে আসি, ব্যাটাদের কি হল দেখি তারপর নিজের জন্যে কিছু করব।

এই বলে সে অপেক্ষা না করে লাঠি হাতে লাফিযে পরের বজরা, তার পরের বজরায় গিযে পৌছল।

এ পাশে রাঘববাবু নিজের বজরায় দাঁডিযে রইলেন। বজরা তখন থেমে নেই, এগিযে চলেছে। রাঘববাবু নিশ্চিন্ত। ডাকাত যতই পড়ুক, নবাব ফৌজ তো নয়! তিনি নবাব ফৌজ ভেবে আতঙ্কিত হযেছিলেন।

সুভদ্রা এসে পাশে দাঁড়াল। আকাশে মেঘের সাথে আলো অন্ধকারের খেলা চলেছে। মাঝে মাঝে জোৎস্নার আলোয ধুযে যাচ্ছে প্রকৃতি। আবার অন্ধকার এসে সব ঢেকে দিচ্ছে।

রাঘববাবু কোন কথাই বললেন না মেযের সঙ্গে।

সুভদ্রাও বাবার দিকে এগিযে এল না।

সে শুধু রাতের প্রকৃতি দেখতে দেখতে হাওয়ায় উড়ে পড়া কপালের চুল সরালো।

এই সময়ে গোবিন্দ এসে হাজির হল। রাঘববাবু তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

যারা জখম হয়েছিল তারা ভাল আছে তো?

গোবিন্দ নিজের কাঁধটা কাপড়ের পট্টি লাগিয়ে এসেছে। মুখখানি আরও কালো

করে বলল--না কর্তা, বোধ হয় একটা লট্‌কে যাবে। জখম বড় বেশী।

গোবিন্দ যেভাবে কথাটা বলল রাঘববাবু নিতে পারলেন না। বললেন—সে কি? রাঘববাবু বড় বড় চোখ করে গোবিন্দর দিকে তাকালেন।

গোবিন্দ নিজের মনে গজ গজ শুরু করে দিয়েছে।

যতবার বলি লাঠি বেঁকিয়ে ধরবি, লাঠি বেঁকিয়ে না ধরলে কিছুতে দুষমণের হাতিয়ার ঠেকাতে পারবি না। সে কথা কেউ শোনে না! এতো সামান্য কটা পুঁচকে ডাকাত, যদি নবাব ফৌজ এসে বজরা আটক করে?

রাঘবাবু চুপ করে রইলেন। নবাব ফৌজ কথাটা কানে যেতে তিনি চমকালেন। তারপর গোবিন্দ চুপ করলে জিজ্ঞেস করলেন—কে সে?

ঐ যে শঙ্করা, বিনু বাউরির ছেলে।

শঙ্করার কথা শুনে রাঘববাবু হাঁ হয়ে রইলেন।

বিনু বাউরি আসবার সময়ে নদীর ঘাট পর্যন্ত এসেছিল, বড় কাতর হয়ে বলেছিল—কর্তা, আমার ছেলেটাকে দেখবেন। আমার আর কেউ নেই।

শঙ্করার অবস্থা খারাপ শুনে রাঘববাবু গোবিন্দর দিকে তাকালেন—গোবিন্দ, ছেলেটাকে আর ক'ঘণ্টা বাঁচানো যায় না। সকালে নবদ্বীপ এলেই তাকে বদ্যি দেখানো যেত।

গোবিন্দ হঠাৎ কেমন শিশুর মত কেঁদে উঠল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—ওর আর এ রাত কাটবেনি কর্তা।

সেই শেষরাতেই শঙ্করা মারা গেল।

রাঘববাবু বজরা থেকে ও পাশের বজরায় লাফিয়ে গিয়েছিলেন। সারারাত সেখানেই ছিলেন শঙ্করার পাশে। দুধের একটা ছেলে। বছর ষোল হয়ত বয়েস হবে। এখনও শরীরটায় পাক ধরেনি।

জখম হয়েছিল দু'তিন জায়গায়। বিশেষ করে পাঁজরের তলার জখমটাই বেশী। রক্ত কিছুতে বন্ধ হল না।

সারারাত কাতরাতে কাতরাতে ভোরের দিকে চোখ কপালে তুলে শেষ হয়ে গেল।

রাঘববাবুর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে উঠল। মৃত্যু তিনি কম দেখেন নি। দাঙ্গা হানাহানির মধ্যে অনেক লেঠেলের মৃত্যু দেখেছেন কিন্তু এ পরিবেশ অন্য। তাছাড়া মনের মধ্যে শুধু অশান্তিটাই ধূমায়িত হয়ে চলেছে। বাতাস যেন থমথমে। এতটুকু তাতে হাওয়ার বেগ নেই।

তীর্থযাত্রা করতে বেরিয়েছেন কি সাধে? কোন উপায় না দেখতে পেয়েই তীর্থ করবার ছল করে বেরিয়ে পড়েছেন।

শঙ্করার মৃত্যু নয়, মৃত্যুই যেন রাঘব চৌধুরীকে আবার ভয় দেখাতে লাগল।

সকালের দিকে নবদ্বীপের ঘাটে গিয়ে বজরা লাগল।

রাঘববাবুর কথা ছিল তিনি নবদ্বীপেও নামবেন কিন্তু নামলেন না।

গোবিন্দকে একটা নৌকো ভাড়া করে দিলেন।

যেন আবেদন।

তবু তার ভয় করে। সে বাড়ীর বার হয় না। বেরুতে ভীষণ ইচ্ছা করে। কে যেন তাকে টানে।

একদিন এমনি টানাটানির মধ্য দিয়ে সে আবার গিয়ে সেই মন্দিরের কাছে দাঁড়ায়। আর আগের মতো দৌড়াদৌড়ি করে না।

যুবকটি তাকে দেখতে পায়। সরলার কাছে আসে।

সরলা আগের মত ছুটে পালায় না। বড় বড় চোখ মেলে মানুষটাকে দেখে। এ অনুভূতি তার নতুন। তবু যেন মনের মধ্যে এক সঙ্গীতের ঝঙ্কার সুর তোলে। সে চলে আসে। আবার যায়।

লজ্জাটা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে থেকে সরে যায়।

লুকোচুরি খেলা চলে এমনি। যেন ভোমরা গুনগুনিয়ে সরলার কানের পাশ দিয়ে চলে যায়।

যুবকটি আর একটু সাহসী হয়। একদিন মন্দিরের ওপাশে যেখানে লোক চলাচল কম, যেখানে নেমেছে বটগাছের ঝুড়ি সেখানে সরলাকে নিয়ে গিয়ে তাকে স্পর্শ করে, হাত ধরে।

সরলা হঠাৎ বুঝতে পারে এ অন্যায়। মেয়েদের কখনও অচেনা পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে নেই।

কিন্তু অচেনা পুরুষ কে?

অচেনাই তো একদিন চেনার আবেদন নিয়ে চিরকালের জন্যে কাছে আসে। তবু এ পাপ। বিয়ের আগে কোন পুরুষের কাছে ধরা দিলে সে মেয়ের আর বিয়ে হয় না। কিন্তু এর সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না?

সরলা আর বাইরে যায় না। ঘরে বসে বসে ভাবে। কতদিন তার চোখে জলও ফুটে ওঠে।

সুভদ্রা আগে বুঝতে পারে নি। তারপর সরলার ভাবান্তর দেখে কি যেন বোঝে। তবু ওসব সন্দেহ তার মাথায় আসে না। ওসব সে চিন্তাও করতে পারে না।

একদিন সরলার চোখে জল দেখে সে সরলাকে জিজ্ঞেস করে—এই, তোর চোখে জল কেন রে?

সরলা প্রথমে লুকোনোর চেষ্টা করে, বলে—এমনি, চোখে জল এলে কি তাকে ধরে রাখবো?

তারপর বলে—দিদি, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব?

সুভদ্রা বোনের পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়। সরলা এমনি তো কখনও ভূমিকা করে কথা বলে না?

তারপর সরলা একটু লজ্জিত হয়ে বলল—এই, আমাদের বিয়ে হবে না?

সরলা যত স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল, সুভদ্রা সেরকমভাবে নিতে পারল না। মুখখানি তার রাঙা হল। তারপর একটু কৌতুকের ভঙ্গীতে বলল—এইজন্যে তুই

কাঁদছিলিস ? হেসে ফেলল।

কিন্তু সরলা হাসল না, বলল—বল্ না !

সুভদ্র অন্য পাশে মুখ ঘুরিয়ে বলল—এ প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। তুই বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারিস্।

সরলা কিন্তু সে কথাযও খুব বিশেষ গুরুত্ব দিল না। বলল— আচ্ছা ধর, আমায যদি কোন একজনকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে, সে কি পাপ ?

সুভদ্রা শুনে অবাক হল। মনে এমনি ধরনেব কোন সন্দেহই তার জাগে নি। তাই বিস্মিত হযে বলল—তুই কি তেমন কারুর দেখা পেযেছিস্ ?

. আগে আমার কথার উত্তব দে।

সুভদ্রা তাকিযে থাকে বোনের দিকে। বিস্মযে কি যেন সে ভাবে। ভযও পায। বলে—সরু, এসব করিস না। পিসিমা জানতে পারলে রাগ করবে।

রাগ করবে ? কেন রাগ কববে ? সরলা রেগে যায। গুরুজনবা দেখে শুনে পাত্র ঠিক করবে, আব পাত্রী যদি কাউকে ঠিক করে তাহলে অন্যায ?

হ্যাঁ অন্যায। যা হয না তা নিযে মাথা ঘামাস না সরু। সুভদ্রা কেমন যেন বড় বোনের ভূমিকা নেয।

সরলা আর সেখানে থাকে না। অন্যায, অন্যায কথাটা রাগ বাগ মুখে আবৃত্তি করতে করতে সরে যায।

অনেকদিন পর সে মন্দিরের সেই বিশেষ স্থানটিতে গিযে দাঁড়ায, যেখানে তাব সঙ্গে যুবকটির দেখা হত। তাকে দেখতে পায। সরলা তার কাছে সবে যায।

যুবটি জিজ্ঞেস কবে—এতদিন আসো নি কেন ?

সরলা বলে—কাঁদছিলাম।

যুবকটি বিস্মিত হয। কাঁদছিলে ?

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমাব মিশে কি হবে ? তোমার সঙ্গে তো আমাব বিযে হবে না। বিযে যার সঙ্গে হয না, সেই পুরুষের সঙ্গে মেযেদের মিশতে নেই। আজ এসেছি তোমার কাছ থেকে বিদায নিতে। অন্য মেযে হলে হযত এসব কথা বলতে লজ্জা পেত কিন্তু সরলার ধর্মই একটু স্পষ্ট কথা বলা।

যুবক বিস্মিত হয। বলে—তুমি বিদায নিতে এসেছ ? তার চোখ ছলছল করে ওঠে।

সরলার চোখেও জল ফুটে ওঠে।

যুবক বলে—আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে বিযে করি ?

সরলার মুখের ওপর এক টুকরো হাসির রেখা ফুটে ওঠে। মাথা হেলিযে একটু সহজকণ্ঠে বলে—সে একেবারেই সম্ভব নয। আমার মামাবাবুকে তো আপনি জানেন না। মামাবাবু নিজে পাত্র নির্বাচন করবেন, তারপব বিযে হবে।

তোমার মামাকে যদি আমি বলি।

মামা মোটেই রাজী হবেন না। তাছাড়া—এই বলে সরলা হেসে ফেলে।

যুবকের জিদ চেপে যায়। বলে—কেন হবে না? আমি কি পাত্র হিসাবে খারাপ?

খারাপ কি ভাল বুঝি না? তাঁর বোনঝি নিজে ঘর ঠিক করেছে শুনলে মামা লাঠি নিয়েই তেড়ে আসবে।

সরলার বেশ খুশি লাগছিল এই সব কথা বলতে। তাছাড়া তার বলাতে যুবক ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল এই উত্তেজনাও সরলার নারী মনের মধ্যে অন্য এক গর্বের অনুভূতি সৃষ্টি করছিল।

যুবক বলল—বেশ, তোমার মামাবাবু আমার সঙ্গে বিয়ে দেন কিনা দেখব? যদি একান্তই না দেন, সামনে তারকনাথ আছেন, তাঁর সামনেই জোর করে তোমাকে বিয়ে করব।

সরলা খিল খিল করে হাসতে হাসতে চলে যায়। তার মন বোধ হয় পূর্ণ হয়ে যায় কি কথা ভেবে যেন।

মন্দিরে তখন দর্শনার্থীরা চিৎকার করে চলেছে, জয় তারকনাথের জয়।

চিল উড়ছে। পাখীরা গাছের ডালে বসে কিচিরমিচির করছে। মন্দিরের সামনে হৈ হল্লা। নরনারীর ভীড় চলেছে মন্দিরের দিকে।

মানতকারী মানত করতে করতে বুক ফাটাচ্ছে। কার ছেলে অসুখে মরণাপন্ন, কার স্বামী চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। কেউ চায় বড়লোক হতে। সবারই প্রার্থনা ঐ মন্দিরে যে নির্জীব হয়ে বসে আছেন তাঁর কাছে।

সরলাকে অনুসরণ করে সুভদ্রা এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়েছিল। ওদের দুজনের সব কথা শুনেওছিল। বিস্মিত হয়েছিল সরলার কাণ্ড দেখে। সরলার নির্লজ্জতায় তারই মুখে বার বার লজ্জার ছায়া পড়েছিল।

তারপর সরলা চলে যেতে আর যুবকের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে সে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

পুরুষের সামনে কখনও সে দাঁড়ায় নি। এক বাবা ছাড়া তাদের অন্দরমহলে কারুর ঢোকবার অধিকার ছিল না। ছোটবেলার কথা অবশ্য আলাদা।

তবু সরলার কথা ভেবে সে কান মুখ রাঙা করেই যুবকের সামনে দাঁড়াল।

সুভদ্রাকে দেখে যুবকটি চিনতে পারল। বলল—আমায় কিছু বলবেন?

সুভদ্রা যেন নিজেই প্রেম করতে এসেছে এমনিভাবে সংকুচিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মাথা নত করে অস্ফুটকণ্ঠে বলল—আপনাকে একটু সাবধান করে দিতে এসেছি।

যুবক বিস্মিত হল।

সুভদ্রা আবার বলল—আমায় আপনি হয়ত চেনেন না, আমি সরলার মামাতো বোন।

যুবক ঘাড় নাড়ল, বলল—চিনি আপনাকে পরিচয় দিতে হবে না। আপনার নাম তো সুভদ্রা!

সুভদ্রা অপরিচিত যুবকের মুখে নিজের নাম শুনে কেমন যেন রোমাঞ্চিত হল।

ধাক্কা সামলাতেও সময় নিল। তারপর আরক্ত কণ্ঠে বলল—তাহলে আমার বাবাকেও চেনেন ?

যুবক বলল—হ্যাঁ। রাঘববাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আমি এখানকারই ছেলে। তারপর মন্দিরের কিছু দূরে খোড়ো চালের বাড়ীগুলি দেখিয়ে বলল—আমি ওখানেই থাকি। মন্দিরের মোহান্তের আমি আত্মীয়। আমার জ্যেঠামশাই হন তিনি।

পরিচয় পেয়ে সুভদ্রা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মাথা তুলে সহজ কণ্ঠে বলল—কিন্তু সরলার সঙ্গে তো বাবা আপনার বিয়ে দেবেন না ?

যুবক সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—কেন ?

সুভদ্রা কিছুক্ষণ আর কোন কথা বলল না। তারপর এক সময়ে অস্ফুটস্বরে বলল—এতো অন্যায়।

তারপর লজ্জার মত মুখ করে চাপাস্বরে বলল—এসব যে বাড়ীর গুরুজনেরা মেনে নেয় না আপনি কি জানেন না ?

যুবক অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল—আমি বিয়ে করব তাও অন্যায় ? তাহলে কি ভালবাসা পাপ ? আমি সরলাকে ভালবেসেই গ্রহণ করতে চাই।

সুভদ্রার মুখের ওপর রক্তের রেখা ফুটল। তারপর মাথা নত করে বলল—এসব কেউ মেনে নেয় না। তাতে ঝঞ্ঝাট বাড়ে। তাছাড়া সরলা ছেলেমানুষ, ও যদি না জেনে কিছু করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করুন।

যুবকটি আর দ্বিতীয় কথা বলল না। হন হন করে চলে গেল সুভদ্রার সামনে দিয়ে।

তারপর দু একদিন পরের ঘটনা।

রাঘব চৌধুরী ও রঘুনাথ মুখার্জি একান্তে বসে বসে কি যেন নিম্নস্বরে আলোচনা করছিলেন।

সুভদ্রা চলে যেতে যেতে হঠাৎ তার কেমন সন্দেহ হয়, সে একটু অন্তরালে সরে দাঁড়িয়ে পড়ে।

সে শুনতে পায়।

তার বাবা বলছেন—এ তো উত্তম প্রস্তাব মুখুয্যেমশাই। আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে ? মেয়ে দুটিকে নিয়ে বড়ই আমার চিন্তা। তাছাড়া এমন পাত্র, এতো বহু ভাগ্য করলে মেলে। আমার বোনের মেয়েটির গুণ, সে যে ঘরে যাবে, ঘর আনন্দে ভরিয়ে রাখবে।

রঘুনাথবাবু বললেন—তাহলে ওদের ঐ কথাই বলি। আপনি কি এখানেই শুভকাজ শেষ করে যাবেন ?

রাঘববাবু কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—অর্ধেক কাজ এখান থেকেই সেরে যাব। অর্থাৎ আশীর্বাদ পর্যন্ত করা থাক। আমি কলকাতা থেকে ফিরে চরমারিতে গিয়েই এ কাজ শেষ করব।

সেই মতই কাজ হল।

একদিন তিথি নক্ষত্র ভাল দিন দেখে সুদর্শনের সঙ্গে সরলার বিয়ের আশীর্বাদ হয়ে গেল।

রাঘববাবু বোন মহামায়াকে বললেন—দেখলি মায়া, আমায় ভাবতে হল না সরুর বিয়ের জন্যে।

মহামায়া খুশি হয়ে বললেন—এখন ভদ্রার একটা কিছু হলেই হয়।

সুভদ্রার জন্যেও রাঘববাবু রঘুনাথবাবুকে বললেন। রঘুনাথবাবু কথা দিলেন, যোগ্যপাত্র পেলেই আপনাকে জানাব।

রাঘববাবু আর বিলম্ব করলেন না, একদিন বজরা ছেড়ে দিলেন।

আবার বজরা ভেসে চলল আগের মতো।

তারপর একদিন সেই মহাশক্তিময়ী কালীঘাট তীর্থ কলকাতার ঘাটে গিয়ে বজরা লাগল।

তার আগে রাঘব চৌধুরী পথে যে সব ছোট ছোট তীর্থ পেলেন সেগুলি দু একদিন বজরা থামিয়ে দেখে নিলেন। কোন কোন ধর্মশালায় গিয়ে একদিন রাত্রিবাস করলেন। আবার কেউ পরিচিত পেলে তার বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

মনটা তাঁর পূর্ণ এক আনন্দে ভরে ছিল।

সরলার একটা কোন ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সুভদ্রারও হয়ে যাবে। তারপর চরমারিতে ফিরেই মহাসমারোহে দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলবেন।

এদিকে সুভদ্রা সরলার বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যেতে কেমন যেন মনের ঈর্ষার আগুনে জ্বলে। এই স্বাভাবিক। এতে অন্যায়েরও কিছু নেই। সরলা দামাল; সরলা দুষ্টু, জীবন সম্বন্ধে তার এখনও কোন গভীরত্ব আসে নি। তাকে দেখলে মনে হয় পাগলী। অথচ সেই জিতে নিল জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়াটা!

সুভদ্রা আগেও খুব বেশী কথা বলত না। এখন যেন আরও গম্ভীর, আরও অন্যমনস্ক হল।

বজরা চলে। সে তাকিয়ে থাকে থমথমে নীল আকাশে। ঝাঁক ঝাঁক পাখী উড়ে যায়। সূর্যের আলো পড়ে দিগন্তে। দিগন্ত রাঙা হয়।

কি যেন মনে মনে সে শপথ করে।

ছোট ছোট তীর্থের ঘাটে বজরা থামে।

তারা কারুর বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নেয়। সুভদ্রা আর নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে না। সবার সঙ্গে মিশতে যায়। তার স্বভাব থেকে সরে গিয়ে প্রগল্ভ হতে চায়।

কিন্তু স্বভাব যার সংকোচে ভরা সে পরিপূর্ণ মন নিয়ে প্রাণ ভরিয়ে হাসতে

পারে না। সে সরলার মত কোন অঘটন ঘটাতেও পারে না।

অথচ সুভদ্রার ইচ্ছাটা প্রবল।

এদিকে সরলা আজকাল লজ্জায় কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে!

নির্মলা সরলার কাণ্ড দেখে ননদকে বলেন—দেখলে দিদি, আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, সরু একদিন ঠিক শান্ত হয়ে যাবে।

মহামায়াও মেয়ের কাণ্ড দেখে অবাক হন। যে মেয়েকে বকতে বকতে তিনি সারা, যে কোন কথাই কানে তুলত না, তার আজ অবস্থা দেখে তিনিও হাসেন।

হেসে ভাইয়ের বৌকে বলেন—সত্যি অবাক হবারই মত।

তারপর বলেন—দাদা বিয়েটা সেরে গেলেই পারত। আবার কি হয়। বয়স্কা মেয়ে, দিনকাল তো ভাল নয়।

নির্মলা বলেন—তা কি করে হয় দিদি? চৌধুরী বংশের একটা সম্মান আছে না? বিয়ে তো অর্ধেক হয়েই থাকল, শুধু চরমারিতে গিয়ে অর্ধেক হবে। চৌধুরী বংশের কাজ। অন্তত পাঁচদিন ধরে বাড়ীতে উৎসব হবে না!

এই বলে নিজের বিয়ের কথা নির্মলা বলেন।

সেদিন তো এমনি নবাব মেয়েদের ওপর থাবা বাড়িয়ে থাকত না। মহামায়া বললেন।

এই ধরণের কথার মধ্য দিয়ে দুই নারীর দিন এগিয়ে চলে।

সরলার জন্যে সবাই খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। রাঘববাবুও হয়েছিলেন।

এরই মধ্যে একটি ছোট তীর্থে। সেখানে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ছিল। ছোট একটি গ্রাম। তীর্থের জন্যেই গ্রামটা একটু শহর।

এখানে রাঘববাবু একদিন থাকলেন।

নবীন পালের সঙ্গে তাঁর নতুন আলাপ হল। তিনি আর রাঘববাবুকে ভাড়া করা অস্থায়ী ঘরে থাকতে দিলেন না।

নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। আপ্যায়নে ভরিয়ে তুললেন রাঘববাবুর পরিবারকে।

রাঘববাবু সুভদ্রার জন্যে প্রত্যেক তীর্থেই চেনা জানা লোক পেলেই একটা পাত্রের জন্যে বলছিলেন। নবীন পালকেও বললেন।

ওঁরা একদিন সেখানে থাকবেন বলে ঠিক করেছিলেন কিন্তু নবীন পালের আতিথ্য ও তাঁর বাড়ীর মেয়েদের ইচ্ছায় আরও দুদিন বেশী থাকতে হল।

সুভদ্রা, আগেই বলেছি সুভদ্রা চেয়েছিল সরলার মতো কোন একটা অঘটন ঘটাতে। কিন্তু কোথাও তেমন কাউকে পাচ্ছিল না।

নবীন পালের বাড়ীতে নবীন পালেরই কি রকম দূর সম্পর্কের একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি চাষবাসে সাহায্য করে। আর যাত্রা করে বেড়ায়।

নবীন পাল একদিন রাঘববাবুর সঙ্গে কৃষ্ণদাসের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন—নামেও কৃষ্ণ আর যাত্রা দলে সে কৃষ্ণই সাজে। একেবারে

টিপিক্যাল কৃষ্ণ।

পুরাণে কৃষ্ণের বোন ছিল সুভদ্রা কিন্তু একালে সুভদ্রা রাধা হতে চাইল।

কৃষ্ণদাসের দেহবর্ণ কৃষ্ণের মত। তার ওপর রোদ পড়ে পড়ে আরও কালো হয়েছে। তা হোক্‌গে। সুভদ্রা সবাইকে লুকিয়ে সেই কৃষ্ণের দিকে চায়।

কৃষ্ণের চোখ দুটি সর্বদা যেন সেই গোপিনীদের সঙ্গ পাবার জন্যে ব্যাকুল। কথা বলে না, আবে ভাবে প্রকাশ হয়।

কিন্তু সুভদ্রা সরলার মত হতে পারে না। সুভদ্রা যেন কেমন ভয় পায়। তাছাড়া সরলার সেই সুদর্শন অন্য রকম। সুদর্শনের বংশ গৌরব ছিল অন্য রকম পৌরুষ জাগা রূপ। সে জায়গায় কৃষ্ণদাস নিতান্তই চাষা, আর গুণের মধ্যে সে যাত্রাদলের কৃষ্ণ সাজে।

তবু সুভদ্রা সরলার এই সৌভাগ্য প্রাপ্তিতে সংযত থাকতে পারে না। কৃষ্ণদাসের সঙ্গে একদিন তার নিভৃতে দেখা হয়।

কৃষ্ণদাস বলে –আমার যাত্রাদলে রাধা সাজে নকড়ি গ্রামের মুকুন্দ।

সুভদ্রা রাধার মুকুন্দ নাম শুনে কেমন যেন স্বপ্নভ্রষ্ট হয়।

তারপর আর জমে না কোন সুর।

সুভদ্রা আবার মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে একদিন বজরাও ছাড়ে। বজরা চলে এবার কলকাতার দিকে।

সরলা আর কিছু বুঝতে চায় না, জানতেও চায় না।

তার লাজুক মুখের ওপর আর চোখের ঘেরে সেই সুদর্শনের মুখ।

আসবার সময়ে সুদর্শন তাকে কাছে পেয়ে টেনে নিয়েছিল।

সরলা ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়েছে।

সুদর্শন বলেছে—বারে, আমাদের তো অর্ধেক বিয়ে হয়ে গেছে। এখন তো তুমি আমার।

সরলা লজ্জিত হযে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে—অর্ধেক, পুরো তো নয়! অর্ধেক অধিকার তুমি পেয়ে গেছ। এই বলে সরলা আরও রাঙা হয়ে হেসেছে।

সুদর্শন বিনয় কণ্ঠে বলেছে—কতদিন পরে আবার দেখা হবে। আমার কিছুতে তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

সরলার মনও বিমর্ষ হয়েছে। তবু একটা আশা যখন রঙে রঙে রাঙা হয়েছে, তখন কটা দিন। তাই হেসে বলেছে—সবুরে মেওয়া ফলে। অপেক্ষা করবে না! আমি কি শস্তা?

তবু সুদর্শনের কাছে সে এগিয়ে গেছে। সুদর্শনের বুকের মাঝে নিজেকে মেলে দিযেছে।

সেই সব কথাই আজকাল মনে পড়ে। যেন সুদর্শনের স্পর্শটা এই এতদূরেও বার বার ছুটে আসে। আর রোমাঞ্চিত হয়ে তার স্বভাবধর্ম ভুলে সে আত্মমগ্ন হয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ একদিন সে সব ভুলে আবার সরব হয়ে ওঠে।

তার সরব হবার দুদিন পরেই একদিন ভোরের দিকে কলকাতার ঘাটে গিয়ে বজরা লাগে।



সে সময়ের কলকাতার অন্যরূপ। আজকের গঙ্গার ঘাট থেকে চলে যান সেই অতীতে। ইংরেজরা তখন কলকাতায় চুটিয়ে ব্যবসা করছে; ইংলণ্ড থেকে প্রত্যহ জাহাজ এসে কলকাতার ঘাটে লাগে। মাল নামায়, মাল তুলে নিয়ে চলে যায়।

সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর। কলকাতাতেই মানুষের সমাগম বেশী। বাঙালীরা সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করে প্রচুর লাভবান হচ্ছে।

বাঙালীরা ভাবছে সাদামুখো সাহেবরা ঠকছে। কারণ তারা তো এদেশের ভাষা জানে না।

আর সাহেবরা ভাবছে—নেটিভরা বড় বোকা।

এই নিয়ে তখনকার কলকাতা।

গভীর জঙ্গলময় সেই তিনটি গ্রামের বহু অংশ জঙ্গল কেটে বসতি হয়েছে। বহু নতুন বাঙালী পরিবার রুজি রোজগারের জন্যে এখানে এসে দু'পয়সা হাতিয়ে নিয়েছে। তাদের বাড়ী উঠছে যত্রতত্র।

সাহেবরাও কুঠি বানিয়ে এদেশে চিরকাল থাকব বলে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সাহেব বলতে ইংরেজ। লণ্ডনের সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইংরেজদের ব্যবসা করার পদ্ধতি দেখে যে সব অন্য বিদেশীরা এদেশে ইংরেজদের আগে এসেছিল তারা অবাক হয়েছে।

ডাচ, দিনেমাররা অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। পর্তুগীজরা বোম্বেটেগিরি করে এদেশের লোকের মনে ভয়ের মানুষ হয়ে উঠেছে।

তারা ধর্মের দিকে ঝুঁকেছে। ব্যাণ্ডেলের সীমানাটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এমনও দেখা যায়, বহু পর্তুগীজ বাঁচবার জন্যে ইংরেজ কুঠিতেই চাকরী নিয়েছে। অনেকে আবার স্বাধীন ব্যবসাদার ইংরেজদের বাড়ীতে চাকরের কাজ করছে।

ফরাসীরা অতোটা করে নি। তাদের মনে মনে বাসনা, এদেশ একদিন লুঠ করতে হবে। তাদের চেহারা এদেশীয় লোকের চোখে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু ইংরেজরা সব বিদেশীর চেয়ে যেন অন্য ও অভিনব।

তারা যেন এদেশের লোকের বন্ধু।

বন্ধু হবার জন্যে বাংলা শিখতে শুরু করছে। বাঙালী মেয়ে দেখলে বিয়ে করে। বাঙালী হবার জন্যে যেন তাদের চিরকালের সাধনা।

তাই ইংরেজই সে সময়ে সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুরে আসর জাগিয়ে বসেছিল। তাই গঙ্গার ঘাটে শুধু ইংরেজ জাহাজ। জাহাজ নয়, অভিনব ধরনের বজরা, পানসি, নৌকা।

রাঘব চৌধুরীর বজরা যখন এক প্রত্যূষে সেই কলিকাতা ঘাটের অনেক কাছে এসে পড়ল, তখন বজরার পাটাতনে দাঁড়িয়েছিল, সরল, সুভদ্রা, সুমন্ত, দুষ্মন্ত ও রাঘববাবু।

রাঘববাবু এর আগে দু একবার কলকাতায় এসেছেন তাঁর অতো বিস্ময় ছিল না। তবু বিস্ময় বোধ করছিলেন কলকাতার দিন দিন উন্নতিতে।

মুর্শিদকুলীর আমলে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন কে এক জবচার্ণক না কি নামের সাহেব এখানে সবে কুঠি করেছে।

ঘাটের কাছাকাছি সব মাটির কুঁড়ে ঘর। ভেতরে ঢোকা যায় না। চারিদিকে জঙ্গল আর জলা জমি।

সেই জঙ্গল ভেদ করে যেতে গেলে হিংস্র জন্তুর উৎপাত আছে।

তবু তিনি একদিন এই হিংস্র জন্তুর আক্রমণ এড়িয়ে ভেতর দিকে গ্রামের অন্য প্রান্তে গেছিলেন। ভেতর দিকে কিছু কিছু লোকের বাস। তারা সবাই এক জায়-গায় মিলে মিশে জীবন যাপন করে।

তখনই আলাপ হয়েছিল তাঁর যদুপতি হালদারের সঙ্গে।

কালীঘাটের ওপর তখন লোকের অগাধ বিশ্বাস। প্রাণ যাক্ তবু ভাল, কালীদর্শন করতেই হবে।

তাই কালীদর্শনের জন্যে বহু দেশ বিদেশ থেকে লোক ছুটে আসত। পাল্কী চলে মেয়েদের নিয়ে। সঙ্গের পুরুষেরা লাঠি, সড়কি, বল্লম নিয়ে সঙ্গী হয়।

ডাকাতরা যেন এই তীর্থযাত্রীর আশাতেই ওৎ পেতে থাকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রে রে করে।

তবু তীর্থযাত্রীর আসার বিরাম ছিল না। সেইজন্যে কালীঘাট হয়ে উঠেছিল সবার আগে উন্নত। কালীঘাটে তখন কালীমাতার সেবাইত হালদাররা।

হালদাররা ছাড়া আরও ব্রাহ্মণের বাস সেখানে।

ইংরেজদের মাটির কুঁড়েঘরের পাশ দিয়ে রাঘববাবু গিয়েছিলেন গ্রামের ভেতর দিকে।

যাবার সময়ে হঠাৎ এক সাদা চেহারার সাহেব তাঁর পথ আটকে ছিল। তারপর বন্দুক তুলে বলেছিল—টুমাকে হামি সুট্ করিবে। ইখানে কি করিতে আসিয়াছ?

প্রথমে রাঘববাবু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। মুখ দিয়ে কথা সরে নি। একে সাহেব, তারপর বন্দুক।

তারপর হঠাৎ সাহেব হেসে বলেছিলেন - নো, নো, হামি টুমাকে সুট্ করিবে না। টুমি আমার বণ্ডু আছে। টুমার জন্যে হামি কি করিতে পারি?

তারপর সাহেবই কাছে এসে চুপি চুপি বলেছিল—আমাকে একটা নেটিভ মেয়ে দিতে পার? সুন্দরী চাই না। উত্তম্যান হলেই হবে। আমার লোক সব নেটিভ

মেয়ে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। আমিও একটা করিবে। এখানে থাকিয়া যাইবে। আমি এদেশের মানুষ হইবে।

তখন রাঘব চৌধুরীর অবস্থা সঙ্গীন। সাহেবটা বলে কি? আচ্ছা লোকের কাছে মেয়ে চেয়েছে।

এই সময়ে যদুপতি হালদারের আবির্ভাব। সুন্দর স্বাস্থ্যবান গৌরকান্তি চেহারা। তিনি এসেই সাহেবের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা ইংরাজী মিশিয়ে বলতে লাগলেন।

তারপর রাঘববাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—রিচার্ডসাহেব আপনার কাছে মেয়ে চাইছিল? সাহেব পাগল হয়ে উঠেছে একটা নেটিভ মেয়ে সে বিয়ে করবেই। তা আমি তাকে বলেছি, একটু সবুর কর, চার্নকের মত তোমাকেও একটা বিধবা মেয়ে যোগাড় করে দেব। কত মেয়ে তো সতীদাহ হতে চায় না, তাদের কোন একটাকে তুলে এনে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব, তা সাহেবের সবুর সয় না।

এইভাবে যদুপতি হালদারের সঙ্গে রাঘব চৌধুরীর আলাপ হয়েছিল। তারপর ব্যবসার সুবাদে আরও ঘনিষ্ট হয়ে গেছেন।

যদুপতি হালদারই একবার চরমারিতে গিয়েছিলেন। উঠেছিলেন চৌধুরীবাড়ীতে।

তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাঘব চৌধুরী।

সেই রিচার্ডসাহেব কি শেষপর্যন্ত নেটিভ বিবাহ করতে পারলেন?

যদুপতি বলেছিলেন—সে অনেক কথা।

রিচার্ড এমন পাগল হয়ে উঠেছিল যে; তারই এক দেশের লোকের সঙ্গে তার নেটিভ বৌ নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিল।

তারপর দুজনে ডুয়েল ফাইট।

কিন্তু হতভাগা রিচার্ড বন্দুকের গুলিতে মারা গেল।

সেইসব কথাই বজরার পাটাতনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন রাঘব চৌধুরী।

এইসময়ে সরলা চিৎকার করে উঠল—বাঃ কত কত সাহেব দেখো?

কিন্তু রাঘববাবু সাহেব দেখলেন না, দেখলেন নবাব ফৌজ। আর তার সঙ্গে সঙ্গে এক ধাক্কায় মেয়ে দুটিকে ছইয়ের মধ্যে ঠেলে দিলেন।

সরলা, সুভদ্রা আচমকা ধাক্কা খেয়ে ছইয়ের মধ্যে পড়ে গড়াগড়ি খেল। ওদের কোমল শরীরে খুব লাগলও।

কিন্তু তারা ভীষণ বিস্ময় বোধ করল রাঘববাবুর কাণ্ড দেখে। রাঘববাবু যে ইচ্ছে করে তাদের ধাক্কা দিলেন তারা বুঝতে পারল।

তারপর আর রাঘববাবু তাদের বজরা থেকে সারদিন ধরে বেরুতে দিলেন না।

যদুপতি হালদারের কাছে গোবিন্দ গেল। শুধু গোবিন্দ নয়, আরও কটি লেঠেল। বাকী লেঠেলরা বজরার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকল।

রাঘব চৌধুরী সারাদিন ধরে অনেক কিছুই ভেবে চললেন।

তবে কি উজীর সাহেব কলকাতায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁকে ধরবার জন্যে?

কেন তিনি এসব কথা ভাবলেন, তিনিই জানেন। মনের মধ্যে তখনও যে সেই

ভয়টা তাঁর জড়িয়েছিল তার প্রমাণ হল। একবার যদি মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতেন, হুগলীর ফৌজদারের অধীনে নবাবী অনেক ফৌজ আছে। তারা সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায়।

আর যদি হাজীসাহেব তাঁকে ধরবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তাহলে কলকাতা পর্যন্ত আসবেন কেন?

পথে যে কোন ঘাটেই তো তাঁর বজরা আটক করতে পারতেন।

যাই হোক রাঘব চৌধুরীর ভয় ভাব গেল যখন যদুপতি হালদারের কাছ থেকে পাল্কী নিয়ে লোক এল। আর নবাব ফৌজ ঘাটের কাছ দিয়ে অনেকবার সারি বেঁধে চলে গেল কিন্তু তারা একবারও ফিরে দেখল না।

তারপর কদিন চলে গেল কলকাতায়।

যদুপতি হালদারের বাড়ী রাঘববাবুর বাড়ীর মতই তিনমহলা।

সেখানেও অন্দরমহলের মধ্যে মেয়েরা থাকে।

মেয়েরা পাল্কী ছাড়া বাইরে বেরোয় না। বেরলেও বহু সতর্কতা অবলম্বন করে। চরমারিতে ছিল নবাব ফৌজের ভয়। এখানে সাহেবদের। তবে সাহেবেরা কোন গৃহস্থের বাড়ী লুঠ করে মেয়ে ধরে নিয়ে যায় না। মেয়ে দেখলে তার প্রতি লোভ প্রকাশ করে। টাকা দিয়ে কিনতে চায়।

আর বহু সুবিধাবাদী নেটিভ সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্যে অনেক অন্যায় কাজ করে। সে অন্যায়ের ইতিহাস বলতে গেলে বহু গোপন কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। আজকের বহু বনেদী বড়লোক যারা তখনকার কালে দু'পয়সা জমিয়েছিলেন তাঁদের বংশের অনেক ইতিহাস বেরিয়ে পড়বে।

এমন অনেক ঘটনা সে সময়ে ঘটত।

সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্যে ঘরের বৌ বা মেয়ে এক রাতের জন্যে বাইরে চলে যেত। তারপর সবকিছুই ঢাকা পড়ত। তারপর দেখা গেল, যিনি এই অন্যায়টুকু করলেন তিনি রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেলেন।

তাঁর তিনমহলা বাড়ী উঠেছে। বাড়ীর সামনে ছ'ঘোড়া জুড়িগাড়ী দাঁড়িয়েছে।

এসব ঘটনা যে কলকাতায় ঘটছে রাঘববাবু জানতেন না! যদুপতি হালদারের কাছে শুনে তিনি হতবাক হলেন।

রাঘববাবু কদিন ধরে ঘুরে বহু ব্যবসাদারের সঙ্গে দেখা করলেন। নতুন কোন ব্যবসা কারুর সঙ্গে করা যায় কিনা তার কথাও ভাবলেন।

সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ভয় করল।

যদুপতিবাবু এক সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন—সব সাহেবরা কি নেটিভ মেয়ে চায়?

ম্যাকলিয়ড বলে এক সাহেবের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। তিনি চাইলেন লবণ ব্যবসা করতে কিন্তু রাঘববাবু তার কোন সন্ধান দিতে পারলেন না।

গোবিন্দপুরে মোসলেম খাঁ বহু মাল রাঘববাবুর কাছ থেকে কিনতেন। একরকম মাল বোঝাই নৌকা আসত কলকাতায় শুধু মোসলেম খাঁর জন্যে।

মোসলেম খাঁ রাঘববাবুকে সশরীরে দেখে খুশি হলেন।

তাঁর সঙ্গেও অনেক নতুন ব্যবসার কথা হল।

রাঘববাবু বললেন এবার সপরিবারে এসেছি। আবার আমি আসব। এখানে মাঝে মাঝে না এলে দেখছি ব্যবসার সুবিধে হয় না।

মোসলেম খাঁ দাড়ি নেড়ে হাঃ হাঃ করে হাসলেন। চৌধুরীসাহেব দেখছি ঝানু ব্যবসাদার হয়ে উঠেছেন।

তাঁর এবং শেঠজীর সঙ্গে রাঘববাবুর আলাপ হল।

শেঠজী বললেন—আমি ভাল দাম পেলে রেশম সুতো বেচতে পারি।

রেশম সুতো রাঘববাবুর দরকার। রেশম বস্ত্রের জন্যে বহু তাঁত তাঁর চরমারিতে আছে। তাই তিনি রেশম সুতো কিনবেন বলে শেঠজীকে কথা দিলেন। বায়নাও করলেন কিছু টাকা দিয়ে। আর বাকী টাকা চরমারিতে ফিরে গিযে পাঠিয়ে দেবেন।

এদিকের কাজ রাঘববাবুর শেষ।

সুভদ্রার শুধু একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেই এদিকটা নিশ্চিন্ত হন।

কিন্তু সে কথা যদুপতি হালদারকে বলা ঠিক হবে কিনা ভাবতে লাগলেন। এবারে এখানে এসে যদুপতি হালদারের প্রকৃতিটা অন্য রকম দেখেছেন।

এখানকার সব লোকেরাই কেমন যেন অন্য এক চিন্তায় ঘুরছে।

ঘন ঘন সব সাহেব কুঠিতে যায়। আর কি সব সলাপরামর্শ করে ফিবে আসে। কি যেন গোপন করে সবাই কথা বলে।

যদুপতি হালদারও বললেন সেই আগের দরাজকণ্ঠে নয়, শুধু চোখ নাচিযে নাচিযে বললেন—চৌধুরী মশাই, উন্নতি কথাটা খুবই সোজা, সেই উন্নতি করতে গেলে অনেক মেহনত করতে হয়।

অথচ এই যদুপতি হালদারের আতিথ্য ভোলা যায় না। তাঁর তিনমহলা বাড়ীর শেষ মহলটি অন্দরমহল।

রাঘববাবুর পরিবার অন্দরমহলেই জায়গা পেয়েছিল। মিশে গিযেছিল যদুপতি হালদারের অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে।

ও বাড়ীর মেয়ের মতই রাঘববাবুর মেয়েরা সম্মান পেল।

কালীঘাটের মন্দিরে নির্মলা, মহামায়া অনেকবার গেলেন। অবশ্য পাল্কীর মধ্যে। কিন্তু সরলা, সুভদ্র যাবার হুকুম পেল মাত্র একবার।

যদুপতিবাবুই বললেন—মা, তোমরা এখনও কুমারী। তাছাড় দিনকাল বড খারাপ। বেশী বাইরে বেরোনো ভাল নয়।

অথচ এই যদুপতিবাবুকে যখন রাঘববাবু বললেন—সুভদ্রার জন্যে একটা পাত্রের কথা, তখন যদুপতিবাবু চোখ কুঁচকে বললেন—চৌধুরীমশাই, কথাটা হয়ত আপনার খুব খারাপ লাগবে। তবু বলি, আপনি সাহেব জামাই করে নিন। তাতে এই সুবিধে হবে, মেয়েটাও একটা যোগ্য স্বামী পাবে, আর আপনারও জীবনে অনেক সুযোগ এসে যাবে।

রাঘববাবু শুনে স্তম্ভিত হলেন। শুধু বললেন—সে তো সম্ভব নয় হালদার মশাই। আপনি অন্তত একটা ভাল বংশের পাত্র খুঁজের দিন।

যদুপতি হালদার তার উত্তরেও মাথা নেড়ে বললেন—ভাল বংশ হয়ত পাওয়া যায় চৌধুরীমশাই, ভাল সচ্চরিত্র পাত্র পাওয়া যায় না। আজকালকার অধিকাংশ সবংশজাত পাত্র সাহেবদেরই অনুকরণ করছে। বিলেত থেকে আসা ভাল বিলিতী মদ খাচ্ছে, আর বাঈজীবাড়ী গিয়ে বেলেল্লাপণা করছে।

সুতরাং বুঝলেন রাঘবাবু, সুভদ্রার জন্যে কোন পাত্র কলকাতায় পাওয়া যাবে না। অথচ মেয়েটার জন্যে একটা পাত্র খুব দরকার ছিল। সরলার বিয়ের সাথে সুভদ্রার বিয়েটাও দিয়ে দিতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন।

চরমারিতে গিয়ে আবার যদি নবাবের কোপে পড়তে হয় তাহলে মুস্কিলের ব্যাপার।

একবার কোন রকমে বেঁচেছেন গ্রামের একটি মেয়েকে দিয়ে।

রাঘববাবু তখন ভাবছেন তিনি সীতাকে দিয়েই সে যাত্রা উদ্ধার পেয়েছেন। চরমারিতে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটির বিয়ে দিতে পারলে একেবারে বেঁচে যাবেন।

এই চিন্তায় যখন তিনি বিভোর তাছাড়া যাবার তোড়জোড়ও করছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ দারুণ একটা সংবাদ শুনলেন। শুনে দারুণ খুশি হলেন।

নবাব সুজাউদ্দিনের উপপত্নীর ছেলে মহম্মদ তকী মারা গেছে। সহজভাবে সে মারা যায়নি, তাকে হত্যা করেছে সরফরাজ খাঁ।

তকী এসেছিল উড়িষ্যা থেকে নবাব প্রাসাদে। প্রতি মাসেই একবার করে আসে তার বেতন নিতে! এবারেও এসেছিল। কিন্তু অতর্কিতে সরফরাজ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর যা হবার হয়ে যায়।

রাঘব চৌধুরী আরও শুনলেন—এর পিছনে নাকি অন্য কারও চক্রান্ত আছে। নবাব সেই বিলাসকক্ষে বসেই রায় দিয়েছেন—সরফ যা করেছে অন্যায় কিছু করে নি। বরং ঠিক কাজই সে করেছে। তকী পরে নবাবীর জন্যে হামলা করত, সে গেছে ভালই হয়েছে। নবাবী নিয়ে আর ঝঞ্ঝাট হবে না।

কিন্তু তকীর মা কিছুতেই শুনতে চান না সে সব কথা। তিনি চান অপরাধীর শাস্তি।

নবাবী কানুনে যখন অপরাধীর শাস্তি হয় না, তখন তকীর মা আজিমুন্নেসা বিবি সরফরাজকেই ছোরা দিয়ে মারতে গেছেন।

এখন আজিমুন্নেসা বিবি লৌহ কারাগারের মধ্যে বন্দী; তিনি পাগল হয়ে পুত্রহারা শোকে শুধু কেঁদে চলেছেন।

মুর্শিদাবাদে এখন নবাবী প্রাসাদে শুধু নানান ঘটনার চমক।

আরও খবর শুনলেন রাঘব চৌধুরী।

কে যেন রঙমহলে নারীর ছদ্মবেশে ঢুকে নবাবকে হত্যা করতে গিয়েছিল। ধরা পড়ে গেছে। আর বিচারের সময়ে সেই আততায়ী বলেছে আমি তো অর্থের বিনিময়ে এ কাজ করতে গিয়েছিলাম।

উজীরসাহেব দরবারে বসে তার বিচার করছিলেন। উজীরসাহেবকে দেখিয়ে সে লোক বলেছে—উজীরসাহেব, মরবার আগে আর মিথ্যে কথাটা কেন বলি, ছোরা চালাতে পারলে নবাব নিহত হতেন, লাভ হত আপনার। ছোরা চালাতে পারি নি বলে আমিই ধরা পড়ে বিচারের সম্মুখীন হয়েছি।

এই কথা শুনে উজীরসাহেবের মুখ শুকিয়েছে। তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন নি, দরবারে আমীর ওমরাহদের সামনেই সেই আততায়ীর বুকে ছোরা মেরেছেন।

আততায়ী রক্তাক্ত দেহে দরবার কক্ষেই মারা গেছে।

উজীরসাহেব তারপর ভীত হয়ে নবাবের দিকে চেয়েছেন। নবাবসাহেব, শয়তানের এ কথা কি বিশ্বাস করেন?

নবাব সুজাউদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন, কভি না। নবাবী চালাতে গেলে বহু দুষমণ আপনার আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাকচ করতে চায়, আততায়ী মরবার সময়ে সেই চালটাই চেলে গেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন উজীরসাহেব, এসব ঝুট্ আমি বিশ্বাস করি না। আপনার আমার সম্বন্ধ চিরকাল জিন্দা থাকবে। আমি তো ভুলিনি, এই নবাবী একদিন আপনার জন্যেই পেয়েছি। আমি বেইমান নই উজীরসাহেব।

এসব কথাই রাঘববাবু কলকাতায় বসে শুনলেন।

শুনে তাঁর মনের ভেতর থেকে এক গুরুভার নেমে গেল। তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তারপরই গোবিন্দ ঢালীকে আদেশ দিলেন বজরা সাজাবার জন্যে।

বজরা আবার চলতে শুরু করল।

সরলা, সুভদ্রা দুজনেই খুশি হয়নি কলকাতায় এসে।

কালীঘাটের তীর্থকে কেন্দ্র করে ভেবেছিল, তারকেশ্বরের মতো তারা স্বাধীনভাবে ঘুরবে, কিন্তু এখানে এসে দেখল, সেই চরমারির মতো বন্দী অবস্থা।

সরলা আবার সেই আগের মত হয়ে উঠেছিল। আবার সেই হাসির ঝরণা ধারা উত্তাল হয়ে ওঠে।

যদুপতি হালদারের বাড়ীর মেয়ের সরলার প্রকৃতি দেখে কেমন অবাক হন।

মহামায়া আর বকেন না। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—মেয়েটা আমার পাগলী।

যদুপতি হালদারের স্ত্রী বলেন তা হোক্ মেয়ের আমার মন সরল। হাসে যে তার মনের মধ্যে কোন প্যাঁচ থাকে না। এখন যোগ্য বর জুটলেই এই মন থেকে যাবে।

মহামায়া তখন বলেন সুদর্শনের কথা। মেয়ের আমার না খুঁজতেই বর জুটে গেছে। হ্যাঁ, ভাল বরই জুটেছে।

মহামায়া গর্বের সঙ্গে বলেন তারকেশ্বরের ইতিহাস। চরমারিতে ফিরে চার হাত এক করে দিতে পারলেই বাঁচি।

নির্মলার কোন ঈর্ষা নেই, তবু নিজের মেয়ে তো, মেয়ের জন্যে ভাবেন।

আর সুভদ্রা যেন কেমন গম্ভীর হতে হতে আরও গম্ভীর হয়ে যায়।

সুভদ্রা আজকাল সোজাসুজি সরলাকে আক্রমণ করে। তোর কি? তোর তো

একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

হিংসে করিস্ ?

হিংসে তো হয়ই।

সরলা খিল খিল করে হেসে ওঠে। সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে বলে—দিদিভাই, হিংসে করিস্ না। তোরও কেউ না কেউ জুটবেই। মামাবাবু কি তোর জন্যে ভাবছেন না ?

ছাই ভাবছেন।

সুভদ্রা যে সব কথা লজ্জায় আড়াল দিয়ে রাখত সে সব কথা আড়াল দিয়ে রাখে না। স্পষ্টই বলে।

ওরা একদিন মাত্র কালীঘাটের মন্দিরে গিয়েছিল। দেখেছিল মন্দিরের মধ্যে বহু দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীর ভীড়।

দেখেছিল মন্দিরের পাশে কালীকুণ্ড হ্রদ। বন্ধ্যা নারীরা এখানে এসে ডুব দেয় সেদিন বহু বিবাহিতা সুন্দরী তরুণীরা স্নান করছিল।

পালকীর বেহারারা তাড়া দিচ্ছিল পালকীতে ওঠবার জন্য।

হ্রদের জলে স্নান করলে বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হয় শুনে সরলার কি হাসি। সে সুভদ্রাকে বলল - দিদি, এখানে একটা ডুব দিয়ে নে। ছেলেপুলে যদি না হয় আগাম একটা ডুব দিয়ে নিলে হয়ত দোষ কেটে যাবে।

সুভদ্রা সরলার কথায় রেগে ওঠে। তুই আগে ডুব দে, তোরটা আগে দরকার।

সরলা তার উত্তরে বলে বলা তো কিছু যায় না তোরটাও আগে হতে পারে।

সেই কথাটাই সুভদ্রার মনে লেগে যায়। মনটা আবার প্রফুল্ল হয়। হয়ত তারই আগে হতে পারে। কিম্বা দুজনের একসঙ্গে।

কিন্তু দিন যত এগিয়ে যেতে লাগল, তার বিয়ের বিষয়ে কোন কথা না হতে তার মনটা খারাপ হতে লাগল। তারপর একদিন বজরা ছাড়ার কথা শোনে। সেদিন আর সে মনের দৃঢ়তা ধরে রাখতে পারে না, কেমন যেন ক্ষোভে দুঃখে তার চোখে জল এসে পড়ে।

বজরা চলে।

এবার বজরা তিনখানি ফিরে চলেছে চরমারির দিকে। আকাশ সব সময়েই মেঘাচ্ছন্ন। কালবৈশাখী ঝড় মাঝে মাঝে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে যায়। সেইজন্যে রাঘববাবু একটু সাবধান হন। গোবিন্দকে বলেন – গোবিন্দ, এ বজরায় তোমার আর একজন সাকরেদকে নাও। হঠাৎ যদি কোন অঘটন ঘটে যায় বলা তো যায় না।

রাঘববাবু তখন ভাবছিলেন—প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথাই।

গোবিন্দ ঢালী কর্তার নির্দেশ শুনে তার একটি প্রিয় সাকরেদকেই ওপাশের বজরা থেকে নিয়ে আসে। গোবিন্দ ঢালী মনে একটু দুঃখও পায়। কর্তার তাকে বিশ্বাস নেই। আসে প্লাবন। গোয়াল ডিঙির প্লাবন। জোয়ান শরীর। টান টান বুকের

ছাল্টি।

ভদ্রঘরের ছেলে। আগে গায়ের রঙ গৌরবর্ণ ছিল। এখন সে রঙ মুছে গিয়ে তামাটে হয়ে গেছে। এই প্লাবনের ওপর গোবিন্দ ঢালীর অনেক আশা আছে। সে মনে করে, তার মৃত্যুর পর প্লাবনই রাখবে তার সম্মান।

তবু মাঝে মাঝে প্লাবন যেন কেমন ওস্তাদের সম্মান রাখতে পারে না।

আসবার সময়ে সেই যে ডাকাত পড়েছিল। তখন প্লাবন অনেক ডাকাতের মহড়া নিয়েছিল। অনেককে ঘায়েলও করেছিল।

এ বজরা থেকে বার বার গোবিন্দ ঢালী চিৎকার করে বলেছিল প্লাবন, বহুৎ হুঁশিয়ার সে। লাঠি বেঁকিয়ে ধরবি।

প্লাবন গুরুর সব নির্দেশ পালন করেছিল। কিন্তু হঠাৎ যে কি হয়ে গেল? ডাকাতদের একটা লোহার বল এসে তার এক চোখে লাগল। সে দারুণভাবে ব্যথা পেয়ে বসে পড়ল। তাকে বাঁচাল আর একজন লেঠেল।

ডাকাতরা চলে গেলে গোবিন্দ ঢালী এ বজরায় এসে প্লাবনের অবস্থা দেখে আরও ক'ঘা পিঠের ওপর কষিয়ে দিল। বলল—তুই মরে যেতে পারলি না। আমার মান খুইয়ে বেঁচে থাকলি কেন?

প্লাবন চোখের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছে কিন্তু ওস্তাদের তীরস্কারে আরও ব্যথা পেয়েছে। পা জড়িয়ে ধরে বলেছে—ওস্তাদ,এবারের মত আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি কথা দিচ্ছি আর কখনও এ ভুল হবে না।

গোবিন্দ ঢালী খুশি হয়েছে। বলেছে—যা, ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু আর কখনও এমন ভুল করবি না। লাঠি যেমন ভাবে ধরতে বলেছি ঠিক তেমনিভাবে ধরবি। সেই প্লাবনকেই গোবিন্দ ঢালী কর্তার বজরায় নিয়ে এল।

বজরা চলেছে। বকের মত সাদা সাদা পালগুলি বাতাসে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল। কখনও ঘন মেঘ চাপ বেঁধে সূর্যের মুখ ঢেকে দিচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে। আবার কখনও সব পরিষ্কার। ঝলমলে দিন। সূর্যের আলো পড়ে সব কিছু রাঙিয়ে দিচ্ছে।

ঝড়ও মাঝে মাঝে উত্তাল হয়ে উঠেছে। নদীর দু'পাশে বৃহৎ বৃহৎ গাছের সারি প্রবল বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। তখনই বজরায় ভয়ের সম্ভাবনা।

গোবিন্দ পায়ের অনেকখানি ওপরে কাপড়টা গুটিয়ে নিয়ে কাঠবেড়ালীর মতো বাঁশের লগি ধরে পালের শেষ মাথায় উঠে যাচ্ছে। পাল খুলে ঝপাঝপ নামিয়ে ফেলছে নীচে।

মাঝিরা এগিয়ে আসছে। গোবিন্দ তাদের ভ্রূক্ষেপই করছে না। কর্তা তাকে বলে দিয়েছেন গোবিন্দ সাবধান। ঝড় আসতে পারে।

গোবিন্দ তাতেই সাবধান হয়েছে।

কর্তার পরিবারকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যেন তার।

তাই সে নিজেই যা কিছু করণীয় করে চলেছে।

এ পাশে প্লাবন লাঠি হাতে বজরার পাটাতনে পাহারা দিয়ে চলেছে। গোবিন্দ বলে দিয়েছে তাকে। প্লাবন সবদিকে চোখ রাখবে। আমরা কর্তার নিমক খাই। তাঁর কোন ক্ষতি হোক আমরা চাই না।

তাই প্লাবন বুকের ছাতি ফুলিয়ে তাকিয়ে আছে জলের অনেক দূরে। মাঝে মাঝে চোখ দুটো তুলে দিচ্ছে ওপরে। মুখে তার কোন কথা নেই। সে সাধারণত কথা বলেই না। বড় বড় চোখ। বয়স কত হবে? চব্বিশ, পঁচিশ! গোবিন্দর মতো মাথাভর্তি চুল নয়। ছোট ছোট কদম ছাঁট চুল।

ওপাশে ছইয়ের মধ্যে এসব কোন কিছুর ঢেউ নেই। কালবৈশাখী আসুক আর বজরা উলটে যাক্। সে সব বুঝবে অন্য লোক।

নির্মলা, মহামায়া খুশি কালীঘাট দর্শনে। কত পুণ্য করলে তবে কালীদর্শন করা যায়। এ যে কোনদিন সম্ভব হবে তাঁদের ধারণাই ছিল না। তাঁরা দুজনে সেই সব আলোচনাই করে।

নির্মলা বলেন, দিদি আর জন্মে বোধ হয় অনেক পুণ্য করেছিলাম, তাই এ জন্মে এত সুখ। সুখের সোনালী মায়ায় ভাসতে ভাসতে দুটি নারী বজরার মধ্যে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকেন।

সুমন্ত দুষ্মন্তকে বলে চলেছে—ধর যদি বজরা উলটে যায়। খুব ঝড় এল। আমাদের বজরা তীরের দিকে এগোতে পারল না।

জল ফুলে উঠল। নদীর জল আর বৃষ্টির জল এক হয়ে গেল। তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। তুই তো সাঁতার জানিস না তাহলে কি করবি?

দুষ্মন্ত একমনে বড় ভাইয়ের কথা শোনে। তারপর বলে—তুইও কি সাঁতার জানিস্?

সুমন্ত কিছুদিন লেঠেলদের সঙ্গে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে সাঁতার শিখেছিল তবে এখনও পুরো সাঁতার শেখেনি। জলে ছেড়ে দিলে সে হাঁপিয়ে ওঠে।

সে কথা দুষ্মন্ত জানে।

সুমন্ত সাঁতার নয়, ঘোড়ায় চড়াও শিখছিল। রাঘববাবুর নির্দেশ। সেটাও এখনও পুরোপুরি শেখেনি।

দুষ্মন্তর দুঃখ সে দাদার চেয়ে কেন বড় হল না. তাহলে তো সেই আগে এসব শিখত। যাই হোক তার আনন্দ. দাদা এখনও কিছুই ভালভাবে শিখতে পারে নি।

সেই কথা সে ঠোঁট উলটে বলল আমি না হয় এখনও সাঁতার শিখিনি, তুই কি পুরো শিখেছিস্? দেখ না জলের দিকে তাকিয়ে।

নদীর জল তখন ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথাল পাথাল করছিল।

সেইদিকে তাকিয়ে সরলা হঠাৎ হেসে উঠল।

সুভদ্রাও পাশে ছিল। সেও শুনেছে দুই ভাইয়ের কথা।

সত্যিই যদি ঝড় আসে, আর বজরা উলটে যায় তাহলে কেউ তারা বাঁচবে না এক বাবা ছাড়া কেউ সাঁতার জানে না।

কিন্তু সুভদ্রা বাঁচতে চায় না। সুভদ্রার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। থমথমে মুখ। সরলার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলে না।

সরলা আজকাল আবার আগের মত দুষ্টুমি করতে আরম্ভ করেছে। আজকাল যেন তার আর একটু সাহস হয়েছে।

সে যেন কুমারী মেয়ে নয়। কুমারীত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিবাহিত জীবনে যেন প্রবেশ করেছে। বিবাহিত জীবনে যেমন সব গোপনতার উন্মোচন হয়, তেমনি সরলা আর এক ধাপ এগিয়ে এসেছে।

কখনও কোন পুরুষমানুষ দেখে সে কোন মন্তব্য করেনি। বরং ওসব ব্যাপারে সে একটু আনমনাই থাকত।

প্লাবন বজরার ধারে পাটাতনে ঘুরে বেড়ায়। তার লাঠি মাঝে মাঝে পাটাতনের ওপর শব্দ জাগায়। প্লাবনের চওড়া বুকের ওপর সূর্যের আলো। ঘোলা জলে ছায়া পড়েছে তার গায়ের। সে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

সুভদ্রার এসব দিকে মন ছিল না। হঠাৎ একদিন সরলাই সুভদ্রার গায়ে চিমটি কেটে বলল এই ভদ্রা, দেখ.'

সুভদ্রা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল প্লাবনকে। অন্যদিন হলে সুভদ্রা সরলাকে রেগে কিছু বলতে যেত কিন্তু একদিন কিছু বলল না। তাকিয়ে থাকল প্লাবনের দিকে।

সরলা মুচকি হাসল। বুকটা কি চওড়া দেখছিস্ ভদ্রা?

সুভদ্রা তাতেও কোন কথা বলল না।

রাত গভীর। বজরা চলেছে দাঁড়ের শব্দ তুলে। ওপাশে মাঝিরা ছইয়ের আড়ালে। এপাশে গোবিন্দ ঢালী ছইয়ের ওপর বসে।

ভেতরে সবাই ঘুমিয়ে গেছে। রাঘববাবুও কিছুক্ষণ ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর ঘুম আসতে ভেতরে গিয়ে ঢুকেছেন।

চন্দ্রালোকিত আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত। আলোর মালা পড়ে নদীর জল নৃত্যের ছন্দে নেচে চলেছে।

প্লাবন হেঁটে চলেছে সেই আলোর পথ ধরে।

গোবিন্দ ঢালী প্লাবনকে এ বজরায় এনে একটু নিশ্চিন্ত। তাই ঘুম এলেও তার ভয়ের কিছু নেই। সেই ঘুমই বোধ হয় আসছিল গোবিন্দ ঢালীর। বোঝা যাচ্ছিল না। ছইয়ের মাথার ওপর উবু হয়ে বসে সে তাকিয়েছিল। ভাঁটার মতো চোখ দুটো অন্ধকারেও জলে। সেই ভাঁটার মতো চোখ দুটো কেমন যেন বধির।

সুভদ্রা নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ছইয়ের বাইরে। ঘরে সবাই ঘুমিয়ে। এমন কি সরলাও এইমাত্র জেগেছিল, জেগে জেগে নানাধরনের গল্প করছিল। তারপর তার গল্প বন্ধ হয়ে গেল।

সুভদ্রার ঘুম আসছিল না বলে বাইরে এসে দাঁড়াল। আর তখনই সে দেখতে পেল প্লাবনকে। আজ কাল প্লাবনকে নিয়ে সরলা অনেক রঙ্গ তামাসা করে। অবশ্য

মামাবাবুকে লুকিয়েই করে। সরলার আজকাল মুখের আকঢাক খুব কম।

এই দিদি দেখ,. লাঠিটা কেমন জড়িয়ে ধরেছে লোকটা। যেন···। এই বলে সরলা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আর একদিন। জানলা দিয়ে সরলা প্লাবনকে ডাকল।

আর প্লাবন সঙ্গে সঙ্গে কাছে এগিয়ে এল।

সরলা হেসে বলল—তোমাকে ডাকি নি তো !

প্লাবন সরে গেল নিজের জায়গায়।

তবু সুভদ্রার মুখে কথা যোগায় না।

সেই সুভদ্রা বাইরে এসে চাঁদের আলোয় প্লাবনকে দেখে চমকাল তবে কি সুভদ্রা মনে মনে অসম্ভব কিছু একটা ভাবছে ? বোঝা যায় না।

বজরার পাটাতনে এপাশে আর কেউ ছিল না। ওপাশে মাঝিরা। গোবিন্দ ঢালী চোখ বুজিয়ে আছে। হয়ত বসে বসেই ঘুমোচ্ছে।

সে সব কিছুতেই সুভদ্রা ভ্রূক্ষেপ করল না। তাব মনেব মধ্যে কি যেন হতে লাগল। নিজের অবস্থা দেখে নিজেই বিস্মিত হল।

প্লাবনও প্রভু কন্যাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কি ভেবে চলতে শুরু করেছে।

সুভদ্রা দেখল। প্লাবন পায়চারি করতে করতে চলে গেল বজরার শেষ মাথা পর্যন্ত। ও তার পিঠ দেখল। চওড়া পিঠ। শক্ত, মজবুত লোহার পাতের মতো পিঠের চাতালটা।

আবার ফিরে এল প্লাবন।

এবার সম্পূর্ণ মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চওড়া বুক। হাত পাগুলি যেন শালগাছের গুড়ি। তাকিয়ে আছে বড় বড় চোখ ! চোখের দৃষ্টিটা কোনদিকে বোঝা যায় না।

সুভদ্রা যে দাঁড়িয়ে আছে সে বোধ হয় লক্ষ্য করেও করে না।

যেমন সামনের দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসে, তেমনি এল একেবারে সুভদ্রার কাছ পর্যন্ত। ভয়ে সুভদ্রার বুকটা কেঁপে উঠল।

সরলার সেই সুদর্শনের কথা সুভদ্রার মনে এল। সরলা যদি সুদর্শনকে না পেত তাহলে বেশ ভাল হত। তাহলে এত খুশি থাকত কোথায় ! সরলা যেন খুশিতে আর কাউকে তোয়াক্কাই করে না।

কিন্তু না, প্লাবন শুধু লেঠেলই। প্রভুর নুন খাওয়া চাকর। প্রভু কন্যাকে কিছু বলতে পারে না।

প্লাবন পিছন ফিরে আবার চলে যায়।

সুভদ্রার কেমন যেন রাগ হয়। ইচ্ছে করে, চিৎকার করে সবাইকে জাগিয়ে তোলে। তারপর মিথ্যা বানিয়ে বলে। লোকটা আমার গায়ে হাত দিয়েছিল। এ কথা বললেই ঐ দাম্ভিক লোকটার সব অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যাবে। আর গোবিন্দ ঢালী ঐ যে বসে বসে ঘুমচ্ছে, সে লাফিয়ে উঠবে।

বাবা বেরিয়ে আসবে। তারপরের কথাটা আর চিন্তা করতেও পারে না সুভদ্রা। প্লাবনের ঐ লোহার মত শক্ত মজবুত দেহটা বাবা আর গোবিন্দ ঢালী দুজনে ফালা ফালা করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে।

এসব কথা ভেবে সুভদ্রা আর একবার প্লাবনের দিকে তাকাল। প্লাবন তখন পিছন ফিরে এগিয়ে চলেছে। সুভদ্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঘষল। নিশ্চুপ রাত্রির দিকে তাকাল। চাঁদের আলোতেও ওপারটা দেখা যায় না। নদীর জলটা কেমন তোলপাড় বুকটাও তার কেমন তোলপাড় করতে লাগল। বুকের ভেতরটা অজস্র ব্যথা।

ব্যথা কেন সে জানে না? ভেবেছিল কলকাতায় তার কোন একটা ব্যবস্থা হবে। বাবা নিশ্চয় কোন পাত্র ঠিক করে ফেলবেন।

মা বাবাকে বলেও ছিলেন।

বাবা তার উত্তরে বলেছেন, মেয়ের তোমার সাহেবদের সঙ্গে বিয়ে দেবে?

ওমা সেকি কথা?

রাঘব চৌধুরী তার উত্তরে আরও গম্ভীর হয়েছেন। ঠিকই বলছি, এখানে এখন সাহেব পাত্রই পাওয়া যাচ্ছে। তারা সব নেটিভ মেয়ে বিয়ে করতে চায়।

কেন আমাদের স্বজাতি কোন পাত্র নেই? কাজকর্ম করে। বংশ গৌরব আছে। দেখতে শুনতে ভাল। অন্তত জামাই বলে যেন গর্ব করতে পারি।

সুভদ্রা তারই কাছাকাছি ছিল। শুনে রাঙা হয়েছিল।

রাঘববাবু স্ত্রীর কথা শুনে হাঃ হাঃ করে হেসেছিলেন। সবই তো তুমি চাইলে, আর বাকী কি থাকল? তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—বুঝলে নির্মলা, এখানে তোমার মেয়ের জন্যে পাত্র পাওয়া যাবে না। এখানকার সব ছেলেরা এখন অন্য সখে মজেছে। বিশেষ করে বনেদী ঘরের ছেলেরা। তারা বিলিতী মদ খাচ্ছে, দিনের বেলা পায়রা ওড়াচ্ছে, আর রাতের বেলা বাঈজী বাড়ী যাচ্ছে।

তবু হয়ত পাত্র একটা জুটত।

যদুপতি হালদার একদিন এসে সুভদ্রার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—লক্ষ্মী প্রতিমা আমার। একটা পাত্রের খোঁজ পেয়েছি। গোবিন্দপুরের রাধাকৃষ্ণ রায়, তাঁরই ভাইপো। কথাটা পেড়ে এসেছি, তবে উত্তর পাই নি।

কিন্তু উত্তর কোনদিনও আর পাওয়া যাবে না।

তার আগেই পাততাড়ি গুটিয়ে বাবা বজরা ছাড়লেন।

সুভদ্রা ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাবার যেন ইচ্ছেই নয় তার বিয়ে হোক্। বাবা না দেয় না দিকগে। সে চরমারিতে ফিরে গিয়ে যা খুশি করবে।

চৌধুরী বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যাবে। তারপর তো গ্রামের ছেলে ছোকরারা আছে। তখন বাবার চৈতন্য হয় কিনা দেখবে। চোখে টলটলে জল নিয়ে সুভদ্রা আবার সরলার পাশে শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ একদিন রাঘবচৌধুরী চিৎকার করে উঠলেন।

ঈশান কোণে মেঘ। কালো ধোঁযার মত মেঘের কুণ্ডলি থরে থরে জমছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের মুহূর্ত। রোদের আভা তখনও কড়া। কিন্তু সবই হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল।

এরকম আগে কখনও হয়নি। প্রায়ই কিছু কিছু মেঘ জমে। দিনের আলো কমে আসে।

পাল নামিযে ফেলে মাঝিরা।

গোবিন্দ ঢালীর বয়স হলেও বয়সের পরিমাপ সে মানে না। কাপড় মালকোচা মারাই থাকে। কাঠবেড়ালীর মত নিজেই মাঝিদের আগে উঠে যায়। শক্ত করে দড়ি খুলে পাল নামাতে সাহায্য করে।

তারপর মেঘ সরে যায়। বাতাসের যে দৈত্যের ভাবটা উঠেছিল সেটা আস্তে আস্তে কমে যায। বজরা তিনখানি খুব জোরে জোরে দুলছিল, সে দোলাটা কমে যায়।

মেয়েরা যে ভয়টা পেয়েছিল তাও থাকে না। রাঘবচৌধুরীর মুখের ওপর থেকে চিন্তার ছায়াটা সরে যায়। তবে সবাই জানত ঝড় একদিন আসবে, সেদিনের জন্যে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

কালবৈশাখীর কথা শুনে মহামায়া বলেছিলেন—এই বিপদ নিয়ে এখন চরমারিতে না ফিরলেই হত ?

কিন্তু বলেই নিজেকে সংবরণ করেছিলেন।

চরমারিতে ফেরার তাড়া তাঁরই। সরলার বিযে না হলে যাওয়া পর্যন্ত তো নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

সেই ঝড়ই শেষ পর্যন্ত এল।

শুধু ঝড় নয় জলও !

রাঘবচৌধুরী চিৎকার করতে লাগলেন। পাল নামানো হয়ে গেছে। গোবিন্দ ঢালী মাঝিদের নিদেশ দিয়েছে, বজরা তীরে ভেড়ানোর জন্যে।

কিন্তু তীর কোথায় ? দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ঘাট। সে ঘাটে পৌছতে গেলে ঝড় এসে সব ওলোট পালট করে দেবে। সামনের যে তীর, তাও খুব কাছে নয় কিন্তু সেখানে বজরা ভেড়াতেও মন সরে না।

নদীর ধারটা কি নির্মল। মনে হয় কোন গ্রাম আশে পাশে নেই। লোকালয়হীন ধূ ধূ প্রান্তরে শুধু বড় বড় গাছের সারি। সেই লম্বা লম্বা গাছের পাতায় ভরা মাথা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে ভীষণভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

গোবিন্দ ঢালী উপায় না দেখে অগত্যাই সেই দিকেই বজরা নিয়ে যাবার জন্যে মাঝিদের নির্দেশ দিল। কিন্তু বজরা আর শেষপর্যন্ত নিয়ে যেতে হল না। প্রলয় শুরু হয়ে গেল। নদীর জল ফুলে ফেঁপে একাকার হয়ে গেল। এদিকে ঝড়ের তাণ্ডব। সাঁ সাঁ শব্দের সঙ্গে আরও অন্য শব্দের ঐকতান মিশল।

মাঝিরা তবু বজরা তীরে ভেড়াবার চেষ্টা করল। গোবিন্দ ঢালী উত্তেজিত স্বরে চিৎকার করতে লাগল। কবার সে লাঠিটা ঝড়ের মুখেই ঘুরিয়ে নিল। যেন ঝড়কে

সে লাঠির ঘায়ে দাবিয়ে দেবে।

তিনখানি ভারি বজরা তুচ্ছ তিনটি মোচার খোলার মতো নদীর জল আর ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লাগল।

মেয়েরা ছইয়ের মধ্যে চিৎকার করে উঠল। কেউ কেউ বেরিয়ে এল।

রাঘবচৌধুরী তাদের ঠেলে দিলেন ছইয়ের মধ্যে। অনেক কষ্টে বজরা তিনখানির মুখ ঘোরানো হল।

কিন্তু তারপরেই সব ওলোটপালট। কি যে তারপর হল কেউ জানে না।

শুধু ভয়ের চোটে সরলা, সুভদ্রা ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। বাঁচবার জন্যে মরীয়া হয়ে চিৎকার করেছিল।

সুভদ্রা একদিন মরতে চেয়েছিল কিন্তু মরণ সামনে দেখে সে বাঁচবার জন্যে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল। সরলা সুভদ্রাকে ধরে টানে, সুভদ্রা সরলাকে। তাছাড়া পড়ে যাবার সম্ভাবনা। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। স্থির হয়ে দাঁড়ানো যায় না।

সুভদ্রা চিৎকার করে ডাকে—বাবা!

সরলা ডাকে - মামাবাবু!

রাঘবচৌধুরীর ক্ষীণ আওয়াজ যেন শোনা যায়, সে বজরায় না কোথায় বোঝা যায় না।

হঠাৎ অনেক কাছে কে যেন এসে দাঁড়ায়। ওরা দুজনেই তাকিয়ে দেখে প্লাবন। প্লাবন কিছু বলতে যায়। প্লাবন সরলার হাত ধরতে চায়।

সরলা ঐ বিপদের মধ্যেও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে—না, না তুমি সুভদ্রার হাত ধর।

প্লাবন সুভদ্রার হাতটা চেপে ধরে। সরলা সুভদ্রার হাত। তারপর আর তাদের কিছু মনে নেই।

কেমন করে পার করেছিল অশ্রান্ত জলের কল্লোলের ওপর দিয়ে দুটি যৌবনবতী মেয়েকে সে প্লাবনই জানে।

যখন দুজনের চেতনা ফেরে, তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। তখনও জলের কল্লোল, ঝড়ের দাপট, সে এক সীমাহীন দুর্যোগ, আকাশ বাতাস এক হয়ে ছুটোছুটি করে চলেছে।

বজরা তিনখানি পাড়ের কাছে আনা হয়েছে। পাড়ের কাছে তিনটি ভারী বজরা তিনখণ্ড তুচ্ছ পলকা জিনিসের মত লাফাচ্ছে।

শুধু লাফাচ্ছে না, মাঝে মাঝে অনেকখানি শূন্যে উঠে আবার আছড়ে পড়ছে নদীর অশ্রান্ত জলের ওপর।

মনে হচ্ছে এখুনি যেন কাঠগুলি টুকরো টুকরো হয়ে আলাদা হয়ে যাবে বজরাগুলি। পালগুলি ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার।।

পালের কাপড়গুলি যে কোথায় উধাও হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

এদিকে অন্ধকারও নেমে আসছে। আগে যে মেঘের জন্যে অন্ধকার নেমেছিল সে অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। ঝড়ের বেগও ধীরে ধীরে কমতে লাগল।

পাড়ের যে খোলা জমির ওপর আশে পাশে বড় বড় গাছ ছিল, সেগুলি আগে প্রচণ্ডভাবে দুলছিল, শব্দ করছিল, ভাঙছিল, তাদের সে প্রতাপ ধীরে ধীরে কমতে লাগল।

সরলা ও সুভদ্রা বুঝতে পেরেছিল তারা বেঁচে গেছে। কিন্তু বাঁচার পরের কথা তারা ভাবতে পারছিল না। চোখের সামনে শুধু প্রলয়ের ঝটিকা। তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কাপড় চোপড় বার বার ঠিক করতে করতে আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না। উলটে যেন কে ফেলে দেয়।

এই সময়ে অনেকদূর থেকে রাঘববাবুর গলা শোনা যায়—ভদ্রা, সরু।

রাঘববাবুর গলা অতো ভরাট, কথা বললে যেন গমগম শব্দ হয়। সেই রাঘববাবুর গলার স্বর যেন রোগাক্রান্ত দুর্বল মানুষের মত মনে হয়।

তিনি যে অনেকদূর থেকে চিৎকার করছিলেন বোঝা যায়।

সরলা উত্তর দেয়—মামাবাবু, আমরা এখানে ?

সে স্বর দুরন্ত বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় উড়ে যায়।

সরলা, সুভদ্রাকে ছাড়েনি। সুভদ্রাও জাপটে ছিল সরলাকে। এক হাতে সরলার কোমর চেপে ধরেছে। অন্য হাতে বুকের আঁচল সামলাচ্ছে। কিন্তু আঁচলটা কিছুতেই ভরাট বুকে চাপা থাকে না। আঁচল ঠিক করতে গিয়ে পায়ের কাপড় ওপরে উঠে যায়।

শেষকালে কিছুই না ঠিক রাখতে পেরে রাগ করে সব ঢাকাঢাকি ছেড়ে দিয়েছে। তার আঁচল উড়ছে। দেহ থেকে কাপড়খানি সব চলে যাবার চেষ্টা করছে। তবু সে চুপ করে সরলাকে ধরে আছে।

সরলারও কাপড় চোপড়ের অবস্থা তেমনি কিন্তু সে আগে থেকেই কোন চেষ্টা করেনি।

শুধু একসময়ে নিজেকে প৺. থেকে সামলাতে সামলাতে বলল—কিরে বাবা, শেষকালে কি কাপড় চোপড়ও খুলে পালাবে।

সরলা তার মধ্যেও খিল খিল করে হে.েস উঠল।

হঠাৎ পিছনে গরম নিঃশ্বাসের মত তাপ লাগল।

দুজনেই ভয় পেল। কোন হিংস্র জন্তু ভেবে আতঙ্কে পিছনে তাকাল। কিন্তু দুজনেই নিশ্চিন্ত হয়, সেই লোকটা। যাকে দেখে সরলা কৌতুক করত। যে বজরার মধ্যে হাত চেপে ধরে তাদের বাঁচিয়েছিল।

প্লাবন ঠিক দুজনার পিছনে বুকের অ ঃলে তাদের রেখে দাঁড়িয়েছিল। প্রশস্ত বুকের মাঝে দুটি আগুনের মত যৌবনের মেয়ে। সুভদ্রার পিঠে লাগছিল প্লাবনের চাপা উষ্ণ নিঃশ্বাস।

সুভদ্রা অনেকক্ষণই টের পেয়েছিল পিঠটা যেন পুড়ছে। কিন্তু কিসে পুড়ছে তা টের পায় নি। তা ছাড়া তখন ছিল অন্য এক ভয়ঙ্কর চিন্তা। বরং সে প্লাবনের উপস্থিতি ভেবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

• সেই রাতের কথা মনে পড়ে।

প্লাবনের অহঙ্কারই যেন বার বার চোখের উপর ভাসে। লোকটার কি দেহটার মধ্যে কোন হৃদয় নেই? অন্তত সে রাত্রে একবার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত। চোখের চাউনি দিয়ে বরণ করতে পারত। প্রভুকন্যা বলে সমীহ, সেটা কি খুব বেশী ভাবা নয়?

অন্তত নারীজীবনের একটা পূজা মিলত। মনের মধ্যে যে হাহাকার, যে রিক্ততা, :সেই শূন্য মরুভূমিতে একটু জলের সন্ধান পেত।

কিন্তু সেই প্লাবন শুধু লেঠেলই। প্রভুর নুন খাওয়া চাকর। রক্তমাংস বলে তার কিছু নেই। তবু পিছনে সেই মানুষটার উপস্থিতি ভেবে সুভদ্রা রোমাঞ্চিত হল। সুগঠিত দেহের কথা ভাবল। বুকটা কি চওড়া। আর হাত দুটো?

সুভদ্রা মনে মনে কি ভেবে শিউরে উঠল। সরলাকে ছেড়ে দিয়ে দুপা পিছিয়ে গেল।

ঝড়ের বেগ তখন প্রায় কমে এসেছে। তবু কিছুটা ছিল। আগের মত সেই দামাল রূপ নেই। সরলা কি ভেবে লুটোনো আঁচলটা তুলে নিয়েছিল। হয়ত তার লজ্জাও করছিল। একহাতে সুভদ্রার হাত চেপে রেখেছিল। হঠাৎ সেই হাতটা সরে যেতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে সেই হাতটা চেপে ধরতে গেল।

চাপাস্বরে সরলা একটু গজন করে বলল—কি রে তুই যাচ্ছিস কোথায়? এই দিদি?

সুভদ্রার বেশ মজা লাগছিল। এমন অনুভূতি কি সচরাচর পাওয়া যায়? তাছাড়া এ নতুন। বিয়ে তার হয় নি। পুরুষের স্পর্শ এখনও মেলেনি। তবু সেই পুরুষের স্পর্শের মধ্যে এত স্বাদ।

প্লাবন কোন স্পর্শও করে নি। শুধু খুব কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুভদ্রাই বরং একটু সরে গিয়ে বুকে ঠেসান দিতে চাইল কিন্তু পারল না। অতোটা বেপরোয়া সাহস তার হল না।

তবু তার মজা লাগছিল। এখন মরতে তার কোন ক্ষতি নেই। মৃত্যু এলেও অন্তত একটা স্মৃতি নিয়ে তো মরতে পারবে? তাই সরলার ভয়ের কথায় সে ঐ অবস্থায় কৌতুকে মুখ রাঙাল। সরলার কানে কানে বলল—যাচ্ছি অভিসারে।

সরলা এসময়ে এ কথা শুনে অবাক হল। সুভদ্রার দিকে দেখবার চেষ্টা করল কিন্তু অন্ধকারের জন্যে দেখতে পেল না। তবু সে চপল; চপল কিছু দেখতে পেলেই স্বভাবকে আর দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সেও চাপাস্বরে উত্তর দিল, এখন যাস্‌নি ভাই দিদি বড় অন্ধকার।

অন্ধকারেই তো জমে ভাল। সুভদ্রা যেন সেই সুভদ্রা নয়।

সরলা একটু অবাক হল। অবাক হয়ে সুভদ্রার হাতটা আবার চেপে ধরতে

গেল।

তুই কি দিদি পাগল হয়ে গেলি?

দিদি নয়, সুভদ্রা বলবি আমাকে?

সরলা আরও অবাক হল। হাত দিয়ে হাতটি অনুভব করে বুঝতে চায় সুভদ্রা কি না।

হঠাৎ সরলা বলল—মনে মনে তুই যে এত শয়তান, জানতাম নাতো! পিছনের মানুষটিকে বুঝি মনে ধরেছে

ধরবেই তো! আমিও কি তোর মত হতে পারি না

কিন্তু ও তো একটা লেঠেল। তোর কি রুচিটা শেষকালে নেমে গেছে?

না পেলে সবই চালিয়ে দিতে হয়।

কিন্তু মামাবাবু জানতে পারলে?

বয়েই গেল। জানতে পারলে কি আমার গলা কেটে নেবে?

কিন্তু তারপর যে বিয়ে হবে না? দুর্নাম নিবি।

বিয়ে যে আমার হবে না তা আমি জানি।

ধ্যেৎ তা কি করে হয়? মামাবাবু ঠিক তোর জন্যে পাত্র খুঁজে আনবেন।

আনবেন না ছাই! তোর একটা জুটছে বলে তুই এসব সান্ত্বনা দিচ্ছিস্।

সরলা কিছুতে বুঝতে পারছিল না, সুভদ্রা কথা বলছে। তাই বারবার অন্ধকারে চোখ জেলে সুভদ্রার মুখ দেখবার চেষ্টা করে।

তারপর হঠাৎ খিল খিল করে হেসে বলে—দিদি, তোর মনে মনে এতো ছিল? একটু হাত ধরতেই এই?

সুভদ্রা জানত, যখন তাদের প্লাবন বজরা থেকে কোলে করে তুলে নিয়ে এসেছিল। সরলা জানে কিনা সে জানে না। তবে তাকে নিয়ে আসার সময়ে তার জ্ঞান ছিল। সে চোখ বুজিয়ে পড়েছিল একটি বলিষ্ঠ হাতের বাহুবন্ধনে।

সুভদ্রার সমস্ত দেহটা তখন শিউরে উঠেছিল।

প্লাবন আরও হয়ত তখন কিছু করতে পারত! কিন্তু সে করে নি। বোধ হয় প্রভুকন্যা ভেবে।

সে কথা ভেবে সুভদ্রার আরও রাগ হতে লাগল।

মানুষটা পিছনেই আছে। যেন দৈত্যের মত আড়াল করে আছে। দৈত্যও ঠিক নয়। চৌধুরী বাড়ীর কোন নির্জীব স্তম্ভ। স্তম্ভের যেমন কোন ক্ষমতা নেই, তেমনি পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষমতাহীনভাবে।

এই সব কথা মনের মধ্যে এলেও সুভদ্রা সরলাকে উত্তরদিল বেশ অন্য মেজাজ নিয়ে। চাপাস্বরে বলল—লোকটা কি শুধু হাত ধরেছিল? কেন তোর মনে নেই, লোকটা আমাদের আনল বজরা থেকে কি করে?

সরলার মনে ছিল না, বলল—কি করে রে?

সুভদ্রা মাথা ঝাঁকিয়ে অন্ধকারে একটু হাসল। লোকটা তো পিছনেই আছে,

বোকা তো নয়, জিজ্ঞেস কর না।

না, না, আমি জিজ্ঞেস করতে পারব না। তুই যদি জানিস্ তো বল্।

কেন তোর মনে নেই? তোকেও তো ও অমনিভাবে এনেছিল।

সরলা স্মরণ করবার চেষ্টা করল. না আমার কিছু মনে নেই। বোধ হয় বিপদ দেখে জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

তবে তোর শুনে কোন কাজ নেই। সুভদ্রা মুখ ফেরায়।

বল্ না দিদি! কি যে করিস্?

আবার দিদি বলছিস্?

কেন দিদি বললে কি হয়?

সুভদ্রা কোপ প্রকাশ করল। না দিদি বলবি না। দিদি বললে অনেক বড দেখায়। আমি কি বুড়ি নাকি?

আচ্ছা, আচ্ছা আর দিদি বলবো না।

সরলা ছেলেমানুষ হয়ে যায়। নে বল্ কি করে এনেছিল?

এই সময়ে অনেক কাছে গোবিন্দ ঢালীর গলা শোনা যায়। মেয়েদুটো যে গেল কোথায়? প্লাবনকেওতো দেখছি না।

সুভদ্রা সরলাকে চাপাস্বরে বলল—এই খবরদার, আমরা যে এখানে আছি জানাস্ নি?

সুভদ্রার পিঠে তখনও প্লাবনের নিঃশ্বাস পড়ছিল।

প্লাবন সরছিলও না, সেখান থেকে বা কিছু বলছিল না।

ঝড় থেমে গেছে। অন্ধকার আস্তে আস্তে সরে গিয়ে আকাশে তারা ফুটছে। বজরা তিনখানিও দেখা যাচ্ছে। ওপাশে কতকগুলি মানুষ চলাফেরা করছে। তাদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে।

ওপাশে গভীর জঙ্গলের মত খানিকটা। জঙ্গলের ভয়াবহতা যেন এ পাশে ভয় জাগায়। সরলা বলল—দিদি, ভয় করছে। ওরাতো ওপাশে খুঁজছে, একটু সাড়া দে না। যদি আমাদের না পেয়ে চলে যায়?

সুভদ্রা কৌতুক করে কি বলতে গেল। পিছন ফিরে দেখে, প্লাবন সেখানে থেকে সরে গেছে। প্লাবন তখন ছুটছে সেই দূরের মানুষগুলির উদ্দেশ্যে। বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। মেঘ সরে গিয়ে জ্যোৎস্না ফুটছে। আলো স্পষ্ট নয়, তবু সব দেখা যায়।

সরলা বলল—তুই যে সব বললি, লোকটা কিন্তু শুনল।

শুনল তো বয়েই গেল। চাকর চাকরই। সুভদ্রা ঠোঁট ওলটাল।

তুই হঠাৎ এমন হয়ে গেলি কেন রে ভদ্রা? এই লোকটা আমাদের কি করে এনেছিল?

সুভদ্রা তখন হাত দুটো তুলে ভঙ্গি করে বলল– এমনি কোলে করে?

অ্যাঁ! সরলা গালে হাত দিল। লোকটার তো খুব আস্পর্দ্ধা! দাঁড়াও মামা-

বাবুকে বলে দিচ্ছি ?

সুভদ্রা ভেংচাল। মামাবাবুকে বলে দিচ্ছি। কোলে করে না আনলে জল দিয়ে কি করে আনত ? বজরা তখন পাড়ের কাছে এসেছিল তাই ভাগ্যিস্ ! না হলে জড়িয়ে ধরে সাঁতার কেটে এনে ডাঙায় তুলত।

যাঃ ! সরলা লজ্জায় মুখ রাঙাল।

সুভদ্রা বলল—আসলে কি জানিস্ ? লোকটা বোকা বোকা বটে কিন্তু পেটে পেটে শয়তানী। আর তোকেই মনে হয় লোকটা একটু ইয়ে করে। এই বলে সুভদ্রা কষ্টে হাসল।.

সরলা রাগ করল, শাসিয়ে বলল—দাঁড়াও মামাবাবু শুনলেই কেটে দুখানা করে জলে ভাসিয়ে দেবেন।

সরলা রাগ করল কিন্তু সুভদ্রা করল না। সুভদ্রা শুধু এক সময়ে মুখে উজ্জ্বল আভা টেনে বলল—তা' হোক, বেশ লাগে। এরকম একটু আধটু সুখ জীবনে এলে ক্ষতি কি ? ছেলেরাও তো কত করে ? তারা কি মেয়ে দেখে তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না ?

এই সময়ে রাঘববাবুর দলবল নিয়ে তাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

নির্মলা, মহামায়া মেয়েদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তোরা যে বেঁচে আছিস। ওফ কি যে ভাবনা হয়েছিল ?

রাঘববাবু মাঝিদের নির্দেশ দিলেন—আর বিশেষ দেরী করার দরকার নেই। যখন সবাইকে পাওয়া গেছে তখন বজরা ছাড়ার ব্যবস্থা কর।

বজরারও আগের সেই অক্ষত অবস্থা ছিল না। অনেক অংশ ভেঙে গেছে। দ্বিতীয় বজরারও সাংসারিক জিনিসপত্তর সবই উধাও।

কদিন জীবন ধারণের জন্যে কিছু পাওয়া যাবে কিনা তাই হাঁতড়ে হাঁতড়ে দেখা হতে লাগল।

কিছু পাওয়া গেল। যা পাওয়া গেল তাতে এতগুলি মানুষের চলবে না বলে রাঘববাবু গালে হাত দিলেন। তারপর ঠিক হল; পথে কোথাও হাট দেখলে জিনিসপত্তর কিনে নেওয়া হবে।

পাল টাল ঠিক করতে আরও ঘণ্টাকয়েক লাগল।

রাঘববাবুর পুরো পরিবার দাঁড়িয়ে থাকল সেই নির্জন, পতিত, লোকালয়হীন জঙ্গলের ধারে। লেঠেলরা প্রভুর পরিবারকে পাহারা দিয়ে চলল।

জঙ্গল থেকে কোন হিংস্র জন্তুর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। অথচ সবাই কেমন যেন ত্রাসে থাকল। শুধু জোনাকিরা ঘুরে ফিরে আলো দিয়ে যেতে লাগল। রাঘববাবু এক সময়ে বললেন—সম্ভবত এ বনে কোন জন্তু জানোয়ার নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরকম যেন বিকট আকার শব্দ নিস্তব্ধতাকে ছাড়িয়ে গর্জন করে উঠল।

সবারই হাতে লাঠি ও বর্শা।

মহামায়া মা কালী, মা কালী, বাবা তারকনাথ ইত্যাদি একমনে উদাত্তস্বরে

জপতে লাগলেন। কিন্তু আর কোন গর্জন হল না।

তারপর অনেক পরে রাঘববাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন- ওটা বোধ হয় পেঁচা ধরনের কিছু ছিল।

চাঁদের আলোয় চারিদিক যেন হাসছে। সবকিছু দিনের মত স্পষ্ট। তাই ভয়টাও অনেক কম।

গোবিন্দ ঢালী তখন বজরা তিনখানি ঘুরে ঘুরে তদারক করে চলেছে। হুকুম দিচ্ছে বেশ গলা তুলে। পাশে প্লাবন। প্লাবনও নির্দেশ পালন করছে। প্লাবনকে দেখে বোঝা যায় না তার মনে কোন আলোড়ন জেগেছে।

সরলা সেই প্লাবনের দিকে তাকিয়েই ভাবছিল, মামাবাবুকে কিছু বলবে কিনা। তারপর কি ভেবে চুপ করে গেল।

তার আর কি? চরমারিতে ফিরে গেলেই বিয়ের ব্যবস্থা হবে। তারপর সুদর্শনের সঙ্গে চলে যাবে তারকেশ্বরে।

সরলা সুদর্শনের মুখখানিই ভাববার চেষ্টা করল। একসময়ে মুখ রাঙিয়ে বলল—দুষ্টু। ভারী দুষ্টু।

তারপর এক সময়ে বজরা আবার ঠিক হল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বজরাও ছাড়া হল।

বজরার মধ্যে শুধু রান্নার তোড়জোড় চলতে লাগল। আবার আগের মত সবকিছু ফিরে হল। শুধু ঝড়ের তাণ্ডবে যা হারিয়েছিল তা আর ফিরে এল না।

বজরার অনেক অংশ ভেঙে গিয়েছিল। ছইয়ের ঘরগুলিতে যে সব বিছানাপত্তর পাতা ছিল, তার অনেক অংশও নেই। যা পাওয়া গেল, তাই কোন রকমে পেতে গুছিয়ে বসা হল।

গোবিন্দ ঢালী আবার সেই ছইয়ের মাথায় বসল। প্লাবন আগের মত সেই বজরার পাটাতনে পায়চারী করতে লাগল।

রাঘববাবু নিজের ঘরে। সুভদ্রা, সরলা, সুমন্ত, দুষ্মন্ত এক ঘরে। সুমন্ত, দুষ্মন্ত আলাদা কি গল্প করছিল। তাদের মুখ চোখের ওপর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

সুভদ্রা এ পাশে তার বিছানায় শুয়েছিল। সরলা পাশে বসেছিল। সরলা মনে মনে খুব হাসছিল। কিন্তু সুভদ্রার গম্ভীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারছিল না।

তারপর এক সময়ে হাসি চাপতে চাপতে হঠাৎ ফেটে পড়ার মত হাসি তার মুখ দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে এল।

সুভদ্রা অবাক চোখ তুলে তাকাল।

সরলা আবার হাসি বন্ধ করতে গেল কিন্তু পারল না।

সুভদ্রা বিরক্ত হল, বলল—পাগলের মত অতো হাসছিস্ কেন?

হাসছি তোর কথা ভেবে। তোর মনে মনে যে এতো ছিল জানতুম না।

সুভদ্রা রাগের চোখ তুলে তাকাল।

তাতে হাসির কি হল ?

হঠাৎ সরলা হাসি বন্ধ করে বজরার ছোট্ট জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সেখানে দিয়েই দেখা গেল প্লাবনকে।

প্লাবনের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। চাঁদের আলো পড়েছে তার বুকে। চওড়া বুকের ওপর যেন আলোর যৌবন খেলা করে চলেছে। শালগাছের গুড়ির মত হাত পাগুলি যেন প্রচণ্ড এক শক্তি নিয়ে চলাফেরা করছে। সরলা সেই দিকে তাকিয়ে আবার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি লুকোল।

এই সময়ে সুমন্ত, দুষ্মন্ত কি একটা ঝগড়া করতে করতে তার কাছে এল।

সুমন্ত তাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বড় বড় চোখ করে তাকে বললো। প্রথমে দুজনেই বলতে চায়। তখন সরলা ঠিক করে দিল—বড়জন আগে বলবে, তারপর ছোটজন।

দুষ্মন্ত তাতে একটু রেগে উঠল। তারপর কি ভেবে দাদার শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকল।

কিন্তু দুজনেই কথা শেষ করতে পারল না। তর্ক শুরু হয়ে গেল।

সুমন্ত দুষ্মন্তকে বলল—তুই সাঁতার দিয়েছিস্ না হাতী। তুই সাঁতার জানিস ?

দুষ্মন্ত সত্যিই সাঁতার জানত না, তাছাড়া সে ছোট, সে রাগ না করে যুক্তি দেখাল—বিপদের সময়ে সাঁতার না জানলেও সাঁতার দেওয়া যায়।

সুমন্ত বলল—না, তুই একজনের পিঠে চড়ে ছিলিস্ আমি দেখেছি।

মিথ্যুক। আমি পিঠে চড়েছি ? আমি না তুই ? তুই তো আগে ঝড়ের শব্দ শুনে কেঁদে উঠলি ?

সুমন্ত আর ভাইয়ের সঙ্গে পারল না। শুধু গজরাতে লাগল। তাই দেখে সরলা আবার হেসে উঠল। কিন্তু সুমন্তের মুখের দিকে চেয়ে তার মায়া হল। বার বার দুষ্মন্তই বড় ভাইকে হারিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য দুষ্মন্তর যুক্তিও খণ্ডন করা যায় না।

সেই ভেবে সরলা বলল—বেশ দুষু, তুমিই না হয় সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়েছ। এখন আমার একটা কথার উত্তর দাও তো! অবশ্য দুজনেই দেবে। ধর, আমরা নেমে যাবার পর বজরাগুলি যদি ঝড়ের দাপটে কোথাও চলে যেত !

দুই ভাই মহাসমস্যায় পড়ল। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সরলা আবার হাসি লুকোবার জন্যে মুখে কাপড় চাপা দিল। বড় বড় চোখ করে বলল—ধর, ঐ জঙ্গলে অনেক বাঘ ভাল্লুক আছে, আমাদের সব এক এক করে খেয়ে নিল।

হঠাৎ দুষ্মন্ত লাফিয়ে উঠে মাথা নেড়ে বলল—ও জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক নেই, থাকলে আমরা যতক্ষণ ছিলাম কেউ না কেউ আসত।

সরলা হাসিটি যথাসম্ভব গোপন করে বলল—ধর যদি থাকত। থাকলে নিশ্চয় আমাদের সব খেয়ে ফেলত।

কখনই খেত না। দুষ্মন্ত মাথা ঝাঁকায়। • আমাদের কাছে অনেক অস্ত্র ছিল। আমরা লড়তাম।

কতদিন লড়তে ? তারপর তো একদিন হালুম করে পিছন থেকে এসে ধরত।

এতক্ষণ সুমন্ত চুপ করেছিল। সে বড় ভাই, তবু সে কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেল। মাথা ঝাকিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে বলল,—ও জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক আছে। বরং আমাদের এতজনকে দেখে তারাই বনের মধ্যে ভয়ে লুকিয়েছে।

দাদার কথায় দুষ্মন্ত হো হো করে হেসে উঠল—দাদার বুদ্ধি দেখো ! বাঘ, ভাল্লুক মানুষ দেখে ভয় পায় ?

• কথাটা কোন্‌টা ঠিক সরলাও জানে না। কিন্তু দুষ্মন্তর আস্ফালন দেখে সে হাসতে লাগল।

সুমন্ত রেগে গিয়ে বলল—ছোটদি, আমি কথাটা ঠিক বলিনি ? সুভদ্রার কানেও এসব যাছিল কিন্তু সে অনেকক্ষণই কোন কথা বলেনি। হঠাৎ এপাশে ফিরে বলল—তোরা কি লাগিয়েছিস্ ?

সরলা হেসে বলল—দেখ্, ভদ্রা, দুষুটা কি হয়েছে ? শুধু সুমুকে দাবিয়ে দিচ্ছে।

সুভদ্রা সে কথার কোন উত্তর দিল না।

সরলা সুভদ্রার কাছে সরে এল। একেবারে শরীরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সুভদ্রার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—তোর বুঝি খুব মন খারাপ লাগছে ?

সুভদ্রা হঠাৎ সরলাকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে উঠে বসল, তারপর রাগত কণ্ঠে বলল—তুই দেখছি খুব বেড়ে উঠেছিস্ ?

আমি ? সরলা চিবুকে হাত দিল।

সুভদ্রা কোন উত্তর দিল না, সরলার দিকেও তাকাল না।

সরলা এক সময়ে যাই বাবা, মুনিঋষির ধ্যান ভাঙানোর দরকার নেই বলে সরে গেল। সরে গিয়ে জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো, নদীর ঢেউ, আর মাঝে মাঝে প্লাবনের দিকে দৃষ্টি তুলে দেখতে লাগল।

বজরা আবার চলতে লাগল আগের মত।

দিন থেকে রাত, রাত থেকে দিন। মাঝে কৃষ্ণপক্ষ শুরু হল। জায়গা অনুযায়ী বজরা নোঙর করা হয়। আবার দিনের আলো ফুটলে চলতে থাকে ! পথে এক হাট থেকে কিছু চাল, আটা, খাদ্য সামগ্রী কিনে নেওয়া হল।

মাঝে মাঝে আকাশ কালো হয়। পালের জন্যে কতকগুলি, শাড়ী মেয়েদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলি জোড়া দিয়ে টাঙানো হয়েছিল।

সেই পালের বুকেও ঝড়ের ইঙ্গিত খেলা করে। তবে বড় রকম কিছু হয় না। যা য়, বজরা থামিয়ে দিয়ে বসে থাকলে কেটে যায়।

বৃষ্টিও কদিন হয়ে গেল। মেঘ গজরাল, বিদ্যুৎ চমকাল। বজরার মধ্যে মেয়েরা আবার ভয়ে কাঁপল। রাঘববাবু কবার ঘর বার করলেন। বৃষ্টিতে ভিজলেন।

গোবিন্দকে বললেন—কিছু একটা তো করা উচিত !

কিন্তু কিছু করতে হল না, আবার এক সময়ে ঝড়, জল থেমে গেল। নদীর জলস্ফীতি দেখে কখনও বজরা ছাড়ে, কখনও ছাড়ে না।

এই করতে করতে একদিন তারকেশ্বর পার হয়ে গেল।

তারকেশ্বর আসতে সুভদ্রা সরলাকে ক্ষেপাল যা না ঝাঁপিয়ে চলে যা!

সরলা তারকেশ্বর আসতেই কেমন গম্ভীর হল। তার মনেও কি যেন ঝড় ওঠে? অনেকদিন তারা তারকেশ্বর থেকে গেছে। না জানে, মানুষটা কত ছটফট করছে।

আবার মনে মনে নিজেকে কৌতুকে শাসাল। দেরী হওয়াই তো ভাল! চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে সে। সাতদিন সাতরাত উৎসব না হলে কি তাকে পাওয়া যাবে?

সেই উৎসবের স্বপ্ন সে দেখে। শুধু চরমারি নয়, আশেপাশের দু দশটা গ্রামের লোক সারাদিন ধরে আসছে। নদী দিয়ে নৌকা আসছে।

নৌকার মধ্যে কত পরিবার। কি চৌধুরী বাড়ীতে বিয়ে, তারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছে।

তাছাড়া নবাবের কাছ থেকে উপঢৌকন নিয়ে সারি বেঁধে লোক আসছে। সানাই বাজছে চৌধুরী প্রাসাদের সিংহ দরজার মাথায় রঙীন কাপড় ঘেরা তোরণে।

সন্ধ্যার সময়ে হঠাৎ বাজি পুড়তে আরম্ভ করল। কি প্রচণ্ড শব্দ সে বাজির। আলোয় আলোয় আকাশ রাঙা। সেও সাজ পরে দু'একবার বাইরের দিকে দেখে এল। তারপর বর আসছে, বর আসছে শব্দ। নদীর দিক থেকে সে শব্দ ভেসে আসছে।

এক সময়ে বর এল পাল্কী করে। তারপর অনেক রাত্রে সুদর্শনের সঙ্গে তার দেখা হল। সুদর্শন মৃদুস্বরে বলল—বাঃ বাঃ, আমার সরলা রানীকে পেতে এতো কষ্ট! তারপর তর্জনী তুলে বলল ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব, এমন কষ্ট সারাজীবন দেব যে ভুলতে পারবে না।

এই সব ভাবতে ভাবতেই তারকেশ্বর এক সময়ে পার হয়ে গেল।

মহামায়া কবার বাবা তারকনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। বললেন—বাবা তারকনাথ, ভালোয় ভালোয় তীর্থযাত্রা শেষ করলেন।

রাঘববাবু তখন ভাবছেন, মুর্শিদাবাদটা পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

তখন মুর্শিদাবাদ আসতে অনেক দেরী। তবু মুর্শিদাবাদের কথাটাই রাঘববাবুর মনে আসছিল। হাজী আহম্মদকে তিনি চেনেন—লোকটির মত শয়তান বোধহয় পৃথিবীতে আর একটিও নেই। আবার ভাবলেন, তিনি বোধহয় এসব বাজে চিন্তাই করছেন। হাজী আহম্মদের মন এখন অন্য দিকে। তিনি যে নবাবী নিয়ে এখন ব্যস্ত বোঝা যায়।

কিন্তু কদিন পরে।

বজরা মুর্শিদাবাদের দিকে তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে গোবিন্দ ঢালী চিৎকার করে উঠল কর্তা!

রাঘববাবু ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

গোবিন্দ ঢালী তখন রাঘববাবুর দিকে এগিয়ে গেছে। রাখববাবুকে চোখের ইসারায় দেখায়, দূরে একটা পানসি। ঠিক পিছনে পিছনে আসছে।

রাঘববাবু কিছু বলেন না। চুপ করে সেই পানসিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। মুর্শিদাবাদের ঘাটে এই ধরনের পানসি তিনি অনেক দেখেছেন। নবাবের কতগুলি এই ধরনের পানসি আছে। বিশেষভাবে নক্সা কাটা এই ধরনের পানসি।

পানসিটা তখন অনেক ব্যবধানে আসছিল। গোবিন্দ ঢালী পাশে দাঁড়িয়ে চাপা-স্বরে বলল—হুজুর, অনেকদিন ধরে নৌকাটাকে পিছুতে আসতে দেখছি। ভেবেছিলাম, অন্য সব নৌকার মত এক সময়ে কোথাও সরে যাবে কিন্তু গেল না। কখনও অনেক দূরে পিছিয়ে পড়ে। আবার এগিয়ে আসে। মনে হয় ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে।

রাঘব চৌধুরী তবু কিছু বলেন না।

গোবিন্দ ঢালী হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে—কর্তা, বজরা থামিয়ে ওদের মতলব কি জেনে নেব?

রাঘব চৌধুরী পানসিটার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হযে বলেন —না গোবিন্দ, ওরা কদিন আর এমনি পিছু আসে দেখো।

গোবিন্দ ঢালীর কাজই হল পানসিটাকে লক্ষ্য করা।

আবার দিন এগিয়ে চলল। দিন থেকে রাত।

রাঘববাবু ছটপট করে বাইরে আসেন। পানসিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। কখনও পানসিটা কাছে আসে। তিনি আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। উত্তেজনায ছইয়ের মধ্যে গিয়ে বোন ও স্ত্রীকে কিছু বলতে যান। আবার কি ভেবে বলেন না।

বাইরে এসে পানসিটার দিকে তাকিযে থাকেন। তাঁর যে উত্তেজনা জাগছে কাউকে বুঝতে দেন না।

তারপর একদিন গোবিন্দ ঢালীই চিৎকার করে বলল—কর্তা, পানসিটা আর নেই।

রাঘববাবুও দেখে নিশ্চিন্ত হন। তাঁর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে।

পানসিটা যে সত্যিই তাঁদের পিছু নেয়নি এসব কথা ভাবেন। হয়ত ওটা সত্যিই নবাবের পানসি। কোন কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু শুধু তিনি ভয় পেলেন। বজরা আবার নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে চলল।

সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়। রাঙা আবীর নদীর জলে ঢেলে দিয়ে সন্ধ্যা নামে। জ্যোৎস্নার আলোয় রাতের নদীর জল যেন যৌবনের পোষাক পরে বয়ঃসন্ধি পার হয়। ছেলেমেয়েরা ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়ায়। বিশেষ করে সরলা, সুভদ্রা।

ওপাশে প্লাবন সেই লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে চলেছে। তার যেন কোন ক্লান্তি নেই। সুভদ্রা তাকিয়ে থাকে প্লাবনের দিকে। তার মুখে কোন কথা নেই। আরও গম্ভীর হয়ে গেছে সে।

এক একদিন রাত্রে সবাই ঘুমলে সে এসে ছইয়ের বাইরে দাঁড়ায়। প্লাবনকে দেখে তার যন্ত্রণা জাগে। কেন এই যন্ত্রণা সে জানে না। বিয়ে তো অনেকেরই হয না। তার হবে না এই বা কে বলেছে। তবু কেন মনে হয় তার, সে জানে না।

সরলা আর প্লাবনকে নিয়ে কোন রসিকতা করে না। বলে—বাব্বা লেঠেল লেঠেলই থাক্। আমাদের সঙ্গে লেঠেলের কি সম্পর্ক ?

কথাটা সে সুভদ্রাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে।

সুভদ্রা সরলার দিকে তাকায়। বোধ হয় সে কিছু ভাববার চেষ্টা করে।

এমনিভাবে একদিন মুর্শিদাবাদের কাছে বজরা এসে পড়ে। মুর্শিদাবাদের কাছে বজরা এগিয়ে এলে রাঘব চৌধুরী গোবিন্দ ঢালীকে কিছু নির্দেশ দেন। গোবিন্দ ঢালী মাথা নেড়ে মনিবের কথায় সায় দেয়। তারপর সে লাফিয়ে লাফিয়ে অন্য দুটি বজরায় চলে যায়। ফিরে আসেও এক গাম্ভীর্য নিয়ে।

গোবিন্দ ঢালী লেঠেলদের সর্বক্ষণ হুঁশিয়ার থাকতে বলে। অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে রাখতে আদেশ দেয়। প্লাবনকে এসেও হুঁশিয়ার করে।

প্লাবন নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

রাঘব চৌধুরী মনে মনে ভগবানকে ডাকেন। যেন নির্বিঘ্নে নবাবঘাটটা পার হয়ে যায়।

তখনও মুর্শিদাবাদ বেশ কিছু দূরে। এখনও নিজামত প্রাসাদের উঁচু গম্বুজটা দেখা যায় না। তবু সবাই হুঁশিয়ার থাকে।

এটা লেঠেলরা সবাই জানে। নবাবঘাটটা একটা মারাত্মক জায়গা। এখানে এসেই বহু নৌকা উধাও হয়। কোথায় যায়, কারা হামলা করে, কেউ জানে না।

যাবার সময়ে তারা হুঁশিয়ার ছিল। ফেরবার সময়ে তাই তারা হুঁশিয়ার থাকে।

কোন ঘটনা নাও ঘটতে পারে। শুধু খানিকটা সাবধান হওয়া। রাঘববাবু যাবার সময়ে মুর্শিদাবাদের কাছে এসে যেমন অস্থির হয়েছিলেন, তেমনি ফেরবার সময়ে হন। যাবার সময়ে অবশ্য একটা কারণ ছিল, তিনি পালিয়েছিলেন চরমারি থেকে।

সে এক ফৌজ এসে ধোঁকা দিয়ে তাঁকে বাড়ীর বার করে দিয়েছিল। আজকাল অবশ্য সেই ফৌজের চালাকিটার কথাই ভাবেন। চালাকি ছাড়া কি ? সে এসে মনে ভয় না ঢোকালে তো তিনি তীর্থ করতে বেরতেন না।

তারপর এই ফেরবার সময়ে একটু ভয় পাচ্ছেন, সেই নৌকাটাকে দেখে। এখন আর কোন নৌকাকে পিছুতে আসতে দেখছেন না। অন্যান্য অনেক নৌকা অবশ্য পাশাপাশি যায়।

এমনিভাবে আবার সাবধানে বজরা এগিয়ে চলল। বজরার মধ্যে শুধু একটু ভয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকল। তারপর একদিন তাও দূর হয়ে গেল।

নিজামত কেল্লার উঁচু গম্বুজটা দেখা গেল। তাকিয়ে থাকল বজরার সেই জানলা দিয়ে মেয়েরা। সরলা সুভদ্রার পাশে সরে এসে ভয়ে ভয়ে বলল—দিদি, ওখানেই নবাব থাকে না ?

আজকাল সরলার ভীষণ ভয় করে। সে আর আগের মত নবাবকে নিয়ে রসিকতা করে না।

সুভদ্রা সরলার অবস্থা দেখে কৌতুক করার জন্তে বলে—হ্যাঁ, ওখানেই থাকে নবাব। দেখ্‌, না তোকে বোধ হয় হাতছানি দিয়ে ডাকছে?

দিদি? সরলা সত্যিই ভয় পায়। সুভদ্রার আরও কাছে সরে আসে।

সুভদ্রা আবার বলে—কেন নবাবের কাছে তুই যাবি না? একদিন তো যেতে চেয়েছিলিস্‌?

না, না, তুই ওসব কথা বলবি না!

কেন, এখন বুঝি সুদর্শনের জন্তে মন কেমন করছে?

করবেই তো!

সুভদ্রা মুচকি হাসে। ধ্যান করছিস্‌ বল্‌ তাহলে?

করবুই তো! তোর মত!

সরলা সরে যায় সুভদ্রার কাছ থেকে।

একদিন সকালে আবার গোবিন্দ ঢালী চিৎকার করে উঠল—কর্তা, ঐ আবার!

রাঘব চৌধুরী ছইয়ের বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন।

দেখতে পান সেই পানসিটাকে। এবার সেটা খুব দূরে নয়, অনেক কাছে।

তা ছাড়া দিনের শুরু। রোদ ঝলমল আকাশ। দূরের জিনিসও ভালভাবে দেখা যায়। নদীর পার থেকে পাখী ডাকার স্বর ভেসে আসে।

রাঘব চৌধুরী দেখলেন সেই পানসিটাকে। হ্যাঁ, নবাবের পানসিই বটে। পানসির লোকগুলি কেমন চেনা চেনা। মুর্শিদাবাদের পথে তাদের অনেকবার দেখেছেন। তারা এ পাশে তাকাচ্ছে না, তবু যেন মনে হচ্ছে তারা আড়চোখে দেখছে।

পানসিটা তীর বেগে ছুটে এল। বজরার পাশ দিয়ে চক্র দিল।

গোবিন্দ ঢালী উত্তেজনায় বজরার মথোর ওপর দাঁড়িয়ে উঠল। হাতে তার সেই চির পরিচিত লাঠি।

রাঘববাবু বুঝতে পারলেন, গোবিন্দ একট কিছু করবে। গোবিন্দের দেখাদেখি প্লাবনও উঠে দাঁড়িয়ে লাঠিটা চেপে ধরল।

রাঘববাবু চুপ করে তাকিয়ে রইলেন।

পানসির মধ্যে যে ছ'সাতজন লোক ছিল, তারা কি নিয়ে যেন তর্ক করছিল। বেশ একটা হৈ হৈ শব্দ ছিটকে আসছিল।

কিন্তু পানসিটা দাঁড়াল না। বজরার পাশ দিয়েই চলে গেল।

গোবিন্দ ঢালী তাই দেখে বলল—কর্তা, ওদের কিছু জিজ্ঞেস করব? আমার মনে হয় ওদের মতলব ভাল নয়?

রাঘববাবু হাসলেন—না গোবিন্দ, পথে কোন উটকো বিপদ বাঁধিয়ে দরকার নেই তা ছাড়া আমরাও বোধ হয় ভুল করছি। ওরা আমাদের পিছু নেয় নি, এমনি যাচ্ছে।

তারপর আর সারাদিন পানসিটা ফেরে না। মনে হয় তারা নবাব ঘাটে নেমে গেছে।

এদিকে বজরার উত্তেজনাও শান্ত হয়ে আসে। রাঘববাবু শুধু গোবিন্দকে নির্দেশ দেন —আজ অন্ধকার পক্ষ শুরু হবে কিন্তু রাতে বজরা থামাবে না। রাতে বজরা চালালে সকাল হবার আগেই নবাব ঘাটটা পার হয়ে যাব।

রাঘব চৌধুরীর কথামতই কাজ হয়।

অন্ধকার একসময়ে নেমে আসে। অল্প কিছু আলো জ্বেলেই বজরা এগিয়ে চলে। রাঘব চৌধুরী কতকক্ষণ ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। দূরে দেখা যায় নবাবী মুর্শিদাবাদ। এপাশে নদীতে ঘন অন্ধকার কিন্তু নবাবী নগর আলো ঝলমলে। কিন্তু আলোর বিচ্ছুরণও নদীতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা খুব পর্যাপ্ত নয়।

বাতাসে ভাল করে কান পাতলে শোনা যায় গান আর নাচের শব্দ।

বজরা এগিয়ে চলে। একটু বেশী রাতের দিকে রাঘববাবু ছইয়ের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে গোবিন্দ ঢালীকে বললেন—সতর্ক থাকবে। যদি দরকার হয়, তিনি ঘরে জেগেই আছেন।

রাঘববাবু নিজের ঘরে ঢুকে অস্ত্রগুলি কাছাকাছি রাখলেন।

রাত তখন গভীর। গোবিন্দ ঢালী ছইয়ের মাথার ওপর বসে আছে। তার চোখে ঘুমের কোন জড়তা নেই। বরং তার ভাঁটার মত চোখ দুটি জ্বলছে।

প্লাবনও ওপাশে লাঠি হাতে পায়চারি করছে। সে কোমরে নতুন একটি অস্ত্র গুঁজে নিয়েছে। অন্ধকারে তারও চোখ জ্বলছে। তবে সে জ্বলার মধ্যে যেন অন্য চিন্তা। মাঝে মাঝে মাথাটা ঝাঁকাচ্ছে। মগজ থেকে কি যেন তাড়াতে চাইছে।

আকাশ আগে পরিষ্কার ছিল। কদিন ধরে কোন ঝড় জল হয়নি। মেঘও জমে নি। সেই মেঘ যেন জমতে শুরু হল।

অন্ধকার আকাশে তবু মেঘের ঘনঘটা ছিল না। সেই মেঘ জমতে আরও অন্ধকার যেন ঘন হয়ে এল।

ওপারে মুর্শিদাবাদ থেকে যে আলোর ঝলকানি ছুটে আসছিল, তাও গভীরে নামতে কমে এল। পরে একেবারেই আলো থাকল না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ গোবিন্দ ঢালী চমকে উঠল।

প্লাবনও দেখেছে সে চমকাল।

কতকগুলি নৌকা জোরে জোরে দাঁড় ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে। নবাব ঘাট থেকেই আসছে সে নৌকা।

নৌকাগুলির গতিবিধি কোন্‌দিকে গোবিন্দ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। দাঁড়ের শব্দ ও জলের দিকে তাকিয়ে গোবিন্দ অনুমান করল।

তারপরই সে চীৎকার করে উঠল—হুঁশিয়ার।

ওপাশের বজরা থেকেও লেঠেলরা একধরণের সাঙ্কেতিক সাড়া দিল।

কিন্তু ততক্ষণে নৌকাগুলি অনেক কাছে এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ধারাল তীরের ফলা ছুটে এল। শন্ শন্ শব্দে সেগুলি বজরার ওপর পড়ল।

গোবিন্দ ঢালী লাঠি ঘোরায়। রে রে বলে চিৎকার তুলে সবাইকে জানান দিয়ে দেয়।

ওদিকের নৌকা থেকেও উল্লাস ছুটে আসে। পরের দুটি বজরা থেকে লেঠেলরা ধারাল শস্ত্র ছোঁড়ে। হঠাৎ অন্ধকারে একটা আলোর শিখা দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। আলোটা ঘুরতে ঘুরতে রাঘব চৌধুরীর বজরায় এসে পড়ে।

একটা নয়, এমনি অনেকগুলি আলোর গোলা। আগুন ধরে যায় রাঘব চৌধুরীর বজরায়। ছইয়ের মধ্যে মেয়েরা ভয়ে কেঁদে ওঠে। আগুনের শিখা অন্ধকারকে গ্রাস করে। নদীর জলে আগুনের মাতামাতি লেগে যায়।

সেই আলোয় গোবিন্দ ঢালী লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে চীৎকার করে বলে - কে রে তোরা? ভদ্রলোকের মান সম্মান রাখিস্ না। ভাল চাস্ তো কেটে পড।

উত্তর আসে—আমরা তোর দোস্ত রে! ভাল চাস তো মেয়ে দুটোকে দিয়ে দে, আমরা সরে পড়ি। আমাদের মেয়ে বড দরকার। তোদের বজরায় দুটো জোয়ানি মেয়ে আছে খোঁজ পেয়েছি।

তবে মর্‌ ব্যাটা! গোবিন্দ ঢালী লাফিয়ে উঠে কটার মাথা লক্ষ্য করে লাঠি চালায়।

কেউ কেউ বজরায় উঠতে এসেছিল, লাঠির ঘা খেয়ে নদীর জলে লুটিয়ে পডল।

এদিকে আগুন বাতাস পেয়ে লাফাচ্ছে। ছইয়ের ওপর অংশ ধরে গেছে। ছেঁড়া পালগুলি আগুনের শিখা নিয়ে দুলছে।

শত্রুনৌকা থেকেও লোক বজরায় ওঠে। কটা মাথা নেবে এপাশের লেঠেলরা। লেঠেলরাও অস্ত্র চালায়, শত্রুরাও অস্ত্র চালায়। কোন পক্ষ ঘায়েল হয় বোঝা যায় না।

রাঘব চৌধুরী অনেকক্ষণ ভেতরে ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এরা কারা? বজরার জানালা দিয়ে ওদের নৌকা দেখছিলেন। কাকে যেন দেখে চমকে উঠলেন।

আগুনের লেলিহান শিখায় যাকে দেখলেন, তাঁকে একেবারেই আশা করেন নি।

তাঁর বজরার পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছেন হাজী আহম্মদ। সেই কালো আলখাল্লায় মোডা শরীর। এক মুখ দাডি ঝুলে আছে। চোখ দুটি কিসের আনন্দে যেন জ্বলছে। হাতে মুক্ত তরবারি। আগুনের শিখায় সে তরবারি দারুণভাবে জ্বলছে।

রাঘব চৌধুরী আর অপেক্ষা না করে তিনিও একটি তরবারি নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

তাঁকে দেখে হাজী সাহেব বিদ্রূপকণ্ঠে বলেন—আসুন মেহমান চৌধুরী সাহেব, পালিয়ে ছিলেন মেয়ে দুটিকে নিয়ে?

রাঘব চৌধুরী কোন কথার উত্তর দেন না।

দাঁতে দাঁত চেপে অনেকদিনের সাধ হাজী আহম্মদের দেহ লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত হানতে যান।

হাজী আহম্মদ সরে গিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদের হুকুম দেন, কাফেরকে বন্দী কর। ওকে এতো সহজভাবে

হত্যা করবে না। ওর জিন্দা থাকার দরকার।

তবু রাঘব চৌধুরীকে সহজে বন্দী করা যায় না। কিন্তু অনেক লোক, রাঘববাবু একা পারবেন কেন?

এক সময়ে রক্ষীদের হাতে তঁাকে ধরা দিতে হয়।

ওদিকে তখন গোবিন্দ ঢালীও আর নেই। তার মুণ্ড গড়াচ্ছে বজরার পাটাতনে।

অনেক লেঠেল তখনও যুজ্‌ছিল, তারাও কেউ কেউ চিৎকার করে বজরার ওপর ঢলে পড়ছিল। শুধু এক প্লাবনই তখন নানাভাবে আঘাত হেনে চলেছে।

সুভদ্রাকে ধরতে যায় লোক। সুভদ্রা তখন প্লাবনের পিছনে আশ্রয় নিয়েছে।

সরলাকে ধরেছে লোক। কিন্তু সরলাকে রাখতে পারছে না।

সরলা চীৎকার করছে, তার দু'চোখ কান্নায় ভাসছে। না, না আমাকে ছেড়ে দাও। আমার বিয়ে হবে। তারকেশ্বরে সুদর্শন আছে। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ওর কথা শুনে সেনারা হাসে। কেউ কেউ মন্তব্য করে—হ্যা, বিয়ে হবেই। নবাবের সঙ্গে বিয়ে হবে।

সরলার কাপড় ধরে টানাটানি করে সেনারা। কাপড় খুলে যায়। সরলা নগ্ন হয়ে পড়ে।

হাজী আহম্মদ এই সময়ে কি বলেন।

কিন্তু সেনারা তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না।

তারা যুবতীর নগ্ন শরীর দেখে তারিয়ে তারিয়ে হাসতে থাকে।

হঠাৎ সরলা বাঁচবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। বুকের ওপর দু'হাত চাপা দিয়ে ইতস্তত চোখ ঘোরায়। পায়ের কাছে একখানা ছোরা দেখতে পায়। সেই ছোরাটা তুলে নিয়েই সামনের সৈনিকের বুকে ঢুকিয়ে দেয়। অতর্কিতে ঘটে যায় এই ঘটনাটা। সৈনিক চীৎকার করে সরলার পায়ের কাছেই ঢলে পড়ে।

হাজী দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন। পাশে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাঘব চৌধুরী।

হাজী ক্ষুব্ধ হয়ে সৈনিকদের আদেশ দেন—ইজ্জত লে লেও। আওরত বহুৎ হারামী আছে।

রাঘব চৌধুরী উন্মাদের মতো বলেন—না, না।

হাজী আহম্মদ রাঘব চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে হাসেন—না, না কেন চৌধুরী মশাই। সেদিন মেয়ে দুটিকে চেয়েছিলাম দেন নি, আজ পরিণাম দেখে ভয় পাচ্ছেন কেন?

ইজ্জত শুধু সরলার নেওয়া হয় না, রাঘব চৌধুরীর চোখের সামনে তাঁর স্ত্রী, বোনের ওপরও সৈনিকরা তাদের আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। তারপর তাদের হত্যা করা হয়। সেই সঙ্গে সুমন্ত দুষ্মন্তকেও জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়।

রাঘববাবু মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েন কিন্তু তাঁকে মুর্চ্ছিত হতে দেন না হাজীসাহেব। বলেন—দেখুন আপনার পরিণাম। শুধু আমার কথায় রাজী না হওয়ার শাস্তি।

রাঘবচন্দ্র অস্ফুটস্বরে বলেন—ওফ্‌, ভগবান।

সুভদ্রা তখনও প্লাবনের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব দেখছিল। সেও বুঝতে পারছিল, তারও এমনি অবস্থা হবে। ভয়ে আতঙ্কে সে চোখে দেখতে পারছিল না।

হঠাৎ কজন সৈনিক একসঙ্গে প্লাবনের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের হাতে ধারাল অস্ত্র।

তারা একসঙ্গে প্লাবনকে আক্রমণ করে।

প্লাবন নিহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে বজরার মেঝেতে।

হাজী এসে সুভদ্রার হাত ধরেন। তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে যান।

সুভদ্রা চিৎকার করে বলে, বাবা, বাবা আমাকে নবাবের লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রাঘব চৌধুরী কি উত্তর দেবেন, তিনিও তো শৃঙ্খলিত হয়ে চলেছিলেন। শুধু শুনতে থাকেন মেয়ের ক্রন্দন।

একসময় হাজী সাহেবই সুভদ্রাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত বলেন—ভয় কি লডকী, নবাব তোমাকে বহুৎ আরামে রাখবে। হাজী হাসলেন হাঃ হাঃ করে। তাঁর অট্টহাসিটা ভাগীরথীর জলে যেন প্রতিধ্বনি তুললো।

এপাশে তখনও তিনখানি বজরা জ্বলছিল। বজরার সেই আগুনে আলোকিত পথ। সেই পথ ধরে হাজী সাহেবের নৌকা নবাব ঘাটের দিকে এগিয়ে চললো।



তারপর নবাব প্রাসাদে। সেদিন রাত তখন শেষ হয় নি।

আবার কোন গণ্ডগোলে পড়ে যান ভেবে, তা ছাড়া রাঘব চৌধুরীর দর্প চূর্ণ করবার জন্যে, হাজী আহম্মদ নিজেই সুভদ্রাকে সঙ্গে করে রঙমহলে চলে আসেন।

রঙমহলের সর্দারনীকে হুকুম দেন, অবশ্য তার আগে জেনে নেন, নবাব কোথায় আছেন।

শোনেন, নবাব আজকে খুব গোঁসা করেছেন। তিনি নয়া লডকী ফরমাইস করেছিলেন, দেওয়া যায় নি।

রঙমহলে বসে বসে জাদা জাদা সরাব খাচ্ছেন। আর নর্তকীর নাচ দেখছেন।

এই কথা শুনে হাজীসাহেব হাসলেন, তারপর বললেন—নবাবকে খবর দাও, নয়া লডকী দেওয়া হবে।

এই বলে সুভদ্রাকে সর্দারনীর হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেলেন।

সুভদ্রার মুখে আর কথা নেই। শুধু চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা নেমে চলেছে।

এক মাথা অতি যত্নের কালো চুলের রাশি মুখের ওপর এলোমেলো হয়েছে। ঠিক যেন পাগলির মত দেখাচ্ছে।

সর্দারনী তার দিকে তাকিয়ে বহুৎ খুশি হয়ে উঠলেন। তারপর মায়ের মত সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ডর কিঁউ বেটি। নবাব বহুৎ সমঝদার আদমি। কোন দুঃখ থাকবে না।

সুভদ্রার কানে কোন কথাই গেল না। সে সর্দারনীর হুকুমে যা যা করতে বললো করলো।

হামাম ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে আতর জলে স্নান করানো হল।

সে নিরাবরণ হয়ে দর্পনের সামনে স্নান করল। এমন কি নিজের নগ্ন শরীর দেখেও মুখে কোন রেখা ফুটল না।

যে বাঁদীটি তার খিদমতে ছিল সেই বরং মুচকি হেসে বলল—নবাবসাহেব আজ বহুৎ গোঁসা করেছেন, তোমাকে পেয়ে এই শেষ রাতে বহুৎ খুশ হবেন।

তাতেও সুভদ্রার মুখের কোন রেখা পালটায় না।

তারপর তাকে ভাল ভাল পোষাক পরানো হল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জড়োয়ার গহনা। চোখে সুর্মা টেনে দিল বাঁদী। ঠোঁটে তাম্বুল রঙ।

কিছু খানাপিনা করার জন্যে বাঁদী ইন্তেজার করল কিন্তু খাবারের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা মাথা নত করল।

তারপর নবাবের ঘরে নিয়ে যাবায় পালা। সর্দারনী এগিয়ে এল। স্থূল শরীরের মেদ নাচাতে নাচাতে সুভদ্রার হাত ধরল। তার চলার ভঙ্গিতে শুই বোধ হল, আজ নবাব এমনি একটি খুবসুরত আওরত পেয়ে বহুৎ খুশি হবেন। এবং বললেন—ফতিমা, তুমি না থাকলে আমি একদিন ঠিক মারা যাব৭

এই ধরনের কথা বললে ফতিমার খুব ভাল লাগে। সেই কথা ভাবতে ভাবতেই ফতিমা সুভদ্রার হাত ধরে যাচ্ছিল। চাই কি আজ হয়ত নবাব খুশি হয়ে গলা থেকে এক ছড়া মুক্তোর মালা খুলে দেবেন। এমনি মালা তার অনেক নক্সা কাটা মেহগনি বাক্সতে আছে।

নবাব খুশি হয়ে বহু মালা তাকে উপহার দিয়েছেন।

নবাব ঘরের কাছে তারা পৌছেচে। এই সময়ে কোথা থেকে হাজী আহম্মদ এসে উপস্থিত হলেন।

সুভদ্রাকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। সর্দারনীকে জিজ্ঞেস করলেন—কই গরবর?

সর্দারনী হেসে বললেন—না হুজুর, লড়কী বহুৎ বুঝদার আছে। কোন বেয়াড়াপনা করেনি।

হাজী খুশি হয়ে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি জানতুম চৌধুরীসাহেবের লড়কী চৌধুরী সাহেবের মত নয়।

তারপর বললেন—শুনো লড়কী, তোমায় আমার কিছু বলবার আছে। তোমাদের

গ্রামের সীতাকে চিনতে ? একদিন তোমাদের যখন নবাব প্রাসাদে আনতে চেয়েছিলাম তোমার বাবা ধূর্ত রাঘব চৌধুরী আমার হুকুমকে নফরৎ করে, তোমাদের বিনিময়ে সেই সীতাকে কৌশল করে এই নবাব প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এত কথা আজ বলছি তার কারণ সেই আক্রোশ আমি ভুলিনি। তাই সেই পাপের শাস্তি তোমার বাবাকে ভোগ করতে হচ্ছে।

সুভদ্রার তখন কোন কিছুই শুনতে ইচ্ছে করছিল না। সে কিছু ভাবতেও পারছিল না। আর ভাববার কিছু ছিলও না। একবার শুধু সীতার কথাটা শুনে সে চমকাল, তারপর মাথা নীচু করে নিল।

হাজী আহম্মদ বাপের কীর্তিটা বলে নিজের যে অপরাধ সে লঘু করতে চাইলেন, সেটা পুরোপুরি সফল হল না দেখে সর্দারনীকে বললেন—যাও, নবাব বোধ হয় অপেক্ষা করে আছেন, তাঁর কাছে জলদি নিয়ে যাও !

হাজী কিন্তু সেখান থেকে গেলেন না।

নবাবের ঘরের দরজার কাছে যে প্রহরী দাঁড়িয়েছিল, তাকে সরে যেতে বলে সেখানে তিনি দাঁড়ালেন।

কিছুক্ষণ পরে সর্দারনী হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। হাতে এক ছড়া মুক্তার মালা।

হাজীকে দেখে সদারনী বলল—নবাবসাহাব বহুৎ খুশ্।

আর মেয়েটি ?

মেয়েটিও আশ্চর্য কোন বেয়াদপি করে নি। নবাবসাহাব ডাকতেই সুড় সুড় করে তার পালঙ্কে গিয়ে উঠল।

হঠাৎ হাজীসাহেব হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললেন—জোয়ানী আওরত তো, বিয়ে শাদী হয়নি !

হাজীসাহেব হাসতে হাসতেই চলে গেলেন।

আর ওদিকে নবাবের বাহুবন্ধনের মাঝে সুভদ্রা বার বার চোখের জলে ভাসতে লাগল।

নবাবসাহেব যত বলেন—রোনো মৎ। রোনেকা ক্যয়া হায় !

তবু সুভদ্রা কান্না থামাতে পারে না। কান্নার জলে তার মুখের প্রসাধন ধুয়ে যায়।

নবাব সুজা একটু বিরক্ত হলেন।

আওরত, মেরা দেমাগ বহুৎ খারাপ আছে। রোনো মৎ।

সুভদ্রা এক সময়ে কান্নাও থামিয়ে ফেলল। চোখের ওপর ভেসে উঠল, সরলার পরিণতি।

সরলার ওপর সৈনিকের সেই বলপ্রয়োগ ! আর ভাবতে পারল না।

নবাব কাছে টেনে নিতে সে শুধু চোখ বুজিয়ে নিজেকে সংবরণ করল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—আর এছাড়া কি উপায়।

তবু একবার সে অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অক্ষম, দুর্বল নারী।

চিরকাল যেমনি অসহায়ের মত দস্যুর কাছে নিজেকে অনিচ্ছায় সঁপে দিয়েছে, সুভদ্রা তেমনিভাবে আত্মসমর্পণ করল।

ওদিকে বন্দীশালার মধ্যে শৃঙ্খলিত রাঘব চৌধুরীর সামনে হাজী আহম্মদ।

হাজী আহম্মদ রাঘব চৌধুরীর মেয়েকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে চলে এসেছেন বন্দীশালার মধ্যে।

আসতে আসতে ভেবেছেন, এতক্ষণে নবাব নয়া আওরতকে আপন বিবির মত আদরে সোহাগে রাঙিয়ে তুলেছে।

নবাবটা যেন দিন দিন নয়া আওরতের জন্যে বুভুক্ষ হয়ে উঠেছে।

তারপর হাজীসাহেব হেসে মনে মনে বলেছেন—নাও আর কদিন তোমার পরমায়ু আছে?

সেদিন বদ্যি এসেছিল, বদ্যি নবাবকে পরীক্ষা করে বলে গেছে—হুজুর, এখন থেকে সাবধান না হলে যকৃৎ একেবারে কোরবানী যাবে।

বদ্যির বড় বড় বুকনিতে হাজীসাহেবের রাগ হয়েছে। আড়ালে নিয়ে গিয়ে ধমকেছেন।

বদ্যি বলে গিয়েছিল, সরাব না পান করতে।

নবাব হাজীকে শুধিয়েছেন-উজীসাহেব, বদ্যির কথাই কি ঠিক? সরাব আমি খাব না। সরাব খাব না, আওরত ভোগ করব না, তবে নবাব কিসের?

হাজী বলেছেন—আপনি বদ্যির কথা শুনছেন কেন? ওরা অমনি বলে।

নবাব হাজীর কথা শুনে আবার সন্তুষ্ট হয়েছেন।

তাই হাজী ভাবেন আর কদিন। নবাবের চেহারা দেখেই বোধ হচ্ছে, একদিন যকৃৎ ফেটেই মারা যাবেন।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে বন্দীশালার মধ্যে এলেন ও শৃঙ্খলিত রাঘব চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

রাঘব চৌধুরী শৃঙ্খলিত অবস্থায় ভ্রূভঙ্গি করলেন।

তাঁর কোমরে লৌহ শৃঙ্খল। হাতে হাতকড়া। দু পায়েও কড়া, কড়ার সঙ্গে শৃঙ্খল আটা। যেন কোন পরাজিত নবাব। তাঁকে অনেক কষ্টে বন্দী করে এই লৌহ খাঁচা'র মধ্যে আনা হয়েছে।

হাজী আহম্মদ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। উজীরসাহেবের দৃষ্টিতে সাপের মত হিংস্রতা ফুটে ওঠে। যেন তিনি এক্ষুনি নখে, দাঁতে করে রাঘব চৌধুরীকে ছিঁড়ে খাবেন। কিন্তু হঠাৎ দৃষ্টিটা সহজ করলেন।

বন্দীশালার রুদ্ধকক্ষে মৃদু একটি আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় কাছের মানুষও খুব দৃশ্যমান নয়। হাজী আহম্মদ আবার অট্টহাসি করে উঠলেন। তারপর রাঘব চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনেছ কাফের, তোমার মেয়ে নবাবের কাছে

নিজেকে স্বইচ্ছায় সঁপে দিয়েছে। কোন বেয়াদপি করে নি।

রাঘববাবু শুনলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

কি উত্তর দেবেন ?

চোখের সামনে সবই দেখেছেন। আর কত দেখবেন ! শুধু তাঁর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন ॥

এক সময়ে কাতরস্বরে বললেন—আমার পাপের তো অনেক শাস্তি হল। এবার দয়া করে আদেশ দিন, ঘাতকের কৃপাণের তলায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করি।

হঠাৎ হাজীসাহেব হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

না, না রাঘব চৌধুরী, তোমাকে আমি এত সহজে মরতে দেব না। তোমার মত এমনি আরও কতকগুলি বেয়াড়া আদমি বন্দীশালার মধ্যে আছে। নবাবী কায়েম করার দিন পর্যন্ত যত জ্বালা আমার জাগবে, সে জ্বালার উপশম করব তোমাদের ওপর অত্যাচার করে।

এই কই হ্যায় !

রক্ষী এসে দাঁড়াতে, বললেন - চাবুক।

চাবুক এলে সপাসপ শৃঙ্খলিত রাঘবচৌধুরীর সারা শরীরে চালাতে লাগলেন।

রাঘবচৌধুরী ওঃ ওঃ বলে সেই চাবুকের আঘাত সহ্য করতে লাগলেন। চিৎকার করে বললেন—হাজী সাহেব আমাকে মৃত্যু দাও; তবু আমাকে এমনভাবে যন্ত্রণা দিও না।

তারপর সেই অত্যাচারের মধ্যে হঠাৎ তাঁর মনে জাগল, প্রতিশোধ নেবেন।

সে রাত্রে হাজীসাহেব যতক্ষণ পারলেন শুধু চাবুক চালিয়ে গেলেন।

হাজীর মুখ থেকেই শুনলেন রাঘববাবু, চরমারির সব কিছু সম্পত্তি হাজীসাহেব ধ্বংস করেছেন।

চৌধুরী প্রাসাদের আর কিছুই তার জানার দরকার নেই। আর কি হবে জেনে ? তিনি কি মুক্তি পেলে আনন্দে আটখানা হয়ে আবার চরমারিতে ফিরে যাবেন ? কাদের নিয়ে ফিরে যাবেন ? যাদের নিয়ে পালিয়েছিলেন তারা তো আজ কেউ নেই ? তার পর এক সময়ে রাঘববাবু জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।



তারপর অনেক দিন পরে।

একদিন সকালে বন্দীশালার মধ্যে শুনতে পেলেন রাঘববাবু, বাইরে যেন কিসের গোলমাল !

একে অন্ধকার বন্দীশালা। দিনের বেলায়ও আলো জ্বলে না।

তার ওপর প্রতিদিনের অত্যাচার। সমস্ত শরীর ঘিরে চাবুকের দাগ। কত জায়গায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, ক্ষত থেকে পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। জামাকাপড়ের অবস্থা শোচনীয়।

প্রথমে তাকে কোন খাদ্য দেওয়া হয়নি। হাজী আহম্মদ চেয়েছিলেন শুকিয়ে মারতে।

তারপর একদিন হঠাৎ বললেন—না, মরে গেলে আমার ক্ষতি। তারপর যতদিন না নবাবী পাই আমার জ্বালা উপশমের জন্যে এই সব কুত্তাদের চাই।

চাবুক হাতেই বন্দীশালায় ঢুকতেন। কোন কোন দিন চাবুক চালাতে চালাতে পরিশ্রান্ত হয়ে রক্ষীদের ডাকতেন।

রাঘব চৌধুরী শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

তাঁর তো সব গেছে, সে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু এই লোকটাকে কি কোন-রকমে বধ করা যায় না?

সুযোগ এল। হাজী আহম্মদ বন্দীশালায় ঢুকলে রক্ষী এসে বন্দীর হাত পায়ের বন্ধন খুলে দিত। তারপর হাজীসাহেব এলোপাথারি চাবুক চালিয়ে যেতেন, বন্দী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ত। সমস্ত শরীর ফেটে রক্ত ঝরত।

তারপর কয়েক ঘণ্টা তাঁর জ্ঞান ফিরত না।

একদিন রাঘব চৌধুরী ঠিক করলেন, মৃত্যু তাঁর একদিন হবে। তাঁর আগে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্। সেদিন হাজী আহম্মদ এলেন – সুভদ্রার সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিলেন। মেয়েটা যে বাপের চেয়ে বুদ্ধিমতী তাও বললেন। এখন সে নবাবের পেয়ারের বিবি হয়ে উঠেছে।

কিন্তু হাজী যে মিথ্যা কথা বললেন সে কথা বুঝলেন না রাঘব চৌধুরী।

সুভদ্রা তখন অন্যান্য মেয়ের মত উচ্ছিষ্ট জীবনের হাহাকার নিয়ে অবহেলিতা মেয়েদের দলের সংখ্যা বাড়িয়েছে।

তাছাড়া দুবার সে আত্মহত্যা করতে গেছে কিন্তু পারেনি। ধরা পড়ে গেছে। একবার বিষ খেতে গিয়েছিল, বাঁদী বুঝতে পেরে গেলাসের সরবৎ ফেলে দিয়েছে। একবার লুকিয়ে ছোরা যোগাড় করে রেখেছিল কিন্তু ছোরাটা কিরকম ভাবে পড়ে যায়। সর্দারণীর কাছে খবর যায়।

সর্দারণী এসে সুভদ্রাকে খুব বকে। তখন সুভদ্রা কেঁদে বলে—আমি কি করব বলে দাও? মরতেও চাইছি, মরতে দেবে না?

সর্দারণী ধমক দিয়ে বলে—সবাই যেমন আছে, তেমন থাকবে।

সবাই আর আমি কি এক? আমার জ্বালা তোমরা বুঝবে না। সবাই গান, নাচ, সরাব খেয়ে বেঁচে থাকে। আমি যে পারি না।

এসব কথা রাঘববাবু জানেন না। তাই মেয়ের কথা তিনি হাজীর কাছে শুনতে চান না।

কিন্তু হাজী আহম্মদ চাবুক চালাবার আগে রোজ একবার করে সেই মিথ্যা বানিয়ে

বলবেন। আর চাবুকের যন্ত্রণার আগে অন্য এক যন্ত্রণায় রাঘব চৌধুরীর মুখ কালো হবে।

কিন্তু এদিন তিনি আর অপেক্ষা করলেন না।

রক্ষী এসে বাঁধন খুলে দিয়ে গেলে, যখন হাজী আহম্মদ আবার সুভদ্রার কথা শুরু করলেন, তখন তিনি দুই থাবা বাড়িয়ে হাজীকে আক্রমণ করলেন।

অতর্কিত আক্রমণ। হাজী মেঝেতে পড়ে গেলেন।

রাঘববাবু বুকের ওপর বসে গলা চেপে ধরলেন। গলা দিয়ে এক ধরনের উদ্ভট শব্দ বেরতে লাগল।

রক্ষীরা ধারে কাছে ছিল না। তারা সাধারণত উজীরসাহেবকে ঘরে পুরে দিয়ে একটু আড়ালে থাকে। শুধু হুকুমের অপেক্ষায় থাকে।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ চাবুকের শব্দ না পেতে রক্ষীরা উঁকি মারল।

হাজী আহম্মদের মৃত্যু যে অতো সহজে হবে না। তাঁর পরমায়ু যে আরও ছিল, এই রক্ষীদের হঠাৎ ছুটে আসাতেই প্রমাণিত হল।

তাছাড়া হাজীসাহেবের কোমরেও লুকানো ছিল তীক্ষ্ণধার এক ছোরা কিন্তু তা তিনি বের করবার সময় পান নি।

রক্ষীরা এসে তাকে উদ্ধার করলে তিনি উঠে দাড়িয়ে রাগতকণ্ঠে রাঘব চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কি ভেবে দিলেন না।

শুধু মুখের ওপর ঘৃণায় থুতু ছিটিয়ে দিলেন।

তারপর থেকে হাজী আহম্মদ সাবধান হয়ে যান। অনেকদিন এদিকে আসেনও না। বন্দীশালার মধ্যে রাঘব চৌধুরীর জীবন কাটে একান্ত নিভাবনায়।

ভাবনা তাঁর ছিল কিন্তু সে ভাবনা অনেক দূরে। বড় অনিশ্চিত। যদি কখনও মুক্তি পান তাহলে প্রতিশোধ নেবেন।

কিন্তু মুক্তি পাবার সম্ভাবনা তার ছিল না।

অন্ধকার বন্দীকক্ষ। এতটুকু আলো ঢোকে না। ঘরের অনেক ওপরে একটা ছোটমত ফোকর। সেই ফোকর দিয়ে আলো আসে না, শুধু দিন এলে বোঝা যায়। সেই ফোকর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে রাঘব চৌধুরী মনে মনে বল পান।

তারপর একদিন সকালে বন্দীশালার মধ্যেই গোলমালটা ভেসে আসে।

রাঘব চৌধুরী চমকে উঠে বন্ধ লোহার গরাদের সামনে দাঁড়ান।

চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেন—এ ভাই, হিঁয়া ক্যায়া হুয়া।

কিন্তু কোন সাড়া মেলে না। পাহারাদাররা কোথায় চলে গেছে বুঝতে পারেন না। সেই গরাদের সামনে দাঁড়িয়েই শোনেন বাইরে যেন কার জয়ধ্বনি। আর মুহুর্মুহু কামান গজরাচ্ছে।

তারপর কয়েকঘণ্টা পরে আবার রাঘব চৌধুরী নিজের জায়গায় এসে বসেছেন। দেহের যন্ত্রণা আর ক্লান্তি নিয়ে চোখ বুজিয়ে আছেন।

এই সময়ে ঝনঝনাৎ শব্দে বন্দীশালার দরজা খুলে যায়। কয়েকজন পাহারাদার

ঘরে ঢুকে বলে—তুমহারা আজাদী মিল গ্যযা। যাও ভাগো জলদী।

আজাদী?

রাঘব চৌধুরী অবিশ্বাসের চোখ তুলে তাকান। কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি।

পাহারাদারদের মুখেও হাসি ঝলকে ওঠে। আবে মুমে ক্যসা দেখতা হ্যায়। নয়া সরকার গদিতে বসেছে, বেগমসাহেবা সব বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে। তোমরা মুক্ত। যাও ভাগো।

নয়া সরকার, তবে কি?

রাঘব চৌধুরী ঠিক বুঝতে পারেন না কে নবাব হয়েছে।

কেমন যেন বিস্ময়ের চোখ ছুটি তুলে জিজ্ঞেস করেন—নয়া সরকার, কে নবাব হয়েছেন?

পাহারাদাররা হেসে বলে—বুরবাক কাঁহীকা, নবাব সফরবাজ খাঁ বাহাদুর। বাপের পর বেটার গদি।

রাঘব চৌধুরীর তখন বাঁধন খোলা হয়ে গেছে, তাঁকে কয়েকজন ঠেলে ঘরের বাইরে করে দেয়। তারপর অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে রাঘব চৌধুরীও প্রাসাদের বাইরে চলে আসেন? তখন বন্দীরা সব ছুটছে। আজাদী মিলে গেছে? প্রাসাদের সামনে লোকের ভীড়। একদিকে আনন্দের ঢেউ, অন্যদিকে শোকের শোভাযাত্রা। তোপ দাগা হচ্ছে।

সুজাউদ্দিনকে কবরে নিয়ে যাবার জন্যে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হচ্ছে।

অন্য দিকে সরফরাজ খাঁ গদিতে বসার জন্যে নাচ, গানের মশগুল বসে গেছে। তোরণদ্বারে সানাই বাজছে। সেনারা নতুন নবাবকে বার বার অভিনন্দন জানাচ্ছে।

কিন্তু বন্দীরা কেউ আর সেই ভীড়ের মাঝে দাঁড়ায় না।

আবার যদি কেউ ভুল হয়ে গেছে বলে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী শালায় পোরে, এই ভেবে সব পড়ি মরি করে ছোটে।

নারী পুরুষ সবাই ছুটছে। সুজাউদ্দিনের উচ্ছিষ্ট মেয়েলোকেরা সবাই ছাড়া পেয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেতে চাইছে না। তাদের পিছনে রক্ষী তাড়া করেছে।

আমি যাব না, আমি কোথায় যাব? নতুন নবাবকে বলে আমায় একটু থাকবার জায়গা দাও।

রক্ষীরা ভেংচাচ্ছে। হ্যাঁ, নয়া নবাব, বাপের মেয়েছেলে নিয়ে পুজো করবে। ভাগ্।

কারো পোষাক জমকালো। কারো শরীরে ভারী ভারী গহনা। কেউ সরাব খেতে খেতে গেলাস হাতেই বেরিয়ে পড়েছে।

সে এক অদ্ভুদ দৃশ্য। ওরই মধ্যে নগরের কেউ কেউ দু একটাকে বগলদাবা করে নিল। না, সুন্দরী চাকরাণী রাখলেও তো কাজ হবে?

রাঘব চৌধুরী ছুটতে ছুটতে এসে ভাগীরথীর তীরে দাঁড়ালেন।

মধ্যাহ্নের সূর্য মাথার ওপর চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নবাব ঘাটে অসংখ্য নৌকা। নতুন নতুন সব লোক দেশ বিদেশ থেকে এসেছে। কেউ চলে যাচ্ছে নিজের দেশে। বন্দীদের কাউকে কাউকে চিনতে পারলেন।

হীরালাল, রঘু শেঠ, মণি চক্রবর্তী, শামুন মিঞা তারাও তাঁর মত হাজী সাহেবের সঙ্গে ব্যবসা করত। এক গাল দাড়ি, কোটর গত চোখ। শরীর তাদের টলছে, তবু মুখে মুক্তির আনন্দ।

তারা নৌকাওয়ালাদের সঙ্গে দরদস্তুর করছে। ফিরবে বাড়ী।

রাঘব চৌধুরী হাতের মুঠিতে ধরা ছোরাখানার দিকে তাকালেন। আসবার পথে প্রাসাদের এক জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছেন। তাঁর মুক্তি, কিন্তু তিনি কোথায় যাবেন?

ছোরাখানা শূন্যে তুলে নিজের বুকে চালাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু মনে পড়ল হাজী আহম্মদকে। সঙ্গে সঙ্গে দেহের মধ্যে বাড়তি এক শক্তি ফিরে এল। না, প্রতিশোধ যেমন করে হোক্ নিতে হবে।

তিনি ছোরাটা জামার মধ্যে লুকিয়ে ফেললেন, তারপর নদীতে নেমে জলপান করলেন।

একটা গাছতলায় চুপ করে বসে রইলেন। পাতার ছায়ায় তাঁর চোখে ঘুম এসে গেল। ঘুমিয়েই তিনি পড়তেন কিন্তু কে যেন তাঁকে ডাকল।

আর সে ডাক যে কি মধুর? কতকাল পরে যেন রাঘব চৌধুরী সে ডাক শুনতে পেলেন।

কিন্তু তাকিয়ে দেখেই চমকে উঠলেন।

কে? কে তুমি?

শরীরে বিবির মত সাচ্চা চুমকির পোষাক, গায়ে জড়োয়ার গহনা, চোখে সুর্মা।

সুভদ্রা বিস্ময়ে বলল—বাবা, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

সে এগিয়ে গিয়ে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল কিন্তু রাঘববাবু সেসব আমোল দিলেন না।

কি যেন ভাবছেন তিনি? মেয়ে, এ মেয়ে তার নয়। এ এখন নবাবের উচ্ছিষ্ট বিবি। চৌধুরী বংশের সম্মান। তিনি যে ডাকাত বংশের পাপ থেকে বাঁচবার জন্যে সৎ হতে চেয়েছিলেন।

তবু সুভদ্রাকে পাশে বসতে বললেন। সুভদ্রা পাশে বসে চোখের জল ফেলল। কত কথা এক নাগাড়ে বলে গেল। গায়ের গহনাগুলি নদীর জলে ফেলে দিল।

পোষাক ছেড়ে ফেলবার জন্যে চতুর্দিকে তাকাল কিন্তু অন্য পোষাক না পেলে ছাড়তে পারবে না বলে চুপ করে রইল। বাবাকে বলল—বাবা, চলো আমরা চরমারিতে ফিরে যাই।

চরমারির কথা শুনে রাঘববাবু কিছু বলতে গেলেন কিন্তু বললেন না।

তিনি তখন মনের মধ্যে কি যেন মেলাচ্ছেন। মনের মধ্যে তার হাজার তর্কের

ঝড়। হঠাৎ মনস্থির করে নিলেন।

কেউ যেন পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল—দেখ, দেখ, বুড়োটা কেমন এক জোয়ানী মেয়েকে নিয়ে লটকাচ্ছে।

কেউ আবার তার উত্তরে বলল—জোয়ানী মেয়ে কি আজ মুর্শিদাবাদে অভাব? নবাব তো কম মেয়ে ভোগ করে নি কিন্তু সবই উচ্ছিষ্ট। হা হা করে হাসতে হাসতে তারা চলে গেল। সন্ধ্যা নেমে আসছে। সূর্য নদীর ওপারে গাছের আড়ালে ডুবছে।

বার বার রাঘব চৌধুরীর দু'চোখে জল আসছিল কিন্তু মনকে তিনি অনেক কষ্টে দৃঢ় করলেন। হঠাৎ জামার আড়াল থেকে ছোরাটা বার করলেন। বিবি, তুমি তৈরী হও। আমি তোমায় বধ করব।

সুভদ্রা বুঝতে পারল না বাবার অভিসন্ধি। অবাক হয়ে কাতর স্বরে বলল, 'কি বলছ বাবা? আমি সুভদ্রা, তোমার মেয়ে। বিবি টিবি কি বলছ তুম।

তুমি আমার কেউ নও। তুমি নবাবের উচ্ছিষ্ট, এই তোমার পরিচয়। আমি তোমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে চৌধুরী বংশের সম্মান বাঁচিয়ে রাখব।

তখন সুভদ্রা ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল। বাবা, এ তে, আমার অপরাধ নয়! আমাকে মেরো না। সেদিন তুমিও তো আমাদের রক্ষা করতে পারলে না।

কিন্তু রাঘব চৌধুরী সুভদ্রাকে ধরে ফেললেন।

তারপর।

নিজের মেয়েকে কেউ এমনভাবে ক্ষত বিক্ষত করতে পারে, রাঘব চৌধুরীকে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। দু'চোখে অশ্রুর বন্যা। আর হাতে তীক্ষ্ণধার ছোরার শক্তি।

রাঘবচৌধুরী মেয়েকে হত্যা করে তার দেহ থেকে নবাবী পোষাক গুলি ঘৃণায় খুলে নিতে লাগলেন। তারপর নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।

অন্ধকার তখন গাঢ় আকার ধারণ করেছে। হঠাৎ রাঘব চৌধুরী সুভদ্রার রক্তাক্ত দেহের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

হ্যাঁ, হাঁা, ঠিকই তুই বলেছিস্, আমি তোর অক্ষম বাবা। আমি পারি নি তোকে রক্ষ করতে কিন্তু তুই নবাব প্রাসাদ থেকে মুক্তি পেয়ে বেঁচে থেকে কি করতিস? তাই বড় কষ্টে নিজের হাতে তোকে হত্যা করলাম।

রাঘব চৌধুরী তারপর সেখানে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। রক্তাক্ত সুভদ্রার পাশে পড়ে থাকল রাঘব চৌধুরীর অচৈতন্য দেহ।

তারপর কদিন পরে দেখা গেল একজন ফকির পরণে ফকিরের মত বেশ ধারণ করে মুখে শুধু আল্লার কথা, ঘুরে বেড়াচ্ছে মসজিদে, দরগায়।

আর কান পেতে কি যেন শোনে।

লোকের মুখে শোনে অনেক কথা। কখনও চাপা, কখনও সোচ্চারে। নতুন উজীর সাহেবকে আর পছন্দ করছেন না। তিনি তাঁকে দেওয়ানী পদে রাখতে চান না। মৃত নবাব সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর জন্যে উজীরসাহেবই দায়ী। তিনিই নবাবকে বিলাসের মধ্যে আবদ্ধ রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

সরফরাজ খাঁর মা জিনৎবেগমকেও এই সন্দেহ করেছেন।

ওদিকে হাজী আহম্মদের কথাও ছড়াচ্ছে।

হাজীর ছেলে নওয়াজেস মহম্মদ সেনাদের বেতন বন্ধ করে দিয়ে তাদের নবাবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে।

তারা বেতন চাইছে, খাজাঞ্চি সরকারের উত্তর : খাজাঞ্চিখানায় টাকা নেই, টাকা এলে দেওয়া হবে।

কিন্তু সেনাদের চিৎকার, আমরা কি করব, আমরা কি না খেয়ে মরে যাব।

নওয়াজেস মহম্মদের উত্তর—আমার কিছু করার নেই, তোমরা নবাবকে গিয়ে জানাও।

নবাব শুনে অবাক। নবাব বললেন—সে কি? আমি তো গদিতে বসবার সময়ে কোষাগারে টাকা দেখেছি। হিসাবও আছে।

এদিকে নওয়াজেস তখন সেনাদের নিজের থেকে টাকা দিয়ে নিজের দলে টানছে।

এ নির্দেশও হাজী আহম্মদের।

এইসব শুনে ফকির তখন নবাবের মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে চলে।

জিনৎবেগম তখন ছিলেন নিজের আবাসে।

নবাব প্রাসাদ থেকে চলে এসেছেন স্বামী মরে যাবার পরই। তবু ছেলের জন্যে দুশ্চিন্তা। তারও কানে যাচ্ছে উজীরসাহেবের নামে নানা কথা।

এক এক সময়ে এসব মিথ্যা ভাবেন, আবার প্রমাণ পেয়ে সন্দিগ্ধ হন। কিন্তু কি করবেন ভেবে পান না।

হঠাৎ এই সময়ে একজন ফকিরসাহেব তাঁর দর্শন চান।

তিনি বুঝতে পারেন না কেন?

বিরক্ত হয়ে বলে দেন বাঁদীকে, এখন দেখা হবে না?

কিন্তু আবার কাতর প্রার্থনা আসে, দেখা হলে তাঁরই মঙ্গল হবে।

তখন জিনৎবেগম চিকের আড়ালে এসে দাঁড়ান।

তারপরই দেখা যায় নবাব সরফরাজের পাশে ফকিরকে।

হাজীসাহেব বিরক্ত হয়ে নবাবের কাছে জানতে চান—এ কে?

উত্তর শোনেন—মা একে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমি জানি না।

ফকিরের বেশ এত অদ্ভুত হয়েছিল যে হাজী আহম্মদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়েও তাকে চিনতে পারেন না।

এদিকে ফকির প্রথমে গোপনে পরে সর্বসমক্ষে হাজী আহম্মদদে প্রত্যেকটি কাজের বিরোধিতা করতে থাকের।

একদিন দরবারে সবার সামনেই হাজীকে বলেন—কতদিন আর চক্রান্ত করে যাবেন হাজী আহম্মদ সাহেব!

দরবার ভর্তি আমীর, ওমরাহ। সবাই এ ওব মুখ চাওয়াচাযি করে।

হাজী ক্রুদ্ধকণ্ঠে নবাবের কাছ থেকে অপমানেব বিচার চান কিন্তু নবাব বলেন—আমি কিছু করতে পারব না, যা কিছু বলার মাকে বলবেন।

তাহলে আমি আমার পদ ছেড়ে দিই!

ফকির হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠেন।

পদ ছেডে দেবেন, তাহলে কি আবার স্বদেশে ফিরে যাবেন?

হঠাৎ হাজী একদিন কাউকে কিছু না বলে ভাইযের কাছে পাটনায় চলে যান।

কিন্তু হাজী যে হাজী যে জাল কতখানি ছড়িযে ছিলেন ফকির সাহেব জানতেন না।

হাজী সরে যেতে আমীর ওমরাহবা সবাসরি নবাবের সমালোচনা করতে থাকে। হাজীসাহেবকে যদি ফিরিযে আনা না হয, তাহলে তাঁরাও দরবার ছাডবেন। হাজী আবার ফিরে আসেন।

ফকিরের শুধু দরবারে যাওয়া বন্ধ হয। কিন্তু ফকির চুপ করে বসেছিলেন না। হাজীকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করে প্রাণদণ্ড দেবার ফিকিরে থাকলেন কিন্তু কেউ হাজীর বিরুদ্ধে বলতে চায না।

যাকেই বলেন, সে বলে—না, না মাপ করতে হবে।

কিন্তু জানেন, এই হাজীই একদিন নবাবী ছিনিযে নেবে।

ক্ষতি কি? নবাব তো একজন হবে, সে যেই হোক।

কিন্তু লোকটা দারুণ স্বার্থপর।

স্বার্থপর কে নয? সুযোগ পেলে সবাই স্বার্থপর হয।

কিন্তু হঠাৎ নবাব সরফরাজ খাঁ একদিন উজীরসাহেবের ওপর চটে উঠলেন।

দুটি ঘটনা।

হাজীসাহেব আবার লোক দিযে মেযে যোগাড করছিলেন। আর সুজাকে পরিবেশনের মত সরফরাজ খাঁকেও পরিবেশন করছিলেন।

সরফরাজ খাঁও বাপের মত সুরা, নারীতে আসক্ত ছিলেন, এবং নতুন নতুন নারী পেযে তিনি খুশিও।

কিন্তু একদিন তিনি হঠাৎ খুশি হলেন না। হাজী আহম্মদের সামনাসামনি দাঁড়ালেন। আপনি আমার ভাল চান না মন্দ চান?

হাজীসাহেবের গলা কেঁপে উঠল। তবু তিনি সংযত মানুষ। তাড়াতাড়ি কুর্নিশ করে মুখের ভাব পালটে বললেন—একি বলছেন নবাবসাহেব. আমি আপনাদের গোলামের গোলাম। আপনাদের সেবা করতে পারলেই জীবন ধন্য।

আপনি প্রায়ই হারেমে নতুন মেয়ে আমদানি করেন। আমি অবশ্য তা পেয়ে খুবই খুশি হই। কিন্তু আপনি কি এই জন্যেই নবাব দরবারের সবচেয়ে বড় পদটা নিয়ে আছেন ?

ঐ একই পদ্ধতিতে নতুন নবাবকে ঘায়েল করা গেল না ভেবে হাজী সাহেব মেয়ে যোগাড় করা ছেড়ে দিলেন।

আর একদিন।

সে চক্রান্ত কার বুঝতে পেরেছিলেন হাজী কিন্তু ফকিরকে কিছু বলতে গেলে জিনৎ বেগমের বিরাগভাজন হবেন বলে চুপ করে রইলেন।

কিন্তু প্রাণটা নিয়ে টানাটানি শুরু হল।

বিচারের আসনে নবাব সরফরাজ খঁা।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটি মুজরিমা বাঁদী। সে স্বীকার করেছে, উজীর-সাহেবই আদেশ দিয়েছিলেন, নবাবের সরবতের গেলাসে বিষ মিশিয়ে দিতে।

উজীরসাহেব দাঁড়িয়ে উঠে গর্জে উঠলেন – মিথ্যা কথা !

নবাব সরফরাজ তখন টেনে টেনে বলছেন—ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যাকারীর একই সাজা হয়, একি জানা নেই দরবারের সম্মানীয় ব্যক্তিদের।

কিন্তু দরবারের অন্য পাশ থেকে উত্তর আসে—প্রমাণ অভাবে ষড়যন্ত্রকারীর সাজা হতে পারে না। মুজরিমা বাঁদী মিথ্যা কথাও তো বলতে পারে।

সরফরাজ খঁা যেন নবাবী সিংহাসনে বসে কাঠের পুতুল।

তিনিও বুঝতে পারছেন, তাঁর সিংহাসনের পরমায়ু শেষ হয়ে আসছে। অথচ জেনে শুনেও কিছু করতে পারছেন না। যা কিছুই করতে যান, আমীর ওমরাহরা বিরোধিতা করে।

এদিকে একদিন হাজী আহম্মদের আবাসগৃহে গুপ্তঘাতক তাঁকে হত্যা করতে যায় কিন্তু সেও ধরা পড়ে যায়।

হাজী আহম্মদ যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েই এগিয়ে চলেছেন। তিনি যে কোন যুদ্ধেই জয়লাভ করবেন। আর করলেনও।

একদিন প্রত্যূষে উঠে শোনা গেল। গিরিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধ লেগে গেছে। নবাব সৈন্য ছুটছে, ওপাশে পাটনা থেকে আলিবর্দী খঁা এসে গেছেন।

যুদ্ধটা একটা প্রহসন।

নবাবের অনেক সিপাই হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রেও তাই হল।

সরফরাজ গেলেন ও সামান্য সৈনিকের মত যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন।

বিজয়ী আলিবর্দী নিজের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন। সামনের সারির প্রথমে আলিবর্দী ও হাজী আহম্মদ। তাঁদের পিছনে হাজী আহম্মদের তিন ছেলে, নওয়াজেস, সৈয়দ আহম্মদ ও জৈনুদ্দিন। আর সব বিজয়ী সেনা।

দু'পাশে দর্শকের সারি দাঁড়িয়ে আছে। তারা জানাচ্ছে নতুন নবাবকে অভি

নন্দন। জয়ধ্বনি দিচ্ছে মির্জা মহম্মদ আলিবর্দীর।

দূরে প্রাসাদের সামনেও অগনিত নরনারী। প্রাসাদের তোরণদ্বারে সানাই বেজে চলেছে।

হাজী আহম্মদ ভাবের পাশে চলতে চলতে তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, নবাবী গদি তোমায় কায়েম করে দিয়েছি? একবার জহরৎ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম, এবার তো ধরা পড়িনি? তবে সেদিন ধরা পড়েছিলাম বলে আজ বড় কিছুর জন্যে অনেক সাবধান হয়েছি।

আলীবর্দী দাদাকে কোন কথা বলতে পারেন না। শুধু সপ্রশংস-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

সত্যিই দাদার বুঝি তুলনা হয় না। এ সামান্য জহরৎ চুরি নয়, এ যে আরো অনেক বড় সৌভাগ্য।

প্রাসাদের ভেতরে তখন বিজয়ী সেনা ঢুকে পড়েছে। হাজীসাহেব আর বেতনভোগী উজীর নয়, বলতে গেলে তিনিই এখন নবাবীর সব। তাই বুক ফুলিয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে তাই জানান দিচ্ছেন।

প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত। উৎসব শুরু হয়ে গেছে। কেউ নাচছে, কেউ গান গাইছে। প্রজাদের জন্যেও অবারিত দ্বার।

কিন্তু হাজীসাহেব বুঝতে পারেন নি, তা ছাড়া ভুলেও গিয়েছিলেন সেই ফকিরকে। এত বড় নবাবী কায়েম করতে গিয়ে কত বড় বড় শত্রুকে ধরাশায়ী করেছেন, আর এ কে এক মুষিকতুল্য।

কিন্তু কে থা দিয়ে যে সেই আনন্দ উৎসবের সময়ে সেই মুষিকই বেরিয়ে এল তিনি জানেন না।

ভীড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ সেই ফকির নিষ্কাসিত অসি বের করে হাজীকে আঘাত করতে গেলেন।

হাজী আহম্মদ, আমাকে ভুলে গেছ, তবে মৃত্যুর জন্যে তৈরী হও।

এ কথাটা যদি তিনি নাটকীয়ভাবে না বলতেন হয়ত অসিবিদ্ধ করে ফেলতেন হাজীকে।

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেললেন হাজী আহম্মদ ফকিরের হাত।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—কে তুমি?

আমি ফকির।

ফকিরকে দেখে তিনি চিনলেন। এই সরফরাজকে তাতিয়েছিল।

কিন্তু ফকির বললেন—রাঘব চৌধুরীকে ভুলে গেছ? চরমারির সেই রাঘব চৌধুরী।

আর সঙ্গে সঙ্গে হাজীসাহেব রাঘব চৌধুরীর সেই তরবারীর অগ্রভাগ দিয়ে রাঘব চৌধুরীর একটি চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

আরও একটি চোখকে বিদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন, ছুটে এসে নবাব আলিবর্দী ধরে

ফেললেন। বললেন—দাদা, এই আনন্দের দিনে আর রক্তপাত কর না।

কিন্তু তুমি জান না, এই হারামী কাফের আমাদের অনেক ক্ষতি করতে চেয়েছে। ওকে তার উপযুক্ত সাজা না দিলে সে পরে আমাদের ক্ষতি আরও করতে পারে।

আলিবর্দী তখন এই আনন্দের দিনে আর রক্তপাত করতে চাইছিলেন না। কোথা থেকে আজ কোথায় এসেছেন ? একি সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবা যায় ? তাই হেসে বললেন—কেউ আর আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না দাদা, ওকে ছেড়ে দাও।

রাঘব চৌধুরী এক চোখের যন্ত্রণা নিয়ে আনন্দ মুখরিত নাগরিকদের ধিক্কার নিতে নিতে টলায়মান দেহে দূরে লোকালয়হীন পরিবেশে মিলিয়ে গেলেন।

তাঁর দিকে তাকালে তখন দেখা যেত, একটা চোখ ওঁর গলে গেছে কিন্তু আর একটা চোখে ব্যর্থতার জ্বালা।

তারপর আর একবার সুযোগ পেয়েছিলেন রাঘব চৌধুরী।

সেদিন হাজীর তিন ছেলের সাথে আলিবর্দীর তিন মেয়ের বিবাহ।

নিজামত প্রাসাদ ঘিরে আলো আর ফুলের সমারোহ।

সেদিনও প্রজাদের জন্য প্রাসাদের দ্বার মুক্ত।

সেনাদের পাহারা নেই। শাসনের রক্ত চক্ষু নেই।

রাঘব চৌধুরী নিজেকে নারী সাজিয়ে অন্তঃপুরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন। যেখানে বিবাহের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে পৌঁছে অতর্কিতে হাজীর পিঠে ছোরার আঘাত হানতে যান।

কিন্তু তখনও তাঁর হাতটা কিরকমভাবে কেঁপে যায়।

হৈ চৈ পড়ে যায়। তাঁকে ধরবার জন্যে লোক খোঁজে কিন্তু অতো নারীর মধ্যে পুরুষ বেশে কে নারী এসেছে, খুঁজতে খুঁজতে তিনি সবার অগোচরে প্রাসাদের বাইরে চলে যান।

শুধু হাজী আহম্মদ সেদিন বুঝতে পারেন নি, সেই রাঘব চৌধুরী এখনও প্রতিশোধের জ্বালায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুঝতে পারলে তখনই সিপাই দিয়ে নগরের যে কোন জায়গা থেকে রাঘব চৌধুরীকে ধরে আনতেন।

আলিবর্দী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্মরণে আনার চেষ্টা করছিলেন, এ কে হতে পারে ? পায়ের কাছে পড়ে আছে রক্তাক্ত নিহত রাঘব চৌধুরীর মৃতদেহ।

তারপর ভাবলেন নবাবী পাওয়ার জন্যে তো অনেক গলতিই করতে হয়েছে। সেদিন নবাবী পাওয়ার পর সরফরাজের মায়ের কাছে গিয়েছিলেন।

জিনৎ বেগম তখন পুত্রশোকে অভিভূতা।

তিনি জিনৎ বেগমের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে বলেছিলেন—বেগম-সাহেবা, আমি কি সত্যিই কোন অপরাধ করেছি ? মসনদ কায়েম করতে গেলে তো এমনি ষড়যন্ত্র করেই রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে হয়। তবু আপনার কাছে এসেছি আমি ক্ষমা চাইতে। আপনি ক্ষমা করুন, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি প্রজাদের

মঙ্গলের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

আলিবর্দী নবাবী পাওয়ার পর, নবাবী পাওয়ার জন্যে যাদের ওপর অবিচার করেছিলেন ; তারা কেউ এসে আবেদন করলে সবকিছু মঞ্জুর করে দিতেন।

তেমনি মৃত রাঘব চৌধুরীর দিকে তাকালেন।

আবার স্মরণ করার চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু স্মরণ করতে পারলেন না। অনুতপ্ত হলেন। ভাবলেন—এ বোধ হয় বড় রকম কিছু আঘাত পেয়েছিল। তাই প্রতিশোধের জন্যে কিছু করা উচিত। সিপাইকে ডেকে হুকুম দিলেন—একে রাজসিক সম্মান দিয়ে যেন নদীর তীরে দাহ করা হয়। যাতে এর আত্মা শান্তি পায় তার জন্যে যেন যথোচিত ব্যবস্থা হয়।

আলিবর্দী হুকুম দিয়ে আরাম কক্ষে চলে গেলেন।

আর চরমারির সেই রাঘব চৌধুরীর মৃতদেহ শোভাযাত্রা সহকারে নদীর দিকে নিয়ে চলল নবাবের লোকেরা।

আলিবর্দী তখন আরাম কক্ষে বসে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলছেন।

যে গলতি, যে অন্যায় এই নবাবী পাওয়ার জন্যে হয়ে গেছে সে কি এমন কিছু নিবেদন করলে মিটবে না?

তখন রাঘব চৌধুরীর মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে নগর প্রদক্ষিণ করছে।

নগরের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল—কে বাবা এ? এত আড়ম্বরে শোভাযাত্রা!

সিপাইরা হাসতে হাসতে বলল—প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে নবাবের মাথাব্যথা। এ নবাবের নতুন ফরমাইস।

না, না, আমি সব দেব। তবু ওকে প্রাণে মেরো না। ও বেকসুর।

বন্দিনী সুভদ্রার আর্জি শুনে শাস্ত্রী পাহারাদার হঠাৎ বন্দী-কক্ষের লৌহদরজা ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে ফেলল। তারপর মাথা তুলে বলল—আপ চলিযে!

সুভদ্রা ভয়ার্ত চোখে না না বলে আবার গরাদ চেপে ধরল।

শাস্ত্রী পাহারাদার আবার দরজা বন্ধ করে তালা লাগাতে গেল কিন্তু ছুটে এসে সুভদ্রা সেই তালা চেপে ধরে কাতর স্বরে বলল—আমি যদি সব দিই, তাহলে ওকে তোমরা ছেড়ে দেবে তো, প্রাণে মারবে না?

পাহারাদার বিরক্ত হয়ে বলল—আপনি যদি যেতে চান চলুন, আপনার আর্জি সরকারের কাছে পেশ করবেন। শুধু আমার ওপর হুকুম আছে, কবুল করলেই আপনাকে পাঠিয়ে দিতে।

কিন্তু ওরা যদি আমার সব কেড়ে নিয়ে তাকে ফিরিয়ে না দেয়! বেইমানের এই রাজপুরীতে আমার যে কিছু বিশ্বাস হয় না!

সুভদ্রার গোলাপী বর্ণ মুখের ওপর দুটি নীল চোখের প্রান্ত চুইয়ে টপ্ টপ্ করে জল গাল বেয়ে ঝরতে লাগল।

প্রায় বাইশ দিন এখানে সে বন্দী আছে। বাইশ দিন ধরে বন্দীকে যে আহার দেওয়া হয়েছে, তাতে অন্য কেউ হলে হয়তো শয্যা নিত, কিন্তু সুভদ্রার ভেতর থেকে কী যেন এক আসুরিক শক্তি তাকে সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিল। এখানে তাকে কেন আনা হয়েছে সে ভাল মতই জানে। চুরি করে নিয়ে এসেছে নবাবরক্ষী। পুকুরঘাটে স্নান করতে গিয়েছিল। ফেরার পথে বাউল পাহাড় জঙ্গলের কাছে একজন ঘোড়সওয়ার তার মুখের ওপর এক পট্টি ফেলে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। তারপর সেই পট্টি বাধা অবস্থায় কত পথ পার হয়ে এক জায়গায় এনে পৌছল। যখন তার চোখের সামনে ঝলসে উঠল সূর্যের বর্ণোজ্জ্বল এক অদ্ভুত দ্যুতি।

তারপর চোখে সয়ে এলে কিন্তু সে আতঙ্কে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

সমস্ত কক্ষটি কী সুন্দর করে সাজানো। ঐশ্বর্যের হীরা-পান্না যেন দেয়াল গাত্রে খোদিত হয়ে জলুসের অনুরূপ দান করেছে। দর্পণের ওপরে পড়েছে আলোর বর্ণাঢ্য। বেলোয়ারী ঝাড়ের ওপর জ্বলছে লাখো যৌবনের বিদ্যুৎশিখা।

সময়টি সেদিন সন্ধ্যাই ছিল।

কক্ষের মধ্যে ফরাসের ওপর হরেক ফুলের স্তবকের সাথে ক'টি যুবতী ফুলের মত ফরাসের ওপর দেহসুষমা ঢেলে দিয়ে বিভিন্ন ঢঙে উপবিষ্ট ছিল কিন্তু তাদের স্বল্প

বসনের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রার আতঙ্ক। কাঁচুলী-সম্বল ঘাঘরা পরে মেয়েগুলি কেমন করে যে একটি পুরুষের সামনে নির্লজ্জ হতে পারল, সেই কথা ভেবেই সে আরও সঙ্কুচিত হল।

যে পুরুষটি চুড়িদার পায়জামা ও লম্বা পিরান পরে ফরাসের ওপর মখমলের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে সেই রমণী-পরিবৃতা হয়ে সরাব পান করছিলেন, হঠাৎ সুভদ্রার জড়োসড়ো দেহের দিকে তাকিয়ে রক্তাভ চোখে ভুরুদ্বয় কুঞ্চিত করলেন, তারপর স্বর্ণের পানপাত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে ডাকলেন—অ্যাই বাঁদী!

বাঁদী এসে মাথা নত করে হুকুমের অপেক্ষায় কুর্নিশ করে দাঁড়ালে নবাব সুজাউদ্দিন বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন - এ আওরতকো এইসি হালত কাহেঁ? আচ্ছা কাপড়া কাহে নহী দিয়া?

বাঁদী মাথা নত করে বলল—হুজুর, আপনার হুকুমই আছে, নয়া আওরত রাজপুরীতে এলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে পেশ করতে হবে। তারপর পছন্দ হলে সেই মত তার ব্যবস্থা হবে।

নবাব সুজাউদ্দিন আর একবার মুগ্ধদৃষ্টিতে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন. তারপর রুক্ষকণ্ঠে হুকুম দিলেন—যাও, জলদি মেরা হুকুম তামিল কর।

সুভদ্রাকে বাঁদী সেই হুকুম তামিল করতে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

আর সুভদ্রার সেই থেকে শুরু হল বক্ষ দুরু দুরু। সে ছোট্ট মেয়ে নয়, তার বুদ্ধিও কম ছিল না। এরপর নবাব তার সঙ্গে কী আচরণ করবেন সবই স্পষ্ট।

কিন্তু বাঁচা কী যায় না? মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে কী লুণ্ঠনের সামগ্রীই হবে? তারপর তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আবর্জনার মতই প্রাসাদের কোথাও অন্ধকারে ফেলে রাখবে। হয়তো নবাবের পাশে ঐ নির্লজ্জ মেয়েগুলিও তার মত একদিন এমনি অবস্থায় এসেছিল।

কিন্তু পালাবে কেমন করে,? চতুর্দিকে প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি। তাছাড়া রাজপুরীর বাইরে যেতে গেলে জীবন্ত বেরিয়ে যেতে পারবে না, এখানে যারা ঢোকে তাদের পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়।

বাঁদীদের সহযোগিতায় গোলাপজলে স্নান করে, আতরের সুবাস শরীরে মেখে প্রসাধনে মুখমণ্ডল রাঙিয়ে যখন বেগুনী রঙের এক রেশম বস্ত্র পরিধান করল, তখন বাঁদীরাই হেসে বলল—বিবিসাহেবা, নবাব সরকারের দিল্ আপনি লুঠে নেবেন। এমন খুবসুরত আওরত তিনি জিন্দেগীতে কখনও দেখেন নি।

হঠাৎ সুভদ্রার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—এক রাতকা রোশনি। একরাতের জন্যে একটি মাসুম লেড়কীর রোশনিতে বিজলী জ্বলে, তারপর তার সারা দুনিয়া সাহারা করে দিয়ে তাকে পূইকুসুমের মত ফেলে দেওয়া হয়।

বাঁদীরা মুচকে হেসে বলল—তা কেন হবে? তুমি বহিন নবাব সরকারের দিলে আগ জ্বালা দেও। তারপর দেখবে তুমিই জিতে নেবে দিল্। নবাব বুদ্ধু হয়ে যাবেন। মরদকা দিল্ জিতে নিতে তকলিফের প্রয়োজন হয় না।

গ্রামের সকলেই তাকে নিষেধ করেছিল—সুভদ্রা, ঘাটে আর যাস্ নি, নবাবের সিপাইরা গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িতেই স্নান, কাপড় কাচা সারিস জল তুলিয়ে এনে।

গ্রামের সকল পুরনারীই সেই ব্যবস্থা করেছিল। যুবতী রূপসী মেয়েরা ঘরের বের হত না। সবাই শুনেছিল, বাংলার নবাব সুজাউদ্দীন এখন ভোগের জন্যে নয়া নয়া আওরত খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কার কার ভাগ্যে কখন যে সিপাইয়ের দৃষ্টি পড়বে, কিছুর ঠিক নেই।

কিন্তু সাহসিনী সুভদ্রা তার মায়ের কথাও শোনে নি। যে ঘাটে একদিন গ্রামের রমণীতে ভীড় হয়ে যেত সেই শূন্য ঘাটে সে একাই যেতে শুরু করল।

গ্রামের পুরুষরা বলল—মেয়েটা এবার গেল।

কিন্তু সুভদ্রা তখন বিপদটা কোনদিক দিয়ে আসতে পারে তাই ভেবেছিল। ভয় তার একটুও ছিল না। তারপর যখন বিপদ এল, সে বুঝতে পারল না কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল।

আফসোস তার নেই। মেয়ে হয়ে জন্মে এমনি চোরের মত লুকিয়ে থাকাও কেমন যেন অসম্মানজনক। তারা কী শুধু লুণ্ঠিতা হবার ভয়েই নিজেদের চার দেয়ালের মাঝে বন্দী করে রাখবে? কিন্তু কেন?

তাই বাঁদীরা তাকে সাজিয়ে নিয়ে যখন সেই সাজানো কক্ষের দিকে নিয়ে যেতে লাগল, বুক কাঁপলেও সাহস হারাল না। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে ভাবল দেখাই যাক না, রক্ষা যদি নিজেকে না করতে পারে, রক্ষা কেউ নাও তো পেতে পারে? একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা কী যোগাড় করতে পারবে না?

আবার সেই কক্ষ, নবাব সেই রমণী পরিবৃতা হয়ে সরাব পান করছিলেন। সুভদ্রা প্রবেশ করতে মেয়েগুলি মাথা নত করে বেরিয়ে গেল।

কক্ষটি সম্পূর্ণ নির্জন হল। কেউ নেই আর কোথাও। অনেক আলোর জলুস ছড়িয়ে আছে শুধু, আর ফরাসের রক্তবর্ণ গালিচার ওপর কিছু পিষ্ট কুসুমের এলোমেলো গড়াগড়ি।

নবাব তখন আর সরাব পান করছিলেন না, কণ্ঠের ওপর দোদুল্যমান একটি মুক্তার মালা অন্যমনস্ক হয়ে আঙুলে জড়াতে জড়াতে সুভদ্রার দিকে তাকিয়েছিলেন।

দৃষ্টিতে কী ছিল সুভদ্রা জানে, তবে ঐ নেশা করা চোখের জড়ানো দৃষ্টির আকর্ষণে তার কেমন যেন সব চেতনা হারিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ নবাব মৃদু হাসিতে মুখখানি রাঙিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন—তুমি জাদা খুবসুরত আওরত আছ। এত রূপ তুমি কোত্থেকে পেলে? খোদা কী তোমাকে সব বিজলীর চমক দিয়ে পাঠিয়েছেন?

সুভদ্রা মাথা নত করে রূপের প্রশংসা শুনল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। সে তখন তাকিয়েছিল নবাবের কোমরের খাপে গোঁজা একটি ছুরিকার দিকে।

কোথায় যেন সারেঙ্গীতে সুরেলা ছন্দে তান লঠল। কে যেন এই মুহূর্তটিকে মিঠে

করবার জন্যে সুরবাহারে নতুন এক সুরের জন্ম দিল।

"আর নবাব নেশাঘোরে জড়িতস্বরে বলে উঠলেন—বেশক্ দুনিয়া কিতনা হাসিন, আশমানসে জাদা তোমলোককা জওয়ানী দিল্। এই বলে তিনি সুভদ্রার চিবুকটা তুলে ধরে তার দুটি চোখের দিকে তাকালেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুভদ্রার হাতের নাগালের মধ্যে নবাবের কোমরের ছুরিকাটি এসে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে দ্বিরুক্তি না করে মুঠি ভরে তুলে নিল। হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে নবাবের বক্ষ লক্ষ করে চালিয়ে দিল।

কিন্তু নবাব বেসামাল হলেও অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করলেন। ছুরিকাশুদ্ধ হাতটি চেপে ধরলেন, তারপর এক ধাক্কায় ফরাসের ওপর ফেলে দিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন—এই কই হ্যায়।

রক্ষী এসে সঙ্গীন তুলে নবাবের সামনে দাঁড়াল, আর নবাব ঘৃণিতস্বরে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন—এই বেশরম আওরতকে আমার সামনে থেকে নিয়ে যা। যেদিন এর দেমাগ ছুটে যাবে নিয়ে আসবি। হঠাৎ কি যেন ভেবে নবাব অট্টহাস্য করে উঠলেন।

সুভদ্রা তারপর বন্দী হল নবাব প্রাসাদের এক উঁচু মহল্লার নিরন্ধ্র কক্ষে।

হয়তো এখানেই তার জীবনের বাকী দিনগুলি কেটে যেত, কিংবা হত তার প্রাণদণ্ডের আদেশ কিন্তু তা হল না।



সেদিন সারারাত্রি কারাগারের ছোট্ট ঘরের মধ্যে বসে আর কিছু ভাবতে পারে নি সুভদ্রা, শুধু মাঝে মাঝে তার আফসোস হয়েছিল, কেন সে আরও তাড়াতাড়ি ছুরিটি চালাতে পারল না। কাজ তো সে ঠিকই হাসিল করেছিল, কত সহজে এক কামোন্মত্ত নেশাসক্ত পুরুষকে চিরজীবনের জন্যে যমালয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সে না হয় এই অপরাধের জন্যে শাস্তি পেত কিন্তু কতকগুলি মাসুম মেয়ের জীবন এই নবাবের হাত থেকে রক্ষা পেত।

এমনি কথাই ভাবতে ভাবতে কত রাত্রি হয়েছে সে জানে না। হঠাৎ অন্ধকারে একটু আলোর শিখা দেখে সে চমকে উঠলে, দেখল একজন রক্ষী একটি রেকাবে করে কী যেন নিয়ে ঝন্ঝন্ শব্দে দরজার তালা খুলে ঢুকছে। তারপর সেই থালাটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে আলোটি সামনে ধরে দাঁড়াল।

সুভদ্রা বুঝল তার রাত্রের আহার কিন্তু আহারের শ্রী দেখে তার মেজাজ চড়ে গেল। সে রেকাবটা লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্ষুব্ধস্বরে বলল—আমি কী কুত্তা, যে কুত্তার মত খাবার দেওয়া হয়েছে?

রক্ষীটি মৃদুস্বরে বলল—এখানকার বন্দীর জন্যে এই আহারই সরকারের হুকুম।

তোমার সরকারের নিকুচি করেছে। যাও নিয়ে যাও, আমি খাব না।

রক্ষী আর কোন কথা বলল না, ধীরে ধীরে রেকাবটি তুলে নিয়ে তালা বন্ধ করে আলো হাতে চলে গেল।

আবার নেমে এল কয়েদখানায় সেই নিবিড় অন্ধকার।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চমকে উঠল সুভদ্রা, ঘরের মধ্যে কোথা থেকে জ্যোৎস্নার আলো প্রবেশ করছে।

আলোয় সেই ছোট্ট ঘরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সবকিছু ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণ নিশ্বাস রুদ্ধ করে সে মৃত্যুরই প্রার্থনা করছিল। হঠাৎ আলো দেখে তার প্রাণ নেচে উঠল। তার মনে হল, যেন তার মুক্তির আলো কেউ জেলে দিল। সব শঙ্কা সব দুশ্চিন্তা অপসারিত, সে যেন সেই গ্রামের বাড়িতে থেকে কোন স্বপ্নের কথা ভাবছে।

সারাদিনের ক্লান্তি, বন্দীজীবনের দুশ্চিন্তা, এমন কী নবাবকে হত্যার চেষ্টা করেছিল, সে কথাও সে সেই মুহূর্তে ভুলে গেল. ভুলে গিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, আলো কোথা থেকে আসছে। সে দেখল, তারই ঘরের অনেক উঁচুতে একটি বিরাট ফোকর, একটি মানুষ বেরিয়ে যেতে পারে, এমনি বড় ফোকর থেকে বাইরের জ্যোৎস্নার আলো কক্ষে প্রবেশ করছে।

বুঝতে পারল এই ফোকরটি রাখা হয়েছে আলো-বাতাসের জন্যে। দরজায় লোহার গরাদ কিন্তু তার সামনেই বিরাট মর্মর-খচিত প্রাচীর। এই বদ্ধ আবহাওয়ার জন্যেই ঐ ফোকরের ঘুলঘুলি। কিন্তু এই ঘুলঘুলি দিয়ে তো মানুষ পালিয়ে যেতে পারে।

সুভদ্রা সেই রাত্রে আর ফোকরটির ওপর ওঠবার চেষ্টা করল না। শুধু দেওয়ালগাত্রে একটি ছোট্ট গর্ত দেখে মৃদু হেসে দিনের অপেক্ষায় থাকল। এই গর্তের ওপর পা রেখে যে কোন বন্দী পালানোর চেষ্টা করেছিল তারই প্রমাণ রয়েছে। তবে সে পালিয়েছিল কিনা জানে না, আর সে পুরুষ মেয়ে তাও জানা নেই। তবে সে মেয়ে হয়ে আর একবার চেষ্টা করবে ঐ ফোকর দিয়ে পালিয়ে যেতে।

এমনি এক সুখকর আনন্দে সুভদ্রার কখন ঘুম এসেছিল সে জানে না, তাকে ঘুমোবার জন্যে একটা চ্যাটাই দেওয়া হয়েছিল, সে তার ওপর শোয় নি। নবাবের দেওয়া জমকালো পোশাক পরে মুক্তোর মালা গলায় দিয়ে সে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেতেই বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে যদি তখন নবাবের বুকে ছুরি চালাতে না যেত তাহলে এতক্ষণে সেই নবাবের আদরে সোহাগে তাঁর শয্যায় শুয়ে নিজের ইজ্জৎ দিয়ে নতুন জীবনের সন্ধান খুঁজে দিশেহারা হয়ে চোখের জলে ভাসত। তা করেনি বলেই এই কয়েদখানায় বসে পরম আরামে তার চোখে তন্দ্রা নেমে এল।

হঠাৎ আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল, কানের কাছে খুব জোরে অশ্বক্ষুরের চলার ধ্বনি জেগে উঠল। তার যেন মনে হল, এই ঘরের ঠিক পাশ দিয়ে কোন সড়ক পথ আছে, সেই সড়ক পথ দিয়ে কেউ বীরদর্পে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর বসে থাকতে পারল না, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে

কাপড়টা ঠিক শরে সেই ছোট্ট গর্তে একটি পায়ের ক'টি আঙুল প্রবেশ করিয়ে দেয়াল ধরে ফোকর দিয়ে মুখ বাড়াতে গেল কিন্তু পিছলে পড়ে গেল মাটিতে চিৎপটান হয়ে। পিছনের নিম্নাঙ্গে ব্যথা পেল ভীষণ কিন্তু তার তখন ব্যথা অনুভব করবার শক্তি নেই। ওদিকে সেই অশ্বক্ষুরের ধ্বনি আরও কাছে ছুটে আসছে, এখুনি চলে যাবে ওর সামনে দিয়ে।

হঠাৎ পাশে আর একটি দেওয়ালের ধাপ দেখল, এবার সুভদ্রা লাফিয়ে সেই ধাপটি ধরে ফেলল। হাতের কনুইটা একটু ছড়ে গেল কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পূর্বের গর্তে পা দিয়ে ফোকরের কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং সম্পূর্ণ মুখটি বাড়িয়ে দিতে সে দেখতে পেল তার অনুমানই ঠিক।

একটি সড়ক পথের অনেক উঁচুতে সে আছে। সেখান থেকে একটি বড় প্রাচীরের ওপাশে সেই পথটি। পরিষ্কার সুভদ্রা সেখান থেকে এক ঘোড়সওয়ারকে ঝড়ের মত চলে যেতে দেখল। আর সঙ্গে সঙ্গে তারই নীচের কোন অংশ থেকে কে যেন গম্ভীর স্বরে হুঁশিয়ার ধ্বনি তুলে চিৎকার করে উঠল—রুখ যাও সিপাই, রুখ যাও।

কিন্তু সেই অশ্বারোহী থামল না। এমন কী গতি একটু শ্লথ না করে, বীরদর্পে মস্তক উন্নত করে শ্বেত ঘোড়ার পিঠে আরও চাপড় মেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে অদৃশ্য হল।

তবু আবার গম্ভীর স্বর উচ্চারিত হল—রুখ যাও সিপাই, রুখ যাও।

কিন্তু তখন সেই অশ্বারোহী অনেক দূরে। তখনও তাকে দেখতে পাচ্ছিল সুভদ্রা। তারপর ক'টি আমগাছের সারির পিছনে একটি বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল। আর পরক্ষণে সুভদ্রার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠল।

অস্ফুটস্বরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—বীর বটে ঐ ঘোড়সওয়ার!

সুভদ্রা অনেকক্ষণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেই সড়ক পথের ওপরই তাকিয়ে রইল।

তখনও প্রভাতের আলো ভাল করে ফোটেনি। ভোরের আকাশ সবে ফুলের মত চোখের পাপড়ি মেলছে। অন্ধকার ঘুমের আমেজ ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছে। গাছের পাতায় ফাঁকে দূরে বনের গভীর গহনে তখনও অন্ধকারের শেষ চিহ্ন। যেন অভিসারিকা সারা রাত্রি ধরে অভিসার রচনা করে ক্লান্তিহীন ভাবে মনের খুশিতে ভোরের স্নিগ্ধ পরিবেশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুভদ্রা তাই চোখ মেলে সেই ফোকরের মধ্যে থেকে মুখ বের করে দেখতে লাগল। তার চোখ দুটিতে কেমন যেন হঠাৎ সব ভাল লেগে গেল। এই পরিবেশ, ঐ বীর অশ্বারোহী, সব। নিজের কথা সেই মুহূর্তে কেমন যেন সে বিস্মৃত হল। হঠাৎ তার পালিয়ে যাবার বাসনা হল। এই বিরাট কারাকক্ষ থেকে সে কী ঐ প্রাচীরের ওপারে সড়কের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে না?

ঠিক এমনি সময় সানাই বেজে উঠল। আলাহিয়া বিলাবল রাগে সানাই। সুভদ্রা কিছুক্ষণ সেই সানাইয়ের সুরের ওপর কান পেতে মনে মনে বলল—রাজপুরীর ভোর হল, রাজ্যপাট এবার শুরু হবে।

তারপর সে নেমে এল সেই ফোকর থেকে।

কিন্তু সারাদিন ধরে একটি কথাতেই তার মন ভরে থাকল—'রুখ যাও সিপাই, রুখ যাও'। আর তার সঙ্গে একজন বীরের সেই বীরত্ব, অশ্বের গতি এতটুকু মন্দীভূত না করে ছুটে চলে যাওয়া। এই স্পর্ধা যেন আর কখনও শোনা যায় নি। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বার বার সুভদ্রার আর একটি কথা মনে পড়তে লাগল · ওর কাছে কী কোন তীক্ষ্ণধার তরবারী ছিল না? যদি রক্ষীরা ছুটে গিয়ে ওকে আক্রমণ করত?

নানা ভাবনার মধ্যে দিয়ে তার সারাদিনের বন্দীজীবন চলতে লাগল। আবার মনে এল—ও কী শুধু এই একটি দিনের জন্যে এ পথে এসেছিল? আর আসবে না? আর যদি না আসে তাহলে মনের কী যেন হারিয়ে যাবে। ও প্রত্যহ এমনি ভোরে আসুক। সারা দিনটা একটা বলিষ্ঠ সুরে ভরিয়ে দিযে যাক। তারপর বন্দীজীবনের বিচারে প্রাণদণ্ড হলেও ক্ষতি নেই। এমনি প্রার্থনাই সেদিন সব সময় সুভদ্রা করল।

এমন কী যে অখাদ্য আহার সে খায়নি, বাঁচবার জন্যে অম্লানবদনে সে সেই আহারই খেল। অন্তত সেই বীর অশ্বারোহী যদি আগামী কল্য ভোরে আবার আসে, তাহলে তাকে দেখার যে কষ্ট সেই কষ্ট যাতে সহ্য হয়, সেই জন্যে সে আহার করল ও সারা দিনরাত্রি ধরে এক আনন্দের মধ্যে সেই কয়েদ ঘরে বসে গুজরান করল।

একবার শুধু এক বাঁদী একটি রক্ষীর সঙ্গে এসে বলল—বিবিজী, নবাব সরকার জিজ্ঞেস করতে পাঠিযেছেন—আপনার দেমাগ ঠাণ্ডা হয়েছে কিনা! আর আপনি যদি অনুতপ্ত হযে নবাব সরকারের কাছে যেতে রাজী থাকেন তাহলে আপনার সব গোস্তাখি মাপ করা হবে।

সুভদ্রা তখন আপন চিন্তায় খুশি ছিল, হঠাৎ আরও স্পর্ধার সঙ্গে বলল—তোমাদের নবাবকে বল, আমি যদি তার মুখে জুতো মারতে পারি তার চেষ্টা করব।

বাঁদী ও রক্ষী চলে গেল, আর কেউ এল না।

সুভদ্রা নির্বিঘ্নে রাত্রি কাটাল।

কিন্তু রাত্রিতে সে ঘুমোতে পারল না। একটু করে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় আর চমকে ওঠে, বুঝি ভোর হয়ে গেল, আর সেই বীর ঘোড়সওয়ার টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। সুভদ্রা কান তীক্ষ্ণ করে সেই অশ্বক্ষুরে ধ্বনি শোনার চেষ্টা করল। এমনি করে রাত্রির সবখানি সময় তার চম্‌ক কেটে গেল। শেষ রাত্রের আবার তার ঘুম এসে পড়েছিল, হঠাৎ আচমকা ঘুম ভেঙে গেল কানের মধ্যে সেই অশ্বক্ষুরের ধ্বনি দামামার শব্দের মত পৌছতে। আর অমনি সে লাফিয়ে উঠে সেই গর্তে পা দিয়ে ফোকরে মুখ বাড়িয়ে দিল।

আজ তার বিশেষ কষ্ট হল না, স্নান করতে যাবার সময় কলঘর থেকে সে একটি দড়ি সংগ্রহ করে এনেছিল এবং দিনের এক ফাঁকে ফোকরের মধ্যে একটি গজালের মত সরু লোহার রডে সেটি আটকে দিযেছিল। এবার সেই দড়িটি ধরে সে বেশ জুত করে দাঁড়াল।

আবার সেই পূর্ব দিনের মত একই দৃশ্য ঘটল।

সেই অশ্বারোহী সাদাঘোড়ার পিঠে বসে বীর দর্পে শব্দ জাগিযে চলে গেল। আর

দুর্গদ্বারের রক্ষী চিৎকার করে একই হুঁশিয়ারী ভাষা প্রকাশ করল—রুখ যাও সিপাই, রুখ যাও।

কিন্তু অশ্বারোহী রুখল না, সে সমানগতিতে এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল।

আর সুভদ্রার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল।

তারপরেই তার মনে প্রশ্ন উদয় হল, এ কে? কোথা থেকে আসে আর প্রত্যহ কোথায় যায়? ওর কী এতটুকু ভয় করে না? বাংলার নবাবের দুর্গপ্রাসাদের সড়ক দিয়ে যায় কেন? যদি কখনও রক্ষী বাধা দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

অনেক ভয়-ভাবনা ঐ অশ্বারোহীর জন্যে মনে এল কিন্তু সুভদ্রার কেমন যেন মনের মধ্যে এক শ্রদ্ধার প্রাসাদ তৈরি হয়ে গেল। যাক, সে যাক। এমনি করে কোন বীর একদিন এই দুর্গের সবকিছু ধ্বংস করে ঐ বিলাসী নবাবকে পথে নামিয়ে দিক। ওরা সবার পূজারী, ওদের জন্মই এই বীরত্বের জন্যে। তাই ওদের কোন শঙ্কা নেই।

সুভদ্রা তাই মনে মনে বলল - তুমি প্রত্যহ এমনিভাবে উর্ধ্বশ্বাসে চলে যেও। এদের এই লাখো সিপাই পরিবৃত দুর্গকে ভয় দেখিয়ে যেও, যেদিন থামবে সেদিন এরা ভয় পেয়ে তোমাকেই বরণ করে নেবে।

এমনি এক অপরিচিত ঘোড়সওয়ারের কুশল চিন্তা করতে করতে সুভদ্রার বন্দী-জীবনের অনেকগুলি দিন কেটে গেল।

এরই মধ্যে মাঝে মাঝে বাঁদী এসে জিজ্ঞেস করতে লাগল—বিবিজী আপনি রাজী?

সুভদ্রার উত্তর—না, না, না—কখনও না।

যেন জোরটা তার আরও ফুটে উঠতে লাগল। হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করল, সে ঐ ঘোড়সওয়ারকে ভালবেসে ফেলেছে। সমস্ত মন প্রাণ এখন তার ঐ একটি দূরের মানুষের জন্যে। ওকে প্রত্যহ যে একবার দেখে কিন্তু তার যেন মনে হয় ঐ একটু দেখে সাধ মেটে না, ওর কাছে আরও থাকতে ইচ্ছে করে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একদিন ঐ মানুষটির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নিজের আঁচলটি ফোকর দিয়ে বাইরে বের করে নাড়তে লাগল কিন্তু দূরত্ব এত যে প্রথম দিন অশ্বারোহীর চোখই পড়ল না। কিন্তু পরদিন পড়ল এবং সে অশ্বের গতি অল্প শিথিল করে হাত তুলে নিজের উপস্থিতি জানান দিল।

এমনিভাবে আরও দুদিন গেল, একদিন অশ্বারোহী হঠাৎ থেমে একটু হাসি দিয়ে চলে গেল।

সুভদ্রার মনে হল ঐ বীরপুরুষ যেন তাকে ঐ হাসির মধ্যে দিয়ে আশ্বাস দিয়ে গেল।

কিন্তু তার কথা বলার কোন উপায় নেই, যদি চিৎকার করলে তার গোপন অভিসার ধরা পড়ে যায়। সেই ভেবে তাকে ইশারা করেই তাকে চুপ করে থাকতে হল।

একদিন হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা সেই ফোকরের ওপার থেকে কার যেন চাপাস্বর সুভদ্রাকে চমকে দিল। তখন অন্ধকার আকাশে নেমে আসছিল গাছের পাতার বুকে রাতের ইশারা।

সে হঠাৎ চতুর্দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—কে? কে?

আমি, আমাকে চিনতে পারছ না !

ভয়ে ভয়ে এবার সুভদ্রা ওপরের ঐ ফোকরের দিকে তাকাল। একটি মুখ দেখতে পেল কিন্তু সে মুখ কোনদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

প্রত্যহ ফোকরের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে সুভদ্রা যেমন ঘোড়সওয়ারকে দেখে, তেমনি মুখটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে সেই লোকটি সুভদ্রার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর সুভদ্রা সত্যিই চিনতে পারল না দেখে মৃদু হেসে বলল—ঘোড়সওয়ারকে ভুলে গেলে ? তুমি যে প্রত্যহ আমাকে ভোরবেলা ঘোড়ায় করে চলে যেতে দেখো, সেই আমি।

আর সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটস্বরে সুভদ্রার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—তুমি কিন্তু এখানে কী করে এলে ?

ঘোড়সওয়ার হাসল, বলল—এসেছি তোমার টানে।

কিন্তু যদি কেউ দেখে ফেলে ? তাছাড়া তুমি ওখানে উঠলে কেমন করে ? পড়ে যাবার কী ভয় নেই ?

আবার ঘোড়সওয়ার সেই আগের মত হাসল, তারপর বলল—আমার ভয় কিছুতে নেই।

তুমি কী মানুষ ?

অবশ্যই। মানুষ না হলে তোমার ডাকে এলাম কেমন করে।

সুভদ্রার তখন সত্যিই ভয় করছিল, ভয়চকিত দৃষ্টিতে বলল - না, না, এত দুঃসাহস প্রকাশ করা উচিত নয়। যদি ওখান থেকে পড়ে যাও কিংবা তোমাকে ধরে ফেলে ? চারদিকে কী রকম পাহারাদার ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখছ না ?

দেখছি। আমার ঠিক নীচে গম্বুজের পাশে খাপ খোলা তরোয়াল নিয়ে দুজন হাবসী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবে ?

বলেছি তো তোমার জন্যে আমি এসেছি।

কেন এসেছ ? আমি তো তোমাকে মরবার জন্যে ডাকিনি।

মরব কেন ? আমার কাছে কী তরোয়াল নেই ? না আমার বাহুতে নেই কোন শক্তি ?

তারপর সেই ঘোড়সওয়ার বলল—কিন্তু তুমি এখানে বন্দিনী কেন ? কী তুমি করেছ ?

সুভদ্রা এবার ম্লান হাসল, বলল—এরা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছিল নবাবের রংমহলে জবাই করবার জন্যে কিন্তু আমি বাধা দিয়েছিলাম বলে এই দুরবস্থা।

অকপটে বলে গিয়ে সুভদ্রা সেই ঘোড়সওয়ারের মুখের দিকে তাকাল, আর দেখল সেই বীরের মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

সে সেই কাঠিন্য নিয়েই একটু থেমে বলল—একটা শক্তিশালী দল যদি আমি গড়তে পারি তাহলে এই উচ্ছৃঙ্খল নবাবের দেহটা মুণ্ড থেকে আলাদা করে দেব। এত বড় স্পর্ধা এই নবাব সুজার। সুজার চেয়ে আর একজন আছে এই নবাবীর সব—হাজী আহম্মদ,

সিপাইশালার আলিবর্দীর বড় ভাই।

সুভদ্রার শুনে চোখ দুটি চক চক করে উঠল, বলল—পারবে, পারবে তুমি ঘোড়সওয়ার এই নবাবী রাজত্বের অবসান ঘটাতে? আমি তোমাকে সাহায্য করব।

ঘোড়সওয়ারের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল—তোমার সাহায্য পেলে নিশ্চয় পারব কিন্তু তার আগে তোমাকে এখান থেকে মুক্ত করতে হবে।

সুভদ্রা ভুলে গিয়েছিল সে বন্দী আছে, হঠাৎ সে কথা স্মরণ হতে অসহায়ের মত-কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল—এই দুর্গ থেকে মুক্তি আর আমার ইহজীবনে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়সওয়ার দৃঢ়স্বরে বলল—আলবৎ হবে, তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি সাতদিনের মধ্যে মুক্ত করব।

কিন্তু সাতদিনও আর পার হল না, হঠাৎ একদিন সেই ঘোড়সওয়ার ধরা পড়ে গেল। এমনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঘোড়সওয়ার সেই ফোকরের কাছে আসত, কিছুক্ষণ সুভদ্রার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে যেত।

সুভদ্রা নিষেধ করত, বলত—তুমি আর এমন করে এস না। আমার বড় ভয় করে। কার্নিশে পা রেখে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক, যদি পড়ে যাও? তাছাড়া পাহারাদারের চোখও তো আছে।

ঘোড়সওয়ার উত্তর দিত—এমনিভাবে না এলে যে তোমাকে দেখতে পাব না। তোমাকে প্রত্যহ একবার না দেখে যে পারি না।

কেন, সকালে তো দেখা হয়! তুমি যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে যাও, তখন দেখতে পাও না?

সে দেখা আর এ দেখার মধ্যে অনেক তফাত। তাছাড়া তখন মনে আর এক খেলা, নবাবের দুর্গদ্বারের ঐ সিপাইগুলোকে আতঙ্কিত করবার জন্যে অমনিভাবে ছুটে যাই। একদিন যে এমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ঐ দুর্গের রুদ্ধ দরজা ভেঙ্গে ঢুকে যাব এই অভিযানের মধ্যে থাকে সেই সঙ্কল্প। তখন তোমাকে আর মনেই থাকে না।

এমনি একদিন দুজনে কথা বলছিল। হাসি কান্নায় সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন এক পৃথিবী—এই সময় হঠাৎ নীচে থেকে চিৎকার উঠল - হুঁশিয়ার! আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পতনের শব্দ।

ঘোড়সওয়ার যে নীচে পড়ে গেল সুভদ্রা বুঝতে পারল, আর সঙ্গে সঙ্গে সে আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত পায়ে সেই ফোকরের কাছে উঠে দাঁড়াল।

নীচের দিকে তাকিয়ে যা দেখল, তাতে তার শরীর হিম হয়ে গেল। চারজন তাগড়াই হাবসী পাহারাদার ঘোড়সওয়ারকে চেপে ধরে বেঁধে ফেলেছে। আর ঘোড়সওয়ার চেষ্টা করছে বাঁধন কাটাবার।

আর কী হবে দাঁড়িয়ে? অন্ধকারে যদিও বা একটু আলোর শিখা জেগেছিল, তাও নিভে গেল। সুভদ্রা নেমে এসে সেই ফোকর থেকে কয়েদখানার মেঝেতে শুয়ে পাগলের মত কাঁদতে লাগল। এমন কান্না বুঝি কখনও তার হৃদয় মুচড়ে বের হয়নি যাই এল। কত আশা নিয়ে ঘোড়সওয়ার তাকে কত ভাল ভাল কথা শুনিয়েছিল, সে

মুক্তি পাবে—ঐ ঘোড়সওয়ারের সঙ্গিনী হয়ে তারা গড়বে এক নির্ভীক শক্তিশালী দল, তারপর এই প্রাকার ভেঙে বেইমান রাজপুরুষগুলিকে পথের ওপর দাঁড় করিয়ে হত্যা করবে। আর অগণিত যে সব মেয়েরা নবাবের ভোগ্য হতে না চেয়ে সুভদ্রার মত বন্দিনী হয়ে আছে, তাদের উদ্ধার করে নিজেদের দলের প্রত্যেকটি মুক্তি সৈন্যের সঙ্গে বিয়ে দেবে।

কিন্তু সব কল্পনাই ফুৎকারে মিলিয়ে গেল। সুভদ্রা এতদিন বন্দী থেকে যে অসহায়তা কখনও অনুভব করে নি, তাই করল।

তবে এখানেই যদি এ কাহিনী শেষ হত তাহলে বোধহয় ভাল হত কিন্তু তা হল না।

পরদিন সকালে একজন রক্ষী এসে সুভদ্রাকে জানাল—তোমার সেই লোকটির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যদি তুমি নবাবের প্রস্তাবে রাজী হও, তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

প্রাণদণ্ড!

সুভদ্রা কেমন যেন চোখের সামনে দেখতে পেল সেই বীর ঘোড়সওয়ারের মুখখানি কিন্তু সে মুখ আর সুন্দর নেই, ধড় থেকে খণ্ডিত হয়ে রক্তাক্ত মুণ্ড তারই কোলের কাছে গড়াচ্ছে।

রক্ষী এও বলে গেল, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপর মুজরিমের দেহ দ্বিখণ্ডিত হবে।

সুতরাং সময় বড় অল্প। যা ভাবার তা খুব তাড়াতাড়ি ভাবতে হবে।

কিন্তু কি ভাববে সে? ঘোড়সওয়ারকে বাঁচাতে গেলে যে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। ধূর্ত নবাব বুঝে শুনেই এই কৌশল অবলম্বন করেছেন।

ভাবতে ভাবতে সময় দ্রুত তালে চলে যেতে লাগল, আর সুভদ্রা পাগলের মত ছটফট করে সেই কয়েদখানার মধ্যে ঘুরতে লাগল। একবার ভাবল, কে কোথাকার কে? তার জন্যে কেন সে নারীত্ব বিসর্জন দেবে? আবার তখনই মনের মধ্যে কেমন যেন এক হাহাকার এসে সব চাপা দিয়ে দিল। হৃদয়ের কোথায় যেন ভালবাসার সুর জেগে উঠল। ও যদি প্রাণ হারায়, তবে আমার বেঁচে লাভ কী? আমি কার জন্যে আর বাঁচব? তার চেয়ে বরং নিজের জীবন দিয়ে ঐ বীরকে বাঁচাই, তাতে হয়তো ওর সঙ্কল্প একদিন কার্যে পরিণত হলে অনেকে বাঁচবে।

সুভদ্রা রক্ষীকে দরজার ভেতর থেকে তাই ডাকল—রক্ষী, আমি যদি আমার সর্বস্ব দিই, তাহলে ছেড়ে দেবে?

অনেক চিন্তা করে শেষপর্যন্ত সুভদ্রা রক্ষীর সঙ্গে নবাবের রংমহলে গিয়ে উপস্থিত হল। নবাবের সামনে দাঁড়িয়েও সে চোখের জলে তার প্রার্থনা পেশ করল—আমাকে নিয়ে আপনি ওকে ছেড়ে দেবেন তো?

নবাব মৃদু হেসে বললেন—জরুর।

তারপর আর কী। যে ইজ্জৎ রক্ষা করতে গিয়ে সুভদ্রা একদিন নবাবের বুকে

ছুরি মারতে গিয়েছিল, সেই ইজ্জত সে একজনের প্রাণভিক্ষার জন্যে নবাবের উন্মত্ত লালসার তলায় হাসিমুখে উৎসর্গীত করল।

সুভদ্রা [illegible] হারিয়ে তবু কাঁদল না, শুধু পরে অবসন্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—হুজুর, ওকে [illegible] গেছে তো?

[illegible] মধ্যে সুভদ্রার মুখের সামনে রক্ষী এনে ধরল একটি রক্তাক্ত মুণ্ড। আর সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরে সুভদ্রা একটি বিশ্রী আকাশ-ফাটানো চিৎকার তুলে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

নবাব বাঁদীদের হুকুম করলেন—এই আওরতকে পা[illegible]রাদারদের হাতে দিয়ে এস, ওরা একে দুর্গের বাইরে রেখে আসবে।